লোককথার ঐতিহ্য

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ এপ্রিল ১৯৬১

প্রচ্ছদ
জয়ন্ত ঘোষ

প্রকাশক
অনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ইম্প্রেসন হাউস
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক
নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ
দি শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
৩২, বিডন রো
কলকাতা-৭০০০০৬

শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত
শ্রীদুলাল চৌধুরী
বন্ধুবরেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

আদিবাসী লোককথা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)
লোকসমাজ ও আগুনের লোককথা
লোকসমাজ ও পশুকথা
আদিবাসী লোকসাহিত্যে বিদ্রোহী মন
নানান দেশের লোককথা
দশদিগন্তের পশুকথা
সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব
টুসু : ইতিহাসে ও সংগীতে (সম্পাদিত)
ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র (যৌথ সম্পাদনা)

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় দেশসমূহের অসংখ্য অভিযাত্রী দল এশিয়া-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া-পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ-পলিনেশিয়া-মাইক্রোনেশিয়া-মেলানেশিয়া-লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন সমুদ্রকূলবর্তী এলাকায় আসতে শুরু করেন। বিশেষ করে স্পেন পোর্তুগাল ও হল্যাণ্ডের দুঃসাহসিক মানুষেরাই প্রথম দিকে সমুদ্রযাত্রা করেন। নতুন দেশ আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা যে একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু সেইসব দেশের সম্পদ-লুণ্ঠনই ছিল প্রাথমিক তাগিদ। আদিবাসী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী উন্নত অস্ত্রসজ্জিত ও বীভৎসরকম নিষ্ঠুর ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন নি। আবার এইসব বিদেশী শক্তির অমানবিক কৌশলও নিরক্ষর সরল গ্রামবাসী প্রথমে বুঝে উঠতে পারেননি। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্যাপক ও স্থায়ী উপনিবেশ গড়া শুরু হল এবং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৃতীয় বিশ্ব ইউরোপের উপনিবেশে পরিণত হল। এই কালেই শাসক প্রভুদের পাশাপাশি এলেন কিছু মানবতাবাদী নৃবিজ্ঞানী ও ধর্মযাজকেরা, আর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত কিছু উদার প্রশাসক। এই তিন ধরনের মানুষের নিরলস চেষ্টায় লোকসমাজের হাজার হাজার লোককথা সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হল। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে তার ধারাবাহিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কিন্তু প্রাচীন কালের লোককথার নিদর্শন কি কোনোভাবেই পাওয়া সম্ভব নয়? প্রাচীন যুগে যারা উচ্চতর সাহিত্য-ধর্মগ্রন্থ-নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেছেন তাদের সঙ্গে তো গ্রামীণ জনজীবনের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। যদিও তারা হয়তো লোককথার বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি, কিন্তু পরিবেশের সাংস্কৃতিক প্রভাব অস্বীকার করবেন কেমন করে? নিশ্চয়ই তাদের লিখিত গ্রন্থসমূহে লৌকিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই তথ্য অনুসন্ধানের ফলেই 'লোককথার ঐতিহ্য' গ্রন্থটির উদ্ভব। প্রাচীন কালের

লোকসমাজের লোককথার লিখিত ঐতিহ্যের উৎস সন্ধানই বর্তমান গ্রন্থটির উদ্দেশ্য।

মিশর-ভারতবর্ষ ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়া-গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতা-গুলির উজ্জ্বল সংস্কৃতির লিখিত ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এই সব পুরনো লিখিত সম্পদকে ঘিরেই।

রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ-পিলপের নীতিকথা-বৃহৎকথামঞ্জরী-কথাসরিৎসাগর ঈশপ-হোমার ও প্রাচীন লাতিন-গ্রীক গ্রন্থসমূহ এবং মিশরীয়-মেসোপটেমীয় কিউনিফর্ম লিপিমালায় উৎকীর্ণ ফলকে যেসব লোককথা রয়েছে সেগুলি বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু এগুলি যে লোককথা তার প্রমাণ কোথায়? আমি তিনটি বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছি। প্রথমত, সেইসব কাহিনীতে লোককথার মোটিফ প্রযুক্ত রয়েছে কিনা। দ্বিতীয়ত, সেইসব কাহিনী সমান্তরালভাবে অন্য গ্রন্থে কিংবা বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ লোকসমাজে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। তৃতীয়ত, লোককথার অভিপ্রায় ও প্রাণ বিশ্লেষণ করে লৌকিক রূপটির উদ্‌ঘাটন। এবং সবশেষে, সমস্ত খোলস ও বহিরঙ্গ অলঙ্কারের মধ্যে থেকে মূল লোককথাটির সন্ধান। সংকলক কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে লোককথাকে ব্যবহার করেছেন আর লিখিত রূপ দেবার সময় মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজের উদ্দেশ্যের সপক্ষে সেটি ব্যবহার করেছেন। তাই প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে লৌকিক উপাদান-সংগ্রহের কাজটি তুলনামূলকভাবে যতটা সহজ, লোককথার নিটোল রূপটি উদ্‌ঘাটিত করা ততটা সহজ নয়। আমার মনে হয়েছে, এই ধরনের বিশ্লেষণ পদ্ধতি বিজ্ঞাননির্ভর ও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্মত। কিন্তু কতটা সফল হয়েছি কিংবা আদৌ সফল হয়েছি কিনা তা বিচার করবেন সহৃদয় সুধী পাঠকবৃন্দ। আমার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছি।

লোককথার লিখিত ঐতিহ্য যেসব ভাষায় রয়েছে তার কোনো ভাষাই আমি জানি না, সামান্য সংস্কৃত ছাড়া। তাই বাংলা ও ইংরেজিতে অনূদিত গ্রন্থের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পণ্ডিতজন-স্বীকৃত প্রামাণ্য অনুবাদগ্রন্থগুলির ওপরেই নির্ভর করেছি। মূল ভাষা জানা কোনো লেখক এ কাজ করলে বিশ্লেষণ আরও ত্রুটিমুক্ত হত। অক্ষমতা ও দীনতা অস্বীকার করি কেমন করে?

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের লোকসমাজ সেই কোন্ ভুলে-যাওয়া কাল থেকে সামাজিক প্রয়োজনে, ধর্মীয় তাগিদে ও অনাবিল আনন্দে লোককথা সৃষ্টি করে চলেছেন। আজও হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যে, পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যেও লোককথা সৃষ্টি হচ্ছে। লোককথার এই ব্যাপ্ত বিশাল ভাণ্ডার প্রত্যেককেই বিস্মিত করে। যদিও মৌখিক ঐতিহ্যে যা রয়েছে তার সামান্য অংশই সংগৃহীত হয়েছে। কেননা, আজও শত-সহস্র লোকসমাজের কোনো লোককথাই প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, কবে থেকে মানুষ এইসব লোককথা বলছেন? প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষ্ণুশর্মা কিংবা পিলপে অথবা প্রাচীন গ্রীসের ঈশপ মৌখিক লোককথা সংকলন করেছিলেন। কিন্তু তারও পূর্ববর্তী কালের লোককথার কি কোনো লিখিত নিদর্শন নেই? হরপ্পা কিংবা মহেনজোদারোর নগর যখন গড়ে উঠছে তখন প্রয়োজন পড়েছে অসংখ্য শ্রমিকের। এরা গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছিল। কৃষি-সভ্যতার সঙ্গেই এদের ছিল নাড়ীর যোগ। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্সের বিশাল প্রাসাদ-মন্দির-রঙ্গালয় প্রভৃতি যারা তৈরি করেছে, তারাও মূলত গ্রামীণ সমাজভুক্ত। প্রাচীন মিশরের পিরামিড কিংবা প্রাচীন ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান যারা গড়েছে তারাও ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায় থেকে আসা যুদ্ধবন্দী-ক্রীতদাস শ্রমিক। দূর দূর গ্রাম থেকে তারা এসেছিল নগর-সভ্যতার বনিয়াদ গড়তে। অবসর সময়ে তারা নিছক বিনোদনের জন্যও কি কোনো লোককথা শোনাত না? গ্রামীণ জীবনের রক্তের সঙ্গে মিশে-থাকা লোককথা কি এত সহজেই ভুলে যাওয়া যায়? আফ্রো-আমেরিকান গ্রামীণ কৃষকেরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছে, মাতৃভাষাও ভুলেছে কালক্রমে,—কিন্তু নতুন দেশে নতুন পরিবেশে তারাও বাঁচিয়ে রেখেছে আফ্রিকার আদিবাসী লোককথাকে। সপ্তদশ শতাব্দীর পর থেকে এ সম্পর্কে অনেক তথ্য আমাদের হাতে এসেছে বলেই একথা আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারছি। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে, মিশরে, গ্রীসে,

ব্যাবিলনে যারা বছরের পর বছর ধরে অন্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিজেদের গ্রামীণ পরিবেশ থেকে সুদূরে যাপন করেছে, গাঁয়ের স্মৃতিতে, আত্মীয়-পরিজনের স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তারা কি কোনো লোককথা একে অপরকে শোনায়নি? এক অসহ্য পাশবিক যন্ত্রণাময় কালযাপন। গাঁয়ের স্মৃতিকে উজ্জ্বল রাখতেই নিশ্চয়ই তারা লোককথা বলেছে, গান গেয়েছে, লোকপুরাণ শুনিয়ে মানসিক শান্তি খুঁজেছে। কিন্তু সে সব লোক-ঐতিহ্যের কোনো হদিস কি আমরা পেতে পারি?

ঝড়ো হাওয়া আজও বইছে। সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কিংবা ব্যাপক খরা-বন্যা বহু জনগোষ্ঠীকে নিঃশেষ করে দেয় আজও। সে বিপর্যয়ের নথিপত্র থাকে, থাকে ইতিহাস। কিন্তু প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে সব বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে তার তো কোনো ইতিহাস নেই। বড় বড় ঘটনার কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক নথিপত্রই শুধু পাওয়া যায়। শতসহস্র অ্যাটিলা-সুলতান মামুদদের আক্রমণে অনেক লিখিত নথিপত্রই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তাই কালের বিবর্তনে প্রাচীন পৃথিবীর লোকসমাজের লোককথারও প্রত্যক্ষ কোনো হদিস পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিনের লোককথার কোনো সংগ্রহই আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়নি। বিষ্ণুশর্মা-পিলপে-ঈশপ-নারায়ণ-ক্ষেমেন্দ্র অনেক পরের সংগ্রাহক।

তবু অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ কি একেবারেই অজানা? সেদিনের লোককথার কোনো নিদর্শনই কি খোদিত নেই কোনো মন্দিরগাত্রে, প্রাচীন মহাকাব্যে? গিলগামেশ রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসিতে? সেকালের লোককথা সম্পর্কে বোধহয় আজ আমরা আর একেবারেই অজ্ঞ নয়। কিছু তথ্য অন্তত জানা যায়।

সেই সুদূর কালের লোকসমাজের লোককথা সম্পর্কে জেনেছি, সেইসঙ্গে জেনেছি সেই কালে তাদের জীবনে লোককথার স্থান ও প্রভাব, লোককথাগুলি কেন বলা হত তার উদ্দেশ্যও জানতে পেরেছি। প্রাচীনকালে লোককথা শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশই ছিল না, ছিল কোনো বিশেষ ইচ্ছাপূরণের মাধ্যম। ধর্মীয় আচার ও সংস্কারের সঙ্গে এগুলোর নিবিড় যোগ ছিল। সেইকালে যে সব লিখিত সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক লোককথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। সেই সময়ে মানুষের মধ্যে যেসব লোককথার প্রচলন ছিল, বিশেষ প্রয়োজনে লেখক সেইসব লোককথাকে তার কাহিনীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করে যান। উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেলেও লোককথাগুলির বৈশিষ্ট্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। মূল কাহিনী অংশের সঙ্গে লোককথাগুলি যুক্ত থাকে, কিন্তু আলাদাভাবে পড়লে মনে হবে, এটি মূল কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে,—আসলে আলাদাভাবে এটির সৃষ্টি হয়েছে।

আর একটি উৎস হল মন্দিরগাত্র-মাটির টালি-প্রাসাদচত্বর প্রভৃতিতে

উৎকীর্ণ লোককথা। মনে রাখতে হবে, প্রাচীন কাব্য গেয়ে গেয়ে জীবিকা অর্জন করতেন কথক, তাদের কথকতা থেকে প্রাচীন কাব্যের অসংখ্য গল্পও লোকসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। যে সব কাহিনী তাদের মনকে আন্দোলিত করত, সেগুলো তারা মনে গেঁথে রাখত, আবার নিজেরাই উত্তরপুরুষকে শোনাত। আবার অনেক সময়ে প্রাচীন কাব্যের কাহিনীর মূল উৎস হল লোকসমাজে প্রচলিত কোনো সহজ সরল গাথা। এই লৌকিক উৎসটিকে লেখক মনের মাধুরী মিশিয়ে আরও অপরূপ করে তুলেছেন। প্রাচীন কালে লিখিত কাব্য কথকের মাধ্যমে যেমন প্রচারিত হয়েছে, তেমনি লৌকিক উপাদান লেখকের প্রয়োজনে লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৃথিবীর প্রাচীন কাব্যগুলির প্রত্যেকটিরই আদি উৎস হল লৌকিক কাহিনী,—এ বিষয়ে এত তথ্য পাওয়া গিয়েছে যে আজ আর সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। লৌকিক গাথাকাব্যের কাহিনী কিংবা বীরকাহিনী উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের জনক। লৌকিক এইসব গাথা-রূপকথা-বীরকথা-পশুকথা ধর্মীয় আচার-আচরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের হাতে সেগুলো পুরাণকথার মর্যাদা পেয়েছে, আবার এই পুরাণকথার আদিম কাঠামো থেকে গড়ে উঠেছে উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের বহু কাব্য-পুরাণ-মহাকাব্য। রূপগত ও চিন্তাগত অনেক পরিবর্তন ঘটে গেলেও কাহিনীর মূল 'মোটিফের' তেমন কোনো হেরফের হয়নি।

প্রাচীন মিশর

প্রাচীন মিশরের কিছু লোককথা নানা মাধ্যমে বর্তমান কালেও পাওয়া গিয়েছে। লৌকিক উৎস থেকে এগুলি সংরক্ষিত হয়েছিল প্যাপিরাসের ওপর। লোককথাগুলি খুব সাজানো বা বিন্যস্ত নয়। এগুলি সংরক্ষণ করেছিলেন সেকালের পুরোহিত সম্প্রদায়। অবশ্য পেছনে কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আঙ্গিক ও মোটিফের বিচারে বোঝা যায়, এগুলি ছিল লোকসমাজের লোককথা। লোককথাগুলির মধ্যে প্রাচীন মিশরের জনজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে, সেইসঙ্গে এই মোটিফগুলি যে বিশ্বজনীন তার স্বরূপও জানা যায়। লোককথা একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন।

মিশরের লোককথার প্রাচীনতম লিখিত রূপটি পাওয়া যায় 'জাহাজডোবা মানুষ' লোককথায়। এই লোককথাটি লিখিত হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ২০০০-১৭০০ অব্দে। লোককথাটি হল: একজন মানুষ চলেছে জাহাজ ভাসিয়ে

লোহিত সাগরের ওপর দিয়ে। হঠাৎ বিপদের মুখে পড়ল সেই জাহাজ। জাহাজ ডুবে গেল, জাহাজের সব মানুষ ডুবে গেল। শুধু বেঁচে রইল সে। ঢেউ-এ ঢেউ-এ ভাসতে ভাসতে সে এল এক নির্জন দ্বীপে। সেই দ্বীপে বাস করত এক সাপ। সাপের দেহ হলেও আসলে সে ছিল আত্মাদের রাজা। এই সাপ জাহাজডোবা মানুষটিকে আদর করে দ্বীপে ডেকে নিল। সাপ মানুষটিকে তার দুর্ভাগ্যের কথা সব খুলে বলল। আরও বলল, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই দ্বীপ অতল সাগরে তলিয়ে যাবে, তার দিনও ফুরিয়ে যাবে। এই দ্বীপে ছিল এক মানবী কুমারী। কিন্তু আত্মাদের রাজার পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কুমারীও কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। এইসব দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতে চারমাস কেটে গেল। এমন সময় একদিন সেই দ্বীপের পাশ দিয়ে অন্য একটা জাহাজ ভেসে যাচ্ছিল,—মানুষটি সেই জাহাজে চেপে উদ্ধার পেল।

লোককথাটি নিঃসন্দেহে অসম্পূর্ণ ও রহস্যময়। লোককথার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল : এর মধ্যে একটি নিটোল কাহিনী থাকে, একটি কিংবা কয়েকটি মোটিফ থাকে, কাহিনীর পরম্পরা থাকে। কিন্তু এই লোককথায় একটি মোটিফ থাকলেও অন্য গুণগুলি অনুপস্থিত। যে পুরোহিত এই লোককথাটির লিখিত রূপ দেন, তিনি কেন যে এইরকম একটি অসম্পূর্ণ লোককথা সংরক্ষণ করলেন তা আজ আর বুঝবার উপায় নেই। অথচ এই কাঠামো থেকে বোঝা যাচ্ছে, লোককথাটির একটি সম্পূর্ণ লৌকিক রূপ ছিল, নইলে এর কোনো অর্থই হয়না। আর লোকসমাজ অর্থহীন কোনো অসম্পূর্ণ লোককথা কখনই সৃষ্টি করে না। আসলে লিখিত রূপ দেবার সময়েই এই বিপর্যয় ঘটে। পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের কাজকর্মের মধ্যে কিছুটা রহস্যকে প্রশ্রয় দেন। কারণ, তাদের সবকিছু যদি সাধারণ মানুষ জেনে ফেলে তবে জীবিকায় অসুবিধা ঘটে, সম্ভ্রমবোধও চলে যেতে পারে। এই লোককথাটি যেহেতু কোনো ধর্মীয় কারণে পুরোহিত সংকলন করেছিলেন, তাই এখানেও কাহিনীকে ছেঁটেকেটে কিছুটা রহস্যজনক করে তোলা হল। স্বভাবের মধ্যেই রহস্য করার বীজ রয়ে গিয়েছে। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে। লোককথাটির মধ্যে রাজার নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা ও ব্যর্থ প্রেমের বিষয়টি কিন্তু একেবারে অস্পষ্ট নয়।

লোককথাটির মধ্যে থেকে অনেক কিছুর উত্তর আজ আর জানা সম্ভব নয়। রাজা কেন শাপগ্রস্ত, কেন তার দৈহিক রূপান্তর, শেষের দিনগুলি কোন্ অভিশাপে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে, কে দিয়েছে সেই অভিশাপ, আত্মাদের রাজা বিলীন হয়ে গেলে কে আত্মাদের মুক্তি দেবে, মানবী কুমারী কেন কিভাবে দ্বীপে এল, কেন অন্যান্যদের সঙ্গে সে মিলিয়ে গেল,—এসব সূত্রের কোনো হদিস নেই। অথচ মূল গল্পে যে ছিল তা

লোককথাটির আঙ্গিকের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া না গেলেও মিশরের ও বিশ্বের প্রাচীনতম লোককথাটির যত সংক্ষিপ্ত রূপই হোক না কেন তা আমাদের হাতে এসেছে। এর জন্য আধুনিক বিশ্বের মানুষ সেই অজানা পুরোহিতের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

মিশরের মন্দির থেকে ১৭০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার। এই তিনটি লোককথার মধ্যে থেকে আমরা অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি।

এই লোককথা তিনটির মধ্যে চিওপ্‌স্‌-এর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এই মহান সম্রাট নাকি লোককথা শুনতে ভালোবাসতেন। চিওপ্‌স্‌ ছিলেন চতুর্থ রাজবংশের (২৭২০-২৫৬০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) প্রতিষ্ঠাতা। তার পিতা ছিলেন স্নোফ্‌রু ও পিতামহ হুনি। তৃতীয় রাজবংশের সম্রাট হুনি মেইডাম এলাকায় বিশাল একটি পিরামিড গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু সে কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি, সম্পূর্ণ করেন তার পুত্র স্নোফ্‌রু। পিতা ও পিতামহের ঐতিহ্য বহন করে চিওপ্‌স্‌ গিজা এলাকায় সর্ববৃহৎ পিরামিড গড়ে তোলেন। এর পরিধি ৭৫৫ ফিট, উচ্চতা ৪৮১ ফিট। এর মধ্যেকার অসংখ্য গৃহ ছাড়াও ২৫ লক্ষ চুনা পাথরের বিশাল বিশাল খণ্ড রয়েছে। কয়েকটি পাথর রয়েছে যার একেকটির ওজন ১৬ টনের মতো। সেইকালে মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার জানত না, ক্রেন ছিল না,—তবু অসাধ্য সাধন করেছিলেন সেদিনের ক্রীতদাস-যুদ্ধবন্দী শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদেরা! এই অসাধারণ পুরুষ চিওপ্‌স্‌-এর নামের উল্লেখ রয়েছে লোককথার এই লিখিত পুঁথিতে। এই সম্রাটের নাম লোকসমাজে খুব উজ্জ্বল ছিল বলেই এক হাজার বছর পরে লিখিত লোককথাতেও তার উল্লেখ রয়েছে।

বিশ্বের লিখিত লোককথাগুলির মধ্যে এই লোককথা তিনটিই সবচেয়ে প্রাচীন যার মধ্যে একজন ঐতিহাসিক মানুষের নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। লোক-কথার মধ্যে লোকসমাজ যে সমসাময়িক কালের কথা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রকাশ করেন, এটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অবশ্য, বিশেষ কালের বেদনা-ক্ষোভ-সংগ্রাম-আশা-আকাঙ্ক্ষার চিত্র প্রতীকের মাধ্যমেই বেশি প্রকাশিত হয়। লোককথার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলেই সমাজ-মনকে জানা যাবে।

এই তিনটি লোককথায় অত্যন্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রয়েছে। একটি লোককথায় পঞ্চম রাজবংশের তিনজন সম্রাটের অতিলৌকিক জন্ম বৃত্তান্ত রয়েছে। লোককথাটি সংকলিত হয় ১৭০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। আর এই তিন সম্রাটের জীবনকাল আরও এক হাজার বছর আগের।

দুটি লোককথার মধ্যে যাদুকরদের কথা রয়েছে, তাদের কাজকর্মের

বিবরণ রয়েছে। যাদুবিদ্যার সাহায্যে সৃষ্টি করা হল একটি কুমিরকে। যাদু কুমির ব্যভিচারীকে শাস্তি দিয়েছিল। নদীর মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল একটি অলংকার, যাদুবিদ্যার জোরে হারানো অলংকার উদ্ধার করা হল। দুটি লোককথার বিষয়বস্তু এই যাদুকে কেন্দ্র করে।

একজন যাদুকর ছিলেন। তার অনেক গুণ। তিনি প্রচুর খেতে পারতেন, পান করতে পারতেন সেই পরিমাণ। অন্য কেউ ভাবতেই পারে না। মরে-যাওয়া প্রাণীকে তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। দেশের রাজা আদেশ দিলেন, একটি মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, যাদুকর তার শক্তিবলে মানুষটিকে বাঁচিয়ে তুলুক। যাদুকর রাজার আদেশ অমান্য করলেন। রাজা আদেশ দিলেন, দেবতা থোথ্-এর খেলার ঘুঁটি দেখাতে হবে। যাদুকর বললেন, হ্যাঁ, তার সন্ধান দিতে পারি। হেলিওপোলিস্-এ সূর্যদেবতার মন্দিরে একটি সিন্দুকে আছে। কিন্তু যে কেউ সে বস্তু আনতে পারবে না। সাচেবুর দেবতা রি-র পূজারিণীর বড় ছেলেই শুধু আনতে পারবে। দেবতা রি-র সঙ্গে মিলনের ফলে পূজারিণী অন্তঃসত্ত্বা হলেন, গর্ভে রয়েছে তিনটি শিশু। এর পরে কাহিনীতে রয়েছে পূজারিণীর অভিযান। এই তিনটি শিশুই হল পঞ্চম রাজবংশের প্রথম তিনজন সম্রাট। তারাই হলেন মিশরীয় লিপির দেবতা। লোকপুরাণের আদলে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি লোককথাও অসম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে।

এর পরবর্তী কালের লোককথা সংগ্রহের যে লিখিত রূপ আমাদের হাতে এসেছে তা 'নব্য রাজবংশের'। এর সময়কাল হল ১৬০০-১০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। এর মধ্যে একটি গল্পে সামরিক কৌশল সম্পর্কে ঘটনাবলী রয়েছে। কয়েকটি ঐতিহাসিক চরিত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এইসব লোককথায়।

একটি সুন্দর লোককথা রয়েছে এই সংগ্রহে। এক যে ছিল রাজপুত্র। জন্মাবার মুহূর্তে ভবিষ্যৎ-বাণী করা হল,—এই রাজপুত্রকে হত্যা করবে সাপ, কুমির কিংবা কুকুর। রাজপ্রাসাদের এক সুউচ্চ গৃহে তাকে রেখে দেওয়া হল। কোনোভাবেই যাতে অভিশাপ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। কিশোর রাজপুত্র যুবক হল। কোনো বাধাকে না মেনে রাজপুত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়ল। এল অন্য এক রাজার দেশে। রাজার ছিল এক মেয়ে। রাজার প্রতিজ্ঞা, মেয়ে যে গৃহে থাকে সেই গৃহে যে পৌঁছতে পারবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন। মেয়ে এমন এক গৃহে থাকে জমি থেকে যার উচ্চতা 'সত্তর এল'। রাজপুত্র পৌঁছল সেই সুউচ্চ গৃহে। রাজপুত্র যদিও পরিচয় দিয়েছিল যে সে একজন সামরিক ব্যক্তির পুত্র, কিন্তু রাজা তার আসল পরিচয় জেনে ফেলেছেন। তাদের বিয়ে হয়ে গেল। একদিন রাজকন্যা একটি সাপের ছোবল থেকে স্বামীর প্রাণ বাঁচাল। রাজপুত্র

একবার নিজের চেষ্টায় কুমিরের আঘাত থেকে বাঁচল। রাজপুত্রের কাছে সবসময় থাকত খেলনার একটা কুকুর। শেষ পর্যন্ত এই খেলনা কুকুর থেকেই রাজপুত্রের মৃত্যু ঘটল। শেষকালে নিয়তি জয়ী হল।

লোককথায় সাধারণত এরকম পরিণতি ঘটে না। রাজপুত্র শেষ পর্যন্ত কোনো অতিলৌকিক কৌশলের বলে নিয়তিকে জয় করে। এই মোটিফই বিশ্বজনীন। এখানে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। নিয়তির অমোঘ পরিণাম বোঝাতে কোনো পুরোহিত হয়তো লিখিত রূপ দেবার সময় এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। এই সংগ্রহের লোককথাগুলিও অসম্পূর্ণ।

১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে মিশর থেকে একটি লোককথা আবিষ্কৃত হল। প্যাপিরাসের ওপরে হিয়েরোগ্লিফিক চিত্রলিপিতে লিখিত। ১২৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় সেতি-র আমলে এটি লিপিবদ্ধ হয়। আন্নানা নামে একজন লিপিকর এই লোককথাটি লিখে রেখেছিলেন। এই লোককথাটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া গিয়েছে। তাই অনেকে মনে করেন, 'দুই ভাইয়ের গল্পটি' প্রথম লিখিত আকারে পাওয়া সম্পূর্ণ লোককথা।

দুই ভাইয়ের গল্প

এক যে ছিল বাবা-মা। তাদের দুই ছেলে। বড় ভাইয়ের নাম আনুপ, ছোট ভাইয়ের নাম বাটু। আনুপের ছিল এক বৌ। দাদার বাড়িতে বাটু থাকত সন্তানের মতো। বাটু মাঠে বলদদের নিয়ে যেত, লাঙল দিত। সে ছিল খুব কাজের ছেলে। ফসল তোলার কাজ শেষ হলে বাটু তখন মাঠে অন্যান্য কাজ করত। বড় ভাই ছোট ভাইকে সবকিছু দিত, খুব ভালোবাসত।

এমনি করে দিন যায়। বাটু প্রতিদিন সকালে মাঠে যায়, আঁধার নেমে এলে বলদদের নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সকালে যখন সে মাঠে যায়, দাদা-বৌদি তখনও ঘুম থেকে ওঠে না। খাবার নিয়ে সে মাঠে যায়, মাঠে বসেই নিজে খায়, কাজের লোকেরা খায়। কোথায় ভালো ঘাস আছে, গোরুরা বাটুকে তা জানিয়ে দিত। সে-ও গোরুর দলকে নিয়ে সেখানে যেত। গোরুর সংখ্যাও বেড়ে যেতে লাগল।

আবার চাষের সময় এসে গেল। বড় ভাই বলল, চলো, বলদের দল নিয়ে মাঠে যাই। চাষ করি। তুমি বীজ নিয়ে মাঠে এসো। লাঙল দিতে মাঠে নেমে পড়ি।

ছোট ভাই দাদার কথামতো কাজ করল। মাঠে নেমে পড়ল দুই ভাই। বেশ কয়েকদিন ধরে কাজ চলল। কিন্তু আরও বীজের দরকার হয়ে পড়ল। দাদা বলল, আমি মাঠে থাকছি, তুমি তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে বৌদির কাছ থেকে বীজ নিয়ে এসো।

ছোট ভাই বাড়িতে এসে দেখে বৌদি বসে চুল বাঁধছে। সে বলল, এক্ষুনি বীজ দাও, তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে হবে। দাদা তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরতে বলেছে।

বৌদি বলল, আমি চুল বাঁধছি, উঠতে পারব না। তুমি গোলা খুলে বীজ নিয়ে যাও।

নিজের ঘরে গিয়ে ভাই একটা বড় ঝুড়ি নিল। অনেক বীজ নিয়ে যেতে হবে। সে ঝুড়িতে অনেক বীজ নিয়ে বৌদির সামনে এল। হঠাৎ বড় ভায়ের বৌ বাটুকে খারাপ পরামর্শ দিল। বাটুকে সে রাজি করাতে পারল না। কুপ্রস্তাব না শুনে ভাই মাঠে চলে গেল।

আঁধার নেমে এলে বড় ভাই ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে এল। ঘরে ঢুকে দেখে, বৌ শুয়ে আছে। ঘর অন্ধকার, বৌ আলো জ্বালাল না, স্বামী আসাতে ব্যস্তও হল না। স্বামী অবাক হয়ে বলল, কি হয়েছে তোমার? কেউ কিছু বলেছে?

বৌ ছোট ভায়ের নামে নালিশ করল। এইসব অভিযোগ দাদা বিশ্বাস করল। সে রেগে আগুন হয়ে গেল। ছুরি হাতে গোয়ালের পাশে অন্ধকারে লুকিয়ে রইল। ছোট ভাইকে সে মেরেই ফেলবে।

সূর্য ডুবে গিয়েছে। মাঠ থেকে গোরু নিয়ে বাটু বাড়ি ফিরছে। একটা গোরুর বাছুর বাটুকে আগে থেকেই জানিয়ে দিল, তোমার বড় ভাই ছুরি হাতে অন্ধকারে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান! কাছে যেও না।

ছোট ভাই দরজার ফাঁক দিয়ে ছুরি হাতে বড় ভাইকে দেখতে পেল। ছোট ভাই দৌড় দিল। বড় ভাই ছুটল ভাইয়ের পেছনে, হাতে তার ধারাল অস্ত্র। বাটু অন্ধকারে সূর্যদেবতাকে স্মরণ করল, তাকে সব বলল, শেষে বলল, সব অভিযোগ মিথ্যা। দয়ালু দেবতা, আমাকে রক্ষা কর।

হঠাৎ দেবতার কৃপায় দুই ভায়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেল এক স্রোতের ধারা। তার মধ্যে অনেক কুমির। দুপারে দুজন দাঁড়িয়ে।

সকাল হল। চারদিক আলোয় ঝলমল করে উঠল। বাটু করুণ স্বরে বলল, দাদা, তোমার কাছে কোনোদিন আমি খারাপ কিছু করিনি। কোনো অন্যায় করিনি। কেন তুমি আমাকে মারতে গেলে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যে তোমার ছোট ভাই, তুমি-বৌদি আমার বাবা-মায়ের মতো। আমি তো কিছুই করিনি দাদা।

বাটু কাঁদতে কাঁদতে বড় ভাইয়ের বৌয়ের কুপ্রস্তাবের কথাও জানিয়ে

দিল। আর বলল, আমি আর কোনোদিন তোমার বাড়িতে ফিরে যাব না। আমি দূর পাহাড়ে-বনে কোথাও চলে যাব। তুমি ফিরে যাও বাড়িতে, পশুদের যত্ন নিও, জমির দেখাশোনা ভালোভাবে করবে। আমি দেবদারু বনে চলে যাচ্ছি। আমার হৃদয়কে দেবদারু ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখব। আমি আর আমার হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকব। যেদিন কেউ ঐ দেবদারু গাছ কেটে ফেলবে, সেদিন আমার হৃদয় মাটিতে পড়ে যাবে। যদি তুমি কখনও সেটা খুঁজতে আস, তবে তোমাকে কষ্ট করে সাত বছর অপেক্ষা করতে হবে। হৃদয়টিকে জলের মধ্যে রাখবে, আমি আবার প্রাণ ফিরে পাব।

আনুপ কাঁদতে লাগল। হায়! এ কি করল সে! সব বুঝতে পারল বড় ভাই। ছোট ভাই চোখের সামনে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে এল সে, ঘরে ঢুকল। ঘরে ছিল বৌ। আনুপ এক আঘাতে বৌকে মেরে ফেলল। মাটিতে বসে ছোট ভাইয়ের জন্য কাঁদতে লাগল।

এদিকে বনের পথে হাঁটতে হাঁটতে ছোট ভাই একদিন এসে পেঁছিল পাহাড়ী বনে। সে একা, তার কোনো সঙ্গীসাথী নেই। সে দেবদারু গাছের উঁচু ডালে একটা ফুলের মধ্যে হৃদয়কে লুকিয়ে রাখল।

অনেক দিন ধরে বাটু সেই গাছের নিচে রইল। সে গাছের ডালপালা দিয়ে একটা ঘর তৈরি করল। সারাদিন শিকার করে, খায় দায়, রাতে ঘুমিয়ে থাকে ঘরে।

একদিন বাটু ঘরের বাইরে এসেই নয় জন দেবতাকে দেখতে পেল। দেবতারা বললেন, বড় ভাইয়ের বৌ-এর জন্য তুমি কেন ঘরবাড়ি জমি-গোরু ছেড়ে এখানে রয়েছ? তোমার দাদার বৌ অনেক দিন আগে মরে গিয়েছে। তুমি দেশে ফিরে যাও, একা থাকার দরকার নেই।

হঠাৎ সূর্যদেবতা বললেন, বাটুর জন্য একটা মেয়ে দাও, সে তার বৌ হবে। ওকে আর একা একা থাকতে হবে না।

দেবতা বাটুর জন্য একটি মেয়ে দিলেন। সে হল তার বৌ। সবচেয়ে রূপসী সে। প্রেমের দেবী হাথোর ভবিষ্যৎ-বাণী করলেন, এই রূপসীর পরিণতি শুভ নয়। তার মৃত্যু হবে বীভৎসভাবে। বাটু বৌকে খুব ভালোবাসতে লাগল। শিকার করে এনে সবকিছু সে বৌকে দিত। আর বলত, দূরে কোথাও যেও না। আমার হৃদয় রয়েছে গাছের ডালে, বিপদ এলে তোমায় বাঁচাতে পারব না।

একদিন বাটু বৌকে ফুলের মধ্যে থেকে হৃদয় নিয়ে এসে দেখাল। বৌ অবাক হয়ে দেখল।

এমনি করে দিন যায়, রাত কাটে। বাড়ির পাশেই ঘন বন। বৌ একদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। হঠাৎ সাগর ধেয়ে এল বৌয়ের পেছনে,

তাকে ধরতে এল। কেননা, সাগর বৌকে খুব ভালোবাসত। বৌ ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল।

বৌয়ের মাথার একগুচ্ছ কেশ নদীর জলে গিয়ে পড়ল। ভাসতে ভাসতে সেই গুচ্ছ গেল ফারাও-এর প্রাসাদের নিচে। যারা কাপড় কাচছিল তারা কেশগুচ্ছ ফারাওকে দিল। অপূর্ব সুগন্ধি সেই কেশে। ফারাও ঠিক করল, এই মেয়েকে সে বিয়ে করবে। দূত ছুটল। অনেক দূত। চারিদিকে। সবাই ফিরে এল। না মেয়েকে তারা খুঁজে পায়নি। যারা পাহাড়ী দেবদারু বনে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে শুধু একজন কোনোরকমে ফিরে এসেছে। সে জানাল, বাটু সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমিই শুধু পালিয়ে আসতে পেরেছি।

ফারাও এবার অনেক সৈন্য-সামন্ত-লোকজন পাঠাল। যেমন করেই হোক মেয়েকে আনতেই হবে। এদের সঙ্গে গিয়েছিল ফারাও-এর একজন নারী। এবার মেয়ে আসতে বাধ্য হল। নারীর হাত ধরে বাটুর বৌ এল। রাজ্যে উৎসব লেগে গেল। ফারাও নতুন বৌকে খুব ভালোবাসতে লাগল। বৌ আরও সুন্দরী হয়ে উঠল। ফারাওকে একদিন বৌ আগের স্বামী বাটুর কথা সব বলে দিল। বৌ বিশ্বাসঘাতকতা করল। আরও বলল, দেবদারু গাছের উঁচু ডালে ফুলের মধ্যে ওর হৃদয় রয়েছে। গাছ কেটে ফেললে বাটুও মরে যাবে।

কুঠার নিয়ে ফারাও-এর লোকজন চলল বনের পথে। দেবদারু গাছের উঁচু ডাল তারা কেটে ফেলল। ফুল ছিঁড়ে ফেলল। ওখানেই ছিল বাটুর হৃদয়। সঙ্গে সঙ্গে বাটু মরে গেল।

এদিকে আনুপও আর বসে রইল না। সে জলের একটা পাত্র নিয়ে পানীয় ও খাবার নিয়ে রওনা দিল বনের পথে। হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতে খুঁজতে শেষকালে বড় ভাই পৌঁছে গেল পাহাড়ী দেবদারু বনে। খুঁজে পেল বাটুর ছোট্ট ঘর। ঘরে ঢুকে দেখে, ভাই শুয়ে রয়েছে। নিথর দেহ। আনুপ ভাইয়ের এমন অবস্থা দেখে খুব কাঁদতে লাগল। তারপরে ঘর থেকে বেরিয়ে গাছের নিচে নিচে ঘুরতে লাগল। ভাইয়ের হৃদয়কে সে খুঁজছে। তিন বছর ধরে সে খুঁজল, কিন্তু হৃদয় পেল না। ভাবল, আর খুঁজে লাভ নেই, হৃদয় পাওয়া যাবে না। মন সায় দেয় না, যেতে ইচ্ছে করছে না। আবার খুঁজে ফেরে ভাইয়ের হৃদয়। আরও কিছুদিন কেটে গেল এমনি করে। সে ঠিক করল, কাল সকালেই চলে যাব। ও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় সে একটি ফুল দেখতে পেল। তার মধ্যেই রয়েছে তার আদরের ভাইয়ের হৃদয়। ফুলটিকে জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিল,—বসে রইল আনুপ।

সময় যায়, রাত বাড়ে। পাত্রের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ আনুপ

দেখল, ভাইয়ের নিথর দেহ কাঁপছে, হাত-পা নড়ছে। আরও কাছে গিয়ে বসল। বাটু চোখ মেলে চেয়ে দেখল, বড় ভাইয়ের দিকে চেয়ে রয়েছে ছোট ভাই। তবু ছোট ভাই উঠছে না কেন? কথা বলছে না কেন? আনুপ পাত্রের নিচে পড়ে থাকা জলটুকু খেয়ে ফেলল। বাটু উঠে দাঁড়াল, বড় ভাইকে জড়িয়ে ধরল। দুজনের চোখেই জল।

বাটু প্রতিশোধ নিতে চাইল। সে বড় ভাইকে বলল, এবার আমি হব একটা ষাঁড়, আমার মানুষের দেহ পালটে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না, আমি কে। সকাল হলেই তুমি আমাকে নিয়ে রওনা দেবে, যাবে ফারাও-এর প্রাসাদে। ওখানে রয়েছে আমার বৌ। ওখানে গেলে আমার ও তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে। কি, যাবে তো আমায় নিয়ে?

অন্ধকার কমে গিয়ে আলো ফুটছে। শেষকালে সূর্যদেবতা আকাশের নিচে দেখা দিলেন। বাটু হয়ে গেল একটা ষাঁড়। ষাঁড়ের পিঠে চেপে আনুপ রওনা দিল। পথে চলেছে দুইজন।

ফারাও-এর প্রাসাদের সামনে এসে তারা থামল। এই ষাঁড়ের রয়েছে সব সুলক্ষণ। ফারাও খবর পেয়ে বাইরে এল। পশু দেখে খুব খুশি হল। উৎসব লেগে গেল তখন। রাজ্যের কল্যাণ হবে, কেননা এ ষাঁড় মঙ্গলের দূত। বড় ভাইকে সোনা-রুপো ও অনেক ভৃত্য উপহার দেওয়া হল, এসব নিয়ে বড় ভাই যেন নিজের গ্রামে চলে যায়। ফারাও বড় ভাইকে খুব সম্মান জানাল। বড় ভাই সব কিছু নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। ষাঁড় রইল ফারাও-এর প্রাসাদে।

এক পরবের দিনে ষাঁড়কে আনা হল মন্দির-চত্বরে। সেখানে রয়েছে বাটুর বৌ। তাকে দেখে ষাঁড় বলল, আমি মরিনি, এখনও বেঁচে আছি যেমনভাবে বেঁচে থাকে সত্য।

বৌ বলল, তুমি কে?

বাটু বলল, চিনতে পারছ না? আমি বাটু। তুমি তো চাওনি আমি বেঁচে থাকি? তাই দেবদারু ডালের ফুলের কথা ফারাওকে বলে দিয়েছিলে, গাছ কাটিয়েছিলে। আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। আমি ষাঁড়রূপে বেঁচে আছি, আমি জীবিত যেমনভাবে জীবিত থাকে সত্য।

বৌ ষাঁড়ের কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অপরাধী মন তার। সে তাড়াতাড়ি মন্দির-চত্বর থেকে পালিয়ে গেল।

এমন সময় ঘরে এল ফারাও। বৌয়ের পাশেই এসে বসল। হঠাৎ বৌ বলল, রাজা, আমি আপনার কাছে যা চাইব, আপনি আমাকে তাই দেবেন বলুন। সূর্যদেবতার নামে শপথ করুন। আমি যা চাইব তাই আপনাকে দিতে হবে।

ফারাও সবকিছুই তাকে দিতে পারে। বলল, তুমি কি চাও? তুমি যা চাইবে তাই তোমাকে দেব।

বৌ বলল, এই ষাঁড়ের হৃদয় খেয়ে ফেলার অনুমতি দিন আমাকে। ষাঁড়ের কোনোই প্রয়োজন নেই। ষাঁড়কে দেবতার উদ্দেশে বলি দিন।

ফারাও ভাবতে পারেনি, বৌ এমন জিনিস চাইবে। বড় পয়মন্ত ষাঁড়! কি আর করবে ফারাও। অনুমতি দিল, সে যে কথা দিয়েছে!

পরের দিন উজ্জ্বল আলো ফেলে সূর্য উঠল। ভৃত্যরা নিয়ে এল পয়মন্ত ষাঁড়কে। তারা এবার তাকে বলি দেবে। অনেকে এল ষাঁড়ের চারপাশে। অস্ত্র হাতে তৈরি হল বৌ। ষাঁড়ের গলায় তীব্র আঘাত করল। গলা থেকে দু-ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ল। দু-ফোঁটা রক্ত পড়ল দরজার দুপাশে। তৎক্ষণাৎ রক্ত থেকে জন্ম নিল দুটো পিচ্ গাছ। মঙ্গলের প্রতীক এই দুটি গাছ। সবাই খুশি।

এমনি করে দিন যায়। একদিন ফারাও এল স্বর্ণরথে চড়ে, পেছনের রথে রূপসী বৌ। গাছ বড় হয়েছে। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে তারা চলল, দূর থেকেও গাছদুটিকে দেখা যাচ্ছে। শেষকালে আবার তারা এল গাছের নিচে। রথ থেকে নামল।

গাছ বৌকে বলল, তুমি বিশ্বাসঘাতিনী, তুমি একদিন ফারাওকে জানিয়ে দিয়েছিলে আমি কোন্ গাছের কোথায় রয়েছি। তুমি ষাঁড়রূপী আমাকে নিজে হাতে হত্যা করলে। তুমি কি রকম নারী? আমি তবু মরিনি, বেঁচে আছি, গাছ হয়ে বেঁচে আছি।

বৌ মোহিনী-চোখে ফারাও-এর দিকে চাইল। অপরূপা রূপসী নারীর মোহময়ী চোখ। রাজা চেয়ে রয়েছে বৌয়ের চোখের দিকে। চোখের ভাষায় প্রেম।

বৌ বলল, সূর্যদেবতার নামে শপথ করুন রাজা, আমি যা চাইব আপনি তাই আমাকে দেবেন। বলুন, দেবেন তো?

রাজা মাথা নেড়ে সায় দিল। বৌকে অদেয় তার কিছুই নেই। বৌ বলল, দরজার পাশের দুটো গাছকে কেটে ফেলতে আদেশ দিন। ওখানে বসানো হবে কাঠের সুন্দর ফলক।

রাজা আদেশ দিল। ভৃত্যরা গাছ কাটতে লাগল। পাশে দাঁড়িয়ে বৌ গাছ-কাটা দেখতে লাগল। মুখে তার মোহিনী হাসি। হঠাৎ কুঠারের আঘাতে গাছের এক চিলতে কাঠ এসে বৌয়ের মুখের মধ্যে ঢুকে গেল। বৌ গর্ভবতী হল। একদিন জন্মাল এক পুত্রসন্তান। বৌয়ের প্রথম সন্তান হল।

সবাই গিয়ে ফারাওকে জানাল, আপনার পুত্র হয়েছে। আনন্দ বয়ে গেল চারিদিকে। ধাত্রীর ওপরে ছেলের দায়িত্ব দেওয়া হল। উৎসব চলল অনেকদিন ধরে। ফারাও-এর প্রথম সন্তান। কিন্তু আসলে এই সন্তান বাটু ছাড়া আর কেউ নয়।

ছেলের একটা নাম রাখা হল। বাটু হলেও ছেলে ফারাও-এর ছেলে হিসেবেই

বড় হতে লাগল। বড় হয়ে সে হল ফারাও-এর প্রতিনিধি। দেশের রাজপুত্র। ফারাও-এর প্রতিনিধি হিসেবে অনেক কাল কেটে গেল। তারপর একদিন বৃদ্ধ ফারাও মারা গেল। ছেলে হল নতুন ফারাও। বাটু হল ফারাও।

একদিন ফারাও বলল, আমি এখন এই দেশের রাজা। আমি সবাইকে ডেকে সত্য প্রকাশ করে দেব। আমার কথাও বলব, বলব রানীর কথাও।

সবাই এল। রানীও এল। ফারাও বৌকে বলল, আমি বাটু, তুমি নানা সময়ে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারনি। আমি আজও জীবিত। ফারাও হয়ে বেঁচে রয়েছি।

ফারাও 'মাকে' হত্যা করার আদেশ দিল। বিশ্বাসঘাতিনীকে বাঁচিয়ে রাখতে নেই। বৌ মরে গেল।

বাটু গ্রাম থেকে দাদাকে ডেকে আনল। আনুপ হল গোটা রাজ্যের রাজা। সে হল মিশরের রাজা। তিরিশ বছর পরে আনুপ মারা গেল। তারপরে রাজা হল বাটু। ফারাও বাটু।

'দুই ভাইয়ের গল্পের' মধ্যে সেইকালের মিশরের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক রীতিনীতির অনেক আভাস পাওয়া যায়। গ্রামের মানুষ ছিল কৃষিজীবী, তারা নিজেরাই চাষ করত, আবার জমিতে বাড়তি লোক নিয়োগ করত। ষাঁড় ছিল পবিত্র পশু, কৃষিজীবনের ব্যাপক প্রভাব ছিল বলেই ষাঁড়কে পয়মন্ত জ্ঞান করা হত। নৈতিক মূল্যবোধ বেশ দৃঢ় ছিল, অন্তত কৃষিজীবীদের মধ্যে। বৌদি দেহদানের প্রস্তাব করা সত্ত্বেও ছোট ভাই ঘৃণায় তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার কামনায় জর্জরিত হয়ে নারী স্বামীর কাছে মিথ্যা অভিযোগও করেছে। এ যেন আজকের মানুষের প্রতিচ্ছবি। মানুষের মনের এই অন্ধকার দিকটি সেকালেও সক্রিয় ছিল, যেমন সক্রিয় ছিল বাটুর নৈতিকতা। সামন্তপ্রভু ইচ্ছা করলেই লোকবলের দ্বারা অন্য বিবাহিতা নারীকেও নিজের করে নিতে পারত। দুর্বল মানুষের প্রতিবাদের উপায় ছিল না। একটি দার্শনিক বক্তব্যও প্রকাশ পেয়েছে,—যেমনভাবে সত্য বেঁচে থাকে। সেকালের সামাজিক অবস্থায়ও মানুষ সত্য সম্পর্কে এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন। বিস্ময়কর উপলব্ধি। মানুষের দেহ থেকে হৃদয় বা আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার যে আদিমতম বিশ্বাস তা সেকালের মিশরীয় সমাজেও প্রচলিত ছিল। মানুষ নিজের দেহের পরিবর্তন ঘটাতে পারে,—এই পৌরাণিক বিশ্বাসের প্রভাব রয়েছে এই গল্পে। সত্যি কথা বলতে কি, সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লেখা এই লোককথার মধ্যে আধুনিক ছোটগল্পের মানসিকতার এক আশ্চর্য মিল রয়েছে।

ইউরোপে আধুনিক কালে দুই ভাইয়ের যে লোককথা সংগৃহীত হয়েছে তার সঙ্গে মিশরীয় এই লোককথাটির মনোভঙ্গির মিল রয়েছে। মূল কাহিনী অংশে তেমন মিল নেই, হয়তো বা প্রত্যক্ষ কোনো যোগসূত্রও নেই। তবু

সাদৃশ্য কিছুটা বিস্ময়কর। এশিয়ার বিভিন্ন অংশেও এই ধরনের লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। লোকসংস্কৃতিবিদ সি. ডাবলিউ. ফন সাইডো মনে করেন, হয়তো আদিতে কোনো একটি ইন্দো-ইউরোপীয় লোকপুরাণ ছিল যা নানাভাবে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আদিরূপের বিকৃতি বা বিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাই কালের বিবর্তনে কাহিনীও বিবর্তিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু গল্পের কাঠামোতে ভিন্নতা থাকলেও অধিকাংশ মোটিফে হুবহু মিল রয়েছে। এই ধরনের লোককথায় আমরা এই মোটিফগুলো পাচ্ছি ঃ কথা-বলা গোরুর কাছ থেকে উপদেশ বি২১১, বাধা অতিক্রম ডি৬৭২, বিচ্ছিন্ন হৃদয় ই৭১০, অশুভ ভবিষ্যৎবাণী এম৩৪০, অদেখা নারীর কেশগুচ্ছ দেখে প্রেমে পড়া টি১১. ৪. ১, স্বামীর গোপন বিষয়ে স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতা কে ২২১৩.৪, উপচে পড়া মদের পাত্র ই৭৬১.৬.৪, হৃদয়কে পুনর্জীবিত করা ই৩০, বারবার শরীর গ্রহণ ই৬৭০, নিজের দেহকে পালটে ফেলে আবার জন্মানো ই৬০৭.২, কথা-বলা পশু বি২১০।

লোকসংস্কৃতি-চর্চার ক্ষেত্রে এই লোককথাটি নানা দিক থেকেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, খ্রীস্ট জন্মের প্রায় তের শ' বছর আগের একটি লোককথায় এতগুলি মোটিফের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে।

এর পরবর্তী কালের আরও অনেক লোককথা লিখিত আকারে আবিষ্কৃত হয়েছে। সবই প্যাপিরাসের ওপরে লিখিত। এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে কিছু পশুকথা ও নীতিকথা। কিছু পশুকথার সঙ্গে গ্রীসের ঈশপের গল্পগুলোর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকে বিশ্বাস করেন, ঈশপের লেখা গল্পগুলোর সঙ্গে লোক-ঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই, সেগুলি ঈশপের নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু প্যাপিরাসের ওপরে উৎকীর্ণ পশুকথাগুলি আবিষ্কৃত হবার পরে একথা আর তেমন জোর দিয়ে বলা যায় না। লৌকিক কোনো ঐতিহ্যের পথ বেয়ে সেগুলো নিশ্চয়ই ঈশপের কাছে পৌঁছেছিল।

গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস মিশরীয় অনেক লোককথা শুনে তা লিপিবদ্ধ করে যান। তিনি ৪৮৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে এশিয়া মাইনরে জন্মেছিলেন। সেই সময় সেই অঞ্চলে শুরু হয় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, তাই অল্প বয়সেই অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। মরুভূমি পেরিয়ে যান ব্যাবিলনে, তারপরে নীল নদের অববাহিকায় মিশরে, শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণসাগর পেরিয়ে পৌঁছলেন গ্রীসে। এর আগে গ্রীসের কোনো মানুষ এত বিচিত্র পথ অতিক্রম করেন নি, অন্তত লিখিত কোনো নথিপত্র নেই। পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র মানুষজন, বিচিত্র লোকাচার-ঐতিহ্য দেখেই তিনি লোকসমাজ সম্পর্কে উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। 'পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস'ই তিনি শুধু লেখেন নি, ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস প্রাচীন মিশরের অনেক লোককথাও

লিপিবদ্ধ করে যান। হেরোডোটাসের 'পারস্য যুদ্ধের ইতিহাস' আধুনিক অর্থে পুরোপুরি ইতিহাস নয়। এটা ইতিহাস-ভূগোল-নৃকুলবিদ্যা এবং লোকসংস্কৃতির মিশ্রিত রূপ। তিনি যেসব লোককথা ও বীরকথা লিপিবদ্ধ করেন তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 'রাম্পসিনিটাসের রত্নগৃহ'। তিনি মারা যান ৪২৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। এ গল্প দু'হাজার চারশ' বছর ধরে বেঁচে রয়েছে তারই প্রচেষ্টায়।

প্রাচীন ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হরপ্পা ও মহেনজোদারো অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত হরপ্পা লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। প্রাক্-বৈদিক এই সিন্ধু-সভ্যতার যে সমস্ত খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার অনুমান-নির্ভর অর্থোদ্ধারের চেষ্টা অনেকেই করেছেন। কিন্তু সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাঠ আজও স্বীকৃত হয়নি। খ্রীস্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দের হরপ্পার দীর্ঘতম লিপিমালার পাঠোদ্ধার করেছেন ফাদার হেরাস। কিন্তু সে পাঠকে পণ্ডিতজনেরা মেনে নেননি। সেই পাঠে কিছু যুক্তি থাকলেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এইসব লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার না হলে জানা যাবে না, হরপ্পা ও মহেনজোদারোয় কোন লোককথা লিপিবদ্ধ রয়েছে কিনা। মিশরীয় লিপির অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলেই প্রাচীন মিশরীয় লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতার সময়কালের কোনো লোককথা উৎকীর্ণ রয়েছে কিনা তার জন্য কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে!

প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথার সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হল জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথামঞ্জরী, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর ও পিলপের নীতিকথা। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও পিলপের নিতিকথা নির্ভেজাল লোককথার সংকলন। কিন্তু জাতক গ্রন্থের অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যদিও প্রাসঙ্গিকভাবে অসংখ্য লোককথা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অন্য তিনটি গ্রন্থের মতো জাতক শুধুই লোককথার সংকলন গ্রন্থ নয়।

এই সব গ্রন্থ ছাড়া লোককথার অন্য কোনো লিখিত উৎস কি প্রাচীন ভারতবর্ষে রয়েছে? প্রত্যক্ষ উৎস নেই ঠিকই, কিন্তু আমাদের প্রাচীনতম দুটি মহাকাব্য থেকে লোক-ঐতিহ্যের এই বিষয়টির উৎস সন্ধান করতে হবে। আর এ বিষয়ে দুটি মহাকাব্যেই রয়েছে অসংখ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভারতবর্ষের আদি লিখিত মহাকাব্য রামায়ণের মূল ভিত্তিই হল লৌকিক কাহিনী। সুতরাং রামায়ণের সমস্ত অবয়ব জুড়েই রয়েছে লোক-উপাখ্যান। রামায়ণ রচনার কাল নিয়ে মতবিরোধের অবসান আজও ঘটে নি। তবু একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, বাল্মীকি কোনোভাবেই চতুর্থ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের পরবর্তীকালের মানুষ নন। অর্থাৎ রামায়ণ রচিত হয়েছিল ৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ সময়কালে। তার আগেও হতে পারে, কিন্তু কখনই পরবর্তীকালে নয়। তবে, অনেকে অনুমান করেন, ২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রামায়ণে অনেক পরিবর্তন ঘটে। মূল কাব্যাংশ বাল্মীকির সৃষ্টি হলেও বহু কবি বা কথক কালে কালে কাব্যের অনেক পরিবর্তন ঘটান।

মহর্ষি বাল্মীকি সেকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় কথক ও চারণকবি নারদের কাছে প্রথম বিস্তৃতভাবে গুণবান্ বিদ্বান মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ও সৎচরিত্র রামচন্দ্রের কথা শোনেন। অর্থাৎ চারণকবি আদিকবিকে রামচন্দ্রের যে জীবনবৃত্তান্ত শোনালেন তা রামায়ণ রচনার আগেই লোকসমাজে প্রচলিত ছিল। রামচন্দ্রকে নিয়ে প্রথমেই কাব্য রচনার কোনো অভিপ্রায় বাল্মীকির ছিল না। তিনি একজন গুণসম্পন্ন মানুষের কথা শুনতেই কৌতূহলী ছিলেন। যেকালে মানুষের মনোজগতে দেবতাদের স্থায়ী আসন পাতা ছিল, সেইকালে বাল্মীকি রচনা করলেন একজন মানুষের কাহিনী, যাঁকে দেখে দেবতারাও ভীত হন। পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য রচিত হল মানুষকে নিয়ে, ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটি একটি গর্ব করবার মতো বিষয়।

বাল্মীকির কৌতূহল নিবৃত্ত করতে ত্রিলোকদর্শী মহর্ষি নারদ পুলকিত মনে বললেন, তাপস! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা উল্লেখ করলে সেসব গুণ সামান্য মানুষের মধ্যে নিতান্ত সুলভ নয়। যাইহোক, এরকম গুণবান্ মানুষ এই পৃথিবীতে কে আছেন, এখন আমি তা স্মরণ করে বলছি, শ্রবণ কর।

এই মানুষটি হলেন ইক্ষ্বাকুবংশীয় সুবিখ্যাত নরপতি রামচন্দ্র। নারদ সংক্ষেপে রামকথা বিবৃত করলেন। রামচন্দ্রের জন্ম থেকে ব্রহ্মলোকে গমন পর্যন্ত জীবনকথা শোনালেন। এই কাহিনীর বিস্তৃত কাব্যময় রূপটিই বাল্মীকি প্রকাশ করলেন তাঁর মহৎ রামায়ণ মহাকাব্যে। অর্থাৎ, বাল্মীকির

কাব্যের উপাদান ও কাহিনীটি মৌলিক নয়, লোকসমাজের কাহিনী বাল্মীকির প্রতিভায় নতুন রূপে বিকশিত হল।

নারদের কাছে রামকথা শুনে বাল্মীকি অল্পক্ষণ আশ্রমে অবস্থান করে ভাগীরথীর কাছে স্রোতস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হলেন। তিনি নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখে শিষ্য ভরদ্বাজকে বললেন, বৎস! দেখ, এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও স্বচ্ছ, আমাকে বল্কল দাও, আমি এই নদীতে স্নান করব। বল্কল নিয়ে মুনি তীরবর্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করতে করতে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন।

সেই বনের মধ্যে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুর স্বরে গান গেয়ে সুস্থ শরীরে বিহার করছিল। এই অবসরে অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ এসে হঠাৎ ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করল। তখন ক্রৌঞ্চী ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত দেখে এবং সেই তাম্র-শীর্ষ কামোন্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সঙ্গে চিরবিরহ জ্ঞান করে কাতরস্বরে কাঁদতে লাগল। ধর্মপরায়ণ বাল্মীকি সম্ভোগ-প্রবৃত্ত বিহঙ্গকে নিহত দেখে বিষাদমগ্ন হলেন। ক্রৌঞ্চীর করুণ কান্নায় তাঁর অন্তরে দয়ার সঞ্চার হল। তখন তিনি বললেন, রে নিষাদ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন থেকে কাম-মোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করেছিস, তুই কোনো কালে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারবি না।

মুনি নিষাদকে এই অভিশাপ দিয়ে বারবার চিন্তা করতে লাগলেন, আমি এই বিহঙ্গীর শোকে আকুল হয়ে কি বললাম! তারপর শিষ্যকে বললেন, আমার এই বাক্য চরণবন্ধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তন্ত্রীলয়ে গান করবার সম্যক উপযুক্ত হয়েছে, অতএব এ যখন আমার শোকাবেগ-প্রভাবে কণ্ঠ থেকে নির্গত হল তখন এ নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রথিত হবে। ভরদ্বাজ গুরুদেবের বাক্য অনুমোদন করলেন।

তারপরে তমসায় স্নান করে শ্লোকের কথা চিন্তা করতে করতে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

ধর্মজ্ঞ ঋষি বাল্মীকি নিজের আশ্রমে এসে শিষ্যদের সঙ্গে বসে শ্লোকের বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন, এমন সময় মহাতেজা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেখানে এলেন। ব্রহ্মা আশ্রমে বসে যে উপদেশ বাল্মীকিকে দিলেন তাতে রামকথার লৌকিক উৎসের বিষয়টি স্পষ্টতর হল।

ব্রহ্মা বললেন, তপোধন! তোমার কণ্ঠ থেকে যে বাক্য নিঃসৃত হয়েছে, তা শ্লোক বলেই বিখ্যাত হবে। এ বিষয়ে সংশয় করবার আর প্রয়োজন নেই। আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার কণ্ঠ থেকে এই বাক্য নির্গত হয়েছে। অতএব তুমি এখন সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের কাছে যেমন শুনেছ, সেইভাবে ধর্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষ্মণ সীতা ও রাক্ষসদের 'বিদিত ও অবিদিত' সমস্ত বৃত্তান্ত

কীর্তন কর। 'নারদ যা বলেন নি', রচনাকালে তাও তোমার স্ফূর্তি পাবে। তোমার এই কাব্যের কোনো অংশই মিথ্যা হবে না। অতএব তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবন্ধ কর।

ব্রহ্মা বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন করতে আদেশ দিয়েছিলেন। বিদিত রামকথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল আর অবিদিত বিষয়সমূহ বাল্মীকির মনের মাধুরী দিয়ে গড়া কল্পনানির্ভর কাব্যকথা।

এর পরেই রামায়ণে রয়েছে, বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের কাছে ত্রিবর্গসাধক হিতজনক সমগ্র রামচরিত শ্রবণ করে 'পুনরায়' সেই ধীমান রামের 'ইতিবৃত্ত' প্রকৃতরূপে জানতে ইচ্ছা করলেন এবং যোগবলে তা অনুসন্ধান করতে লাগলেন। নারদ কর্তৃক 'পূর্বকীর্তিত' রামচরিত রচনায় তখন আত্মনিয়োগ করলেন আদিকবি। 'যোগবল' শব্দটি ব্যবহার করা হলেও এটা কোনো অতিলৌকিক বিষয় নয়। কাব্যসৃষ্টিতে যে সাধনা প্রয়োজন, সৃষ্টির যন্ত্রণায় যে আত্মনিমগ্নতা প্রয়োজন, এখানে তাকেই যোগবল বলা হয়েছে। বিদিত পূর্বকীর্তিত পুনরায় প্রভৃতি শব্দের মধ্যেই রামকথার উৎসের সন্ধান মিলছে। রামায়ণের মতো অনন্য মহাকাব্য সৃষ্টির পেছনে স্রষ্টার দীর্ঘকালের সাধনা থাকবে, এটাই স্বাভাবিক।

নারদের বলা রামচরিত ছিল প্রতিমার খড়-কাঠ-মাটির কাঠামো, বাল্মীকির কাব্য হল অপরূপ জীবন্ত রূপলাবণ্যবতী মানবীরূপিণী রঙ-গর্জনতেলের আবরণে অনন্যা প্রতিমা। নারদ যা বলেন নি সেকথা প্রকাশ করেছেন বলেই বাল্মীকির কাব্য বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তিনি যদি শুধু নারদের বলা কাহিনী বিবৃত করতেন তবে তিনি হতেন সাধারণ লোক-সংগ্রাহক কিংবা চারণকবি। কল্পনাশক্তি, মাধুরী, স্বকীয়তা ও কবিমন ছিল বলেই তিনি হলেন মহাকবি। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর মহাকাব্যের কাহিনীর আদি উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত কাহিনী।

বাল্মীকির রামকথা রচনা বিষয়ে আর একটি পৌরাণিক 'বৃত্তান্ত' রয়েছে। আদিকবি রামকথা রচনা করবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু রামকথার বহু বৃত্তান্ত তিনি অবগত নন। আশ্রমে সাধনা করেই জীবনের বেশির ভাগ কাল কেটেছে। তাই তিনি শিষ্যদের বললেন, তোমরা ভারতভূমির চারিদিকে পরিভ্রমণ কর, যেখানে যেখানে রামকথা শুনবে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের ফিরে আসতে বললেন। শিষ্যেরা রামকথা সংগ্রহ করে একদিন ফিরে এল, কবি সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে অপরূপ কাব্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করলেন। সৃষ্টি হল রামায়ণের।

এই বৃত্তান্তে খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ভারতভূমির নানা দিগন্তে

লোকসমাজের মধ্যে রামকথা প্রচলিত ছিল। সেই লৌকিক রামকথা শুনে তাকে কাব্যময় ভাষায় নতুনভাবে রূপ দিলেন আদিকবি।

রামায়ণে রামের যে জীবন কবি অঙ্কিত করলেন, সেই জীবনকাল অনেক কাল আগেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে,—এই ইংগিত রয়েছে কাব্যের মধ্যেই। রামকথা আগে থেকেই সকলে জানতেন, বাল্মীকি তাকে 'সংকলন' করে কাব্যরূপ দিয়েছেন একথাও জানানো আছে কাব্যের মধ্যেই।

একদিন মহাভাগ মহাত্মা কুশ ও লব সভামধ্যে সমবেত বিশুদ্ধস্বভাব ঋষিগণের সামনে এই মহাকাব্য গান করতে লাগলেন। বাল্মীকিই এই দুই ভাইকে রামায়ণ গান শিখিয়েছিলেন। এই সংগীত শুনে সকলেই প্রীত ও বিস্মিত হলেন। তারা গানের প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, অহো! গানের কি মাধুরী! শ্লোকগুলোও কি মনোহারী হয়েছে! 'বহুকাল হল রামের এসব কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে', তবু অধুনা যেন সেসব প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমান হচ্ছে।

সত্যবাদী ঋষিগণ কুশ ও লবকে আশীর্বাদ করে বললেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান 'সংকলন' করেছেন, তা অতি চমৎকার হয়েছে এবং প্রবন্ধ-রচনা বিষয়ে এ কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হবে।

আগে থেকেই রামকথা প্রচলিত না থাকলে শিক্ষিত বিদগ্ধ ঋষিরা কখনই উপাখ্যানটিকে 'সংকলন' বলতেন না।

রামায়ণের কাহিনীটি যদি মৌলিক হত, মহাকবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি হত তবে মহাভারত ও জাতকে তার উল্লেখ এমনভাবে থাকত না। আসলে লৌকিক উৎস থেকেই নিরপেক্ষভাবে তিনটি প্রাচীন সাহিত্যে রামকথা স্থান পেয়েছে। মহাভারতকার রামকথা বিবৃত করবার সময় কোথাও বাল্মীকির উল্লেখ করেন নি। কেননা, তিনি যে রামকথা শুনিয়েছেন তা সংগ্রহ করেছিলেন লৌকিক ঐতিহ্য থেকে।

শান্তিপর্বের একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়ে দশরথতনয় রামচন্দ্রের বিবরণ রয়েছে এইভাবে: দশরথতনয় রামচন্দ্রকে দেহত্যাগ করতে হয়েছে। ঐ মহাত্মা নিয়ত পুত্রের ন্যায় প্রজাদের প্রতিপালন করতেন। তাঁর রাজত্বসময়ে কোনো কামিনীই বিধবা বা অনাথ ছিল না। মেঘ সময়মত বারিবর্ষণ করাতে তাঁর রাজ্যে প্রচুর ফসল হত, কখনই দুর্ভিক্ষ হয়নি। অকালমৃত্যু অগ্নিদাহ বা রোগভয়ের সম্পর্কও ছিল না, প্রজারা ছেলেপেলে নিয়ে হাজার বছর পর্যন্ত সুস্থদেহে বেঁচে থাকত। ঐ সময় সকলেই কর্মপটু ছিলেন। পুরুষদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ দূরে থাক, কামিনীদের মধ্যেও কখনও বিবাদ হত না। প্রজারা সকলেই ধার্মিক সন্তুষ্টচিত্ত নির্ভীক ও স্বেচ্ছাচারী ছিল। গাছে সবসময় ফলফুল ধরে থাকত। সব গাভীরই কলস-ভর্তি দুধ হত। মহাতপা রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনে বাস ও অবাধে ত্রিগুণ

দক্ষিণাযুক্ত দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। ঐ মহাত্মা শ্যামাঙ্গ লোহিত নেত্র আজানুলম্বিতবাহু সিংহস্কন্ধ ও সুন্দর মুখশ্রীসম্পন্ন এবং মাতঙ্গতুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি অযোধ্যার অধিপতি হয়ে একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্য প্রতিপালন করেন।

আবার বনপর্বের অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ে রামকথার বিবরণ রয়েছে। হনুমান ভীমসেনকে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, আমাকে জানবার জন্য তোমার খুব কৌতূহল হয়েছে। অতএব আমার সমুদয় বৃত্তান্ত বলছি। আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার নাম হনুমান। অনেক কাল আগে বানররাজ সুগ্রীবের সঙ্গে আমার প্রণয় জন্মেছিল। সুগ্রীব কোনো কারণে নিজের ভাই বালীর কাছে অপমানিত হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে আমার সঙ্গে বহুদিন বাস করেছিলেন। তখন বিষ্ণু মানুষরূপে দশরথের ঔরসে জন্ম নিয়ে রাম নামে বিখ্যাত হলেন। পরে রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য স্ত্রী ও অনুজ লক্ষ্মণকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যে বাস করছিলেন। তখন রাক্ষসরাজ মহাবল-পরাক্রান্ত দুরাত্মা রাবণ সোনার হরিণরূপধারী মারীচ নিশাচর দ্বারা রামকে বঞ্চনা করে ছলনা করে জনস্থান থেকে তাঁর স্ত্রী সীতাকে অপহরণ করে।

এইভাবে মহাত্মা রামের পত্নী অপহৃতা হলে তিনি ভাইকে নিয়ে সীতার অন্বেষণ করতে করতে পাহাড়ে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখতে পেলেন। রামের সঙ্গে সুগ্রীবের বন্ধুত্ব হল। তিনি বালীকে বধ করে সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। রাজ্য পেয়ে সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য হাজার হাজার বানর পাঠালেন। তখন আমি কোটি কোটি বানরে পরিবৃত হয়ে দক্ষিণ দিকে গেলাম।

পথের মধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন, সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন। সম্পাতির মুখে সীতার খবর পেয়ে শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর পেরিয়ে রাবণ-নিকেতনে গিয়ে জনকদুহিতা সীতাকে দেখতে পেলাম। পরে প্রাসাদ প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমস্ত লঙ্কাপুরী দগ্ধ করে আবার রামের কাছে ফিরে এলাম।

আমার কথা শুনে রাম বুদ্ধি করে সমুদ্রে সেতুবন্ধ করে বহু বানর নিয়ে সাগর পেরিয়ে লঙ্কায় গেলেন। সেখানে রাবণ তার ভাই পুত্র ও বন্ধুদের হত্যা করে রামচন্দ্র নিজের ভক্ত পরমধার্মিক অনুগতবৎসল বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করলেন। তারপরে রাম পত্নীকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় ফিরে রাজ্যে অভিষিক্ত হলেন। তখন আমি রামের কাছে বর প্রার্থনা করে বললাম, হে শত্রুসূদন রাম! এই সংসারে যতকাল আপনার কথা বর্তমান থাকবে, ততদিন আমি জীবিত থাকব। রাজীবলোচন রাম 'তথাস্তু' বলে আমাকে সেই বর দিলেন। সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার

ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য-ভোগসমুদয় উপস্থিত হয়। রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্য প্রতিপালন করে স্বস্থানে গমন করেছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করে আমাকে আনন্দ দেয়।

রামায়ণ মহাকাব্য কবিকল্পনার সৃষ্টি, কিন্তু কাহিনীটি আদৌ কবির কল্পনা নয়, লোকসমাজের মেঠো কাহিনী থেকে সংকলন করা। রামায়ণ মহাকাব্য থেকে কথকের মুখেমুখে এ কাহিনী প্রচারিত হলে রামকথা একইভাবে শুনতে পাওয়া যেত। কিন্তু ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যেসব রামকথা শোনা যায় তা বাল্মীকির রামায়ণ-কাহিনী থেকে যেমন অন্যরকম, তেমনি আবার লোকসমাজের এক অংশের কাহিনী বা জনশ্রুতির সঙ্গে অন্য অংশের কাহিনীর তেমন মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন, 'রামায়ণ রচিত হইবার পূর্বে দেশে রামচন্দ্র সম্বন্ধে একটা লোকশ্রুতি নিঃসন্দেহেই প্রচলিত ছিল। রামচরিত সম্বন্ধে যে সমস্ত আদিম পুরাণকথা দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এখন তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদেরই মধ্যে রামায়ণের একটা পূর্বসূচনা দেশময় ছড়াইয়া ছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।'

রামায়ণ মহাকাব্যে লোককথার উপাদান

রামায়ণের মধ্যে এমন অনেক কাহিনী রয়েছে যা লোককথার আদলে বর্ণিত হয়েছে। লৌকিক উপাদানগুলো সরাসরি কাব্যের মধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এই উপাদানগুলো কোনোভাবেই উচ্চতর সাহিত্যের বিষয় নয়। কিন্তু লৌকিক রামকথাকে আশ্রয় করে মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে মহাকবি কিছু লোক-ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। অবশ্য কাঠামোতে লৌকিক ধারণা থাকলেও কবিকল্পনার যাদুস্পর্শে সে কাহিনীও কিছুটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। কিন্তু উৎস-রূপটি খুঁজে পাওয়া খুব কষ্টকর নয়।

রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের জন্ম-বৃত্তান্তের মধ্যে লোককথার একটি অতি-পরিচিত বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। পাপহর স্বর্গপ্রদ অন্যের অসাধ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ, পুত্রকামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, যজ্ঞীয় হুতাশন থেকে মহাবীর্য মহাবল এক মহাপুরুষের আবির্ভাব, ভগবান বিষ্ণুর দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার প্রভৃতি পুরাণকথা উচ্চতর কাব্যের বিষয়। কিন্তু এইসব গুরুগম্ভীর বিষয়ের আড়ালে লৌকিক বিষয়টি কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি।

তখন সেই পুরুষ দশরথকে বললেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করে আজ এই পায়েস পেলেন। এখন এই পায়েস স্ত্রীদের খেতে দিন। রাজা দশরথ সেই পাত্র প্রীতমনে গ্রহণ করলেন এবং দরিদ্রের অর্থ-লাভের মতো এই দৈব পায়েস পেয়ে খুব খুশি হলেন। পুরুষটি তাঁর কাজ শেষ করে আবার আগুনের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

শরৎকালে চাঁদের আলোয় আকাশ যেমন আলোকিত হয়ে ওঠে, রাজা দশরথের স্ত্রীদের মুখকমলও তেমনি সুশোভিত হতে লাগল। রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কৌশল্যাকে বললেন, প্রিয়ে! তুমি সন্তান কামনায় এই পায়েস নাও। এই বলে দশরথ তাকে অমৃততুল্য সেই পায়েসের অর্ধেকটা দিলেন। তারপর কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে তার পায়েসের অর্ধেকটা দিলেন, তারপর যে অর্ধাংশ অবশিষ্ট থাকল, রাজা তা কৈকেয়ীকে দিয়ে সুমিত্রাকে তারও অর্ধাংশ দিতে অনুরোধ করলেন। তারপর সেই পায়েস খেয়ে তারা অল্পদিনের মধ্যেই গর্ভবতী হলেন। তারপর ছয় ঋতু অতীত ও বারো মাস পূর্ণ হলে তিন রানীর খুব সুন্দর চারটে ছেলে হল।

পায়েস, গাছের শেকড় খেয়ে রানীদের ছেলে হওয়ার অসংখ্য লোককথা ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বে। বিশেষ করে ভারতে এই লৌকিক মোটিফটি খুবই জনপ্রিয়। ভারতীয় আদিবাসীদের অনেক লোককথায় গাছের শেকড়-বাটা খেয়ে গর্ভবতী হওয়ার কথা রয়েছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'কলাবতী রাজকন্যা' রূপকথার কথা মনে পড়বে।

"একদিন রাণীরা নদীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, এমন সময় এক সন্ন্যাসী এসে, বড়রাণীর হাতে একটি গাছের শিকড় দিয়া বলিলেন,—এইটি বাটিয়া সাত রাণীতে খাইও, সোনার চাঁদ ছেলে হইবে।

পাঁচ রাণী পাকশালে রহিলেন, ন-রাণী কুয়োর পাড়ে গেলেন, ছোটরাণী পাঁশগাদার পাশে মাছ কুটিতে বসিলেন।

সন্ন্যাসীর শিকড়টি বড়রাণীর কাছে। বড়রাণী দুয়োরাণীকে ডাকিয়া বলিলেন, বোন, তুই বাটনা বাটিবি, শিকড়টি আগে বাটিয়া দে না, সকলে একটু একটু খাই।

দুয়োরাণী শিকড় বাটিতে বাটিতে কতটুকু নিজে খাইয়া ফেলিলেন। তাহার পর, রূপার থালে সোনার বাটি দিয়া ঢাকিয়া, বড়রাণীর কাছে দিলেন। বড়রাণী ঢাকনা খুলিতেই আর কতকটা খাইয়া মেজরাণীর হাতে দিলেন। মেজরাণী খানিকটা খাইয়া, সেজরাণীকে দিলেন। সেজরাণী কিছু খাইয়া, কনেরাণীকে দিলেন। কনেরাণী বাকীটুকু খাইয়া ফেলিলেন। ন-রাণী আসিয়া দেখেন, বাটিতে একটু তলানী পড়িয়া আছে। তিনি তাহাই খাইলেন। ছোটরাণীর জন্য আর কিছুই রহিল না।

দশ মাস দশ দিন যায়, পাঁচ রাণীর পাঁচ ছেলে হইল। এক এক ছেলে যেন সোনার চাঁদ।"

ভারতীয় লোককথায় একটি মোটিফের দেখা মিলেছে অসংখ্যবার। কোনো রাজা বা সর্দার না জেনে কোনো অপরাধ করে বসেন। এই অপরাধের জন্য তিনি শাপগ্রস্ত হন। কিন্তু যে বিষয়ে তাকে শাপ দেওয়া হল, সেটাই তার জীবনে অনুপস্থিত। কিন্তু যিনি শাপ দিলেন, তার কথা তো ব্যর্থ হবার নয়। তাই এসব ক্ষেত্রে সেই শাপগ্রস্ত মানুষটি আপাতত লাভবান হন, কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও দুঃখ ভোগ করতে হয়। এই মোটিফটির সন্ধান মিলেছে রামায়ণের অন্ধমুনির উপাখ্যানে। এই উপাখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লোককথার সমস্ত রূপরীতি নিয়েই এটি রামায়ণে সংকলিত হয়েছে এবং নিপুণভাবে মূল কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গিয়েছে। এখানেই আদিকবির বিশিষ্টতা।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ত্রিষষ্টিতম সর্গে দশরথ এই অভিশাপের কথা ব্যক্ত করেন। রাম বনবাসে চলে গিয়েছেন, তিনি শোকে মৃতপ্রায়। সেই মুহূর্তে যৌবনকালের সেই অপরাধের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি শোকাকুলা কৌশল্যাকে বললেন ঃ

আমি তখন কুমার, ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি। সেই সময় শব্দমাত্র শুনে লক্ষ্যভেদ করতে পারতাম। এই জন্য লোকে আমাকে শব্দবেধী বলত। সেই সময়ে আমি এই পাপের কাজ করি। আমার এই যে দুঃখ, তা নিজের কর্মদোষে। যেমন কেউ না জেনে পলাশ ফুলে মোহিত হয়, আমি তেমনি না জেনেই শব্দ শুনে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে শিখেছিলাম। আমি তখন যুবরাজ। বর্ষাকাল এল। চলে গেলাম সরযূতীরে। চারিদিকে অন্ধকার। ঐ অদৃশ্য সরযূর জলের মধ্যে হাতির গলার আওয়াজের মতো কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনলাম। সেই শব্দ শুনে আমার মনে হল, এটা নিশ্চয়ই হাতি। তাকে বধ করতে আমি শব্দ লক্ষ্য করে তীর ছুড়লাম। তীর ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন বনবাসীর হাহাকার স্পষ্ট শুনতে পেলাম। তিনি আমার তীরে আহত হয়ে জলে পড়ে গিয়ে বললেন, আমি একজন তাপস, আমার দিকে কে তীর ছুড়ল ? আমি রাতে নদীতে জল নিতে এসেছিলাম, এ সময় কে আমাকে আঘাত করল ? আমি তার কি অপকার করেছি ? আমি বনের মধ্যে ফলমূল খেয়ে জীবন ধারণ করি, অন্যের কষ্ট হয় এমন কোনো কাজ আমি করিনা। আমার মাথায় জটা, পরনে বল্কল আর চামড়া। আমাকে বধ করতে কার ইচ্ছে হল ? আমি কি ক্ষতি করেছিলাম ? প্রাণনাশ হল বলে আমি অনুতাপ করিনা, কিন্তু আমার প্রাণ গেলে বুড়ো বাবা-মায়ের কি দুর্দশা হবে সেই কথা চিন্তা করেই দুঃখ হচ্ছে।

রাত্রে মুনিকুমারের সেই করুণ কথা শুনে আমার হাত থেকে তীরধনুক

পড়ে গেল। আমি শোকে ও ভয়ে বিমোহিত হলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম, তাপস তীরের আঘাতে মাটিতে শুয়ে রয়েছেন। পাশে জলের কলসী।

তাপস বললেন, আমি তোমার কোনো অপকার করিনি। তুমি আমাকে তীরে বিদ্ধ করে আমার অন্ধ বাবা-মাকেও হত্যা করলে। তারা দুর্বল অন্ধ। পিপাসায় কাতর হয়ে তারা আমার জন্য অপেক্ষা করছে। যাইহোক, তুমি গিয়ে সব কথা আমার বাবাকে বলবে। এখন তুমি আমার বুক থেকে তীরটা তুলে নাও।

আমি তীর বের করলাম। তিনি ভীত হয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপরে তার দেহ নিথর হয়ে গেল। আমি জলভরা কলসী নিয়ে আশ্রমে গেলাম। আমার পায়ের শব্দ শুনে মুনি বললেন, বৎস! তোমার এত দেরি হল কেন? তাড়াতাড়ি জল দাও। তোমার মা খুব চিন্তা করছেন। এত দেরি হল।

আমি ভয়ে ভয়ে কোনোরকমে বললাম, তপোধন! আমি আপনার পুত্র নই, আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ। আমি অতি ঘৃণ্য একটা কাজ করে ফেলেছি। নদীর জলে হাতি নেমেছে ভেবে আমি তীর ছুড়েছিলাম। পরে নদীতীরে গিয়ে দেখলাম, একজন তাপসের বুকে সেই তীর বিঁধেছে। আমি না জেনে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করেছি। যা হবার হয়েছে, আপনি এখন আমাকে আদেশ করুন।

অন্ধমুনির কথায় তাদের দুজনকে আমি সরযূতীরে নিয়ে গেলাম। মৃতদেহ স্পর্শ করে তার ওপরে তারা আছড়ে পড়লেন। তারপরে পুত্রের উদ্দেশে বললেন, তুমি আমার সত্যের বলে বীরলোক লাভ কর। যে তোমাকে বিনাশ করল, তারও ঐ রকম গতি হবে।

পরে দশরথকে বললেন, তুমিও পুত্রশোকে মৃত্যুমুখে পতিত হবে। তুমি না জেনে আমার এই পুত্রকে নষ্ট করেছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিচ্ছি যে, এইমাত্র আমার যেমন পুত্রশোক হয়েছে, এইরকম পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করতে হবে।

বহুকাল দশরথ অপুত্রক ছিলেন। কিন্তু এই অভিশাপ তো বৃথা হবার নয়। তাই তিনি পুত্রের পিতা হলেন। আপাতত অভিশাপটি আশীর্বাদ, কিন্তু পরিণতিতে অভিশাপ নেমে এলই। লোককথার এই পরিচিত মোটিফটি মহাকাব্যে সুন্দরভাবে ব্যবহার করেছেন বাল্মীকি।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আবহমান কাল থেকে লোকসমাজে অসংখ্য রামকথা লিখিত আকারে গ্রথিত হয়েছে। যাঁরা লিখিত রূপ দিলেন তারা সাধারণত লোককবি, তাদের কাব্যরীতিতে এক ধরনের অশিক্ষিতপটুত্ব রয়েছে। ভারতের আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধরনের লৌকিক রামায়ণ প্রচলিত রয়েছে। এইসব রামকথায় বাল্মীকির মূল কাহিনীটি অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ

চার ভাই, সীতা, বনবাস, রাবণের সীতাহরণ, রাক্ষসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সীতা উদ্ধার—এই মূল কাহিনী অংশটি প্রায় অবিকৃতই রয়েছে। কিন্তু যেসব উপকাহিনী মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সেগুলো বাল্মীকি রামায়ণে নেই। এর কারণ, লৌকিক কিংবদন্তিগুলো এইসব রামায়ণে স্বাভাবিকভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। স্থানীয়ভাবে যেসব কাহিনী লোকসমাজে জনপ্রিয় ছিল, লোককবি কিংবা কথক সেগুলোকেই গ্রহণ করেছিলেন। যে এলাকার রামায়ণ, সেই এলাকায় সমীক্ষা করে দেখা গিয়েছে লোকসমাজের মধ্যে রামসীতাকে কেন্দ্র করে বিচিত্র সব লোককথা প্রচলিত আছে। সেগুলোই তাদের রামায়ণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

কিছু লোককবি ছিলেন যারা সংস্কৃত জানতেন, বাল্মীকি রামায়ণ পড়ে আঞ্চলিক ভাষায় রামকথা লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু এইসব রামায়ণও কোনোভাবেই বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদিত রূপ নয়। রামকথা লিখবার সময় তারা লৌকিক উপাদানকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাদের লিখিত রামকথা সেই লোকসমাজে জনপ্রিয় হোক। তাই সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী ভালোভাবে পড়লেও জনপ্রিয় প্রচলিত কাহিনীকে কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন নি।

বাল্মীকির রামায়ণ রচনার প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহের বিষয়টি আমরা তার রামায়ণের মধ্যে থেকেই জানতে পারি। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার রামায়ণে যেসব বিচিত্র কাহিনী অংশ ছড়িয়ে আছে সেগুলো বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত রামায়ণের 'বিদিত' বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। কথক অনেক সময়েই সামনে বাল্মীকি রামায়ণের পুঁথি রেখে রামায়ণ গান করতেন। সেক্ষেত্রে মূল সংস্কৃতের কাহিনীর বিকৃতি ঘটা সম্ভব নয়। কিন্তু কথক রামকথা শোনাবার সময় এলাকার প্রচলিত কাহিনীটিই বলে যেতেন। নইলে শ্রোতারা অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হতেন। লোকসমাজের কাছে 'বিদিত' বিষয় না বললে কথক অপ্রিয় হতেন। আজও বিহার-উত্তরপ্রদেশের গ্রামীণ এলাকায় এই দৃশ্য চোখে পড়বে। সামনে খোলা রয়েছে সংস্কৃত কিংবা তুলসীদাসী রামায়ণ, কিন্তু কথক বলে চলেছেন লৌকিক রামায়ণের কাহিনী। বিহারের গিরিডি জেলার বেনিয়াডি গ্রামে ও উত্তরপ্রদেশের হরিদ্বারের কনখলে এই ধরনের কথকতা শুনেছি। কথককে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অকপটে বলেছেন, গাঁওগঞ্জের মানুষেরা তাদের বাপ ঠাকুরদার আমল থেকে এই রামকাহিনীই জেনে এসেছে, অন্যরকম বললে তারা প্রণামী পর্যন্ত দিতে চায়না, মাঝেমধ্যে প্রতিবাদ করেও বসে, বলে, রামকথা ঠিক হচ্ছে না। এই মানসিকতা স্বাভাবিক বলেই কথক কোনো ঝুঁকি নেন না, তারও জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত।

যদি বাল্মীকি রামায়ণ থেকেই সরাসরি লোকসমাজে রামকথার প্রচার হত, তবে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কাহিনী গড়ে উঠত না। সাঁওতাল আদিবাসী

রামায়ণ, বাংলাদেশ, গুজরাট, মধ্যভারত, দক্ষিণভারতের রামায়ণ কাহিনী এক নয়। আবার আরও ছোট ছোট জনগোষ্ঠীতে অন্যরকম কাহিনী রয়েছে। রামকথার মূল উৎস লোকসমাজে, তাই কাহিনীর এত বৈচিত্র্য। লোকসমাজ তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন ও রক্ষণশীল, নিজস্ব মানসিক ও মানবিক সম্পদ তারা সহজে ভুলে যায় না, পরিত্যাগও করে না। আবার বাইরের কোনো কিছুকেই সহজে গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে রামকথা প্রচলিত না থাকলে এই কাহিনীকে তারা কোনোভাবেই এমন আপন করে লালন করত না। আরোপিত কাহিনী লোকসমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। 'প্রচারিত ও বিদিত' রামকথা, লোকসমাজের লোককথার অনন্য কাব্যিক রূপ দিলেন মহাকবি বাল্মীকি।

মহাভারত মহাকাব্য

মহাভারত রচনার সঠিক কাল-নির্ণয় আজও করা যায় নি, করা সহজও নয়। প্রাচীনপন্থী অনেক পণ্ডিত মনে করেন, ৩০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মহাভারত রচিত হয়েছিল। কিন্তু এর সপক্ষে ইতিহাস-সম্মত কোনো প্রমাণ নেই। ইউরোপীয় গবেষকরা বলেছেন, মহাভারত খ্রীস্ট পূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়েছিল। আসলে মহাভারত এক সময়ে রচিত হয়নি, এক কবিরও রচনা নয়। সাম্প্রতিক কালে অধিকাংশ গবেষকের সিদ্ধান্ত, এই মহাকাব্য আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল, অন্তত মূল কাঠামোটি। খ্রীস্ট জন্মের সময়কালেও মহাভারতে নতুন নতুন রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নানা কবির রচনা এর মধ্যে থাকলেও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নামেই সমগ্র মহাকাব্যটি প্রচারিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য পাওয়া গিয়েছে, একটি ভাষ্যের সঙ্গে অন্য ভাষ্যের বিচিত্র পাঠভেদ লক্ষ্য করা যায়। সাদৃশ্যই বেশি, কিন্তু অমিলও রয়েছে।

মহাভারতকে বলা হয়েছে সংহিতা। সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহ, একত্রীকৃত, একত্রীভূত। অর্থাৎ একে সংগ্রহগ্রন্থ বলে প্রাচীনকাল থেকেই অভিহিত করা হয়েছে। এইসূত্রে বলা হয়েছে যেসব খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও ঐতিহ্য সেই কালে প্রচলিত ছিল তাই মহাভারতে সংকলিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে রামায়ণ রচনার সঙ্গে মহাভারত রচনার আশ্চর্য মিল রয়েছে। লৌকিক উপাদানই দুই মহাকাব্যের আদি উৎস। রামায়ণ

মহাকাব্যের মধ্যেই যেমন রয়েছে এর নির্দশন, তেমনি রয়েছে মহাভারতের মধ্যেও।

মহাভারত কাব্য ও ইতিহাস। মহাভারতকার নিজেই সেকথা বলেছেন। সত্যবতীসুত ব্যাসদেব প্রজাপতি ব্রহ্মাকে বলেছেন, ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছি। ব্রহ্মা বললেন, তুমি জন্মাবধি সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা ব্যবহার করনি, তুমি সবসময় ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করে থাক, এখন যখন নিজের রচিত মহাভারতকে কাব্য বলে নির্দেশ করলে, তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলে পরিগণিত ও প্রখ্যাত হবে। তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই।

বেদব্যাস আবার নিজেই একে ইতিহাস বলেছেন। তিনি ইতিহাস রচনা করেছেন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ করেছেন। আদিপর্বে মহাভারত-প্রশংসায় বলা হয়েছে, দধির মধ্যে নবনীত, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, চারবেদের মধ্যে আরণ্যক, ওষধির মধ্যে অমৃত, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, চতুষ্পদের মধ্যে ধেনু যেরকম শ্রেষ্ঠ, ইতিহাসের মধ্যে বেদব্যাস রচিত মহাভারত সেরকম শ্রেষ্ঠ। তাই মহাভারত কবি-কল্পনায় সৃষ্ট শুধু মহাকাব্য নয়, সেকালের ইতিহাসও। এই ইতিহাসে লোকমানসের প্রতিচ্ছবিও রয়েছে।

সেকালের অনেক প্রচলিত আখ্যান সংকলন করলেন বেদব্যাস। এই আখ্যান বেদব্যাসের আগেও অনেক কবি শুনিয়ে গিয়েছেন। সেসব পুঁথি কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। তবে মহাভারতের কাহিনীও যে আগে থেকেই জনসমাজে প্রচারিত ও বিদিত ছিল তার প্রমাণ মহাভারতেই রয়েছে। মহাভারতের কাহিনীর উৎসস্থল লোকসমাজ।

আদিপর্বে 'নৈমিষারণ্যে সুতের আগমন' অংশে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। লোমহর্ষণ-পুত্র পৌরাণিক সৌতি ছিলেন মহাভারতকথক। তিনি একদিন এলেন নৈমিষারণ্যে। ঋষিরা বললেন, হে কমললোচন সুতনন্দন! এখন কোথা থেকে আসছেন? এতদিন কোথায় কোথায় ভ্রমণ করলেন? সবকিছু বিস্তারিত বলুন।

সৌতি বললেন, আমি মহাত্মা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে গিয়েছিলাম। সেখানে বৈশম্পায়নের মুখে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কথিত মহাভারতীয় কথা শুনলাম। সেখান থেকে অনেক তীর্থ দর্শন করে অনেক আশ্রমে ভ্রমণ করে শেষকালে সমন্তপঞ্চক তীর্থে গেলাম, এখানে আগে কুরু ও পাণ্ডব এবং উভয়পক্ষের রাজাদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হয়েছিল। সেখান থেকে এই আপনাদের পবিত্র আশ্রমে এলাম।

ঋষিরা বেদব্যাস কথিত ইতিহাস শুনতে চাইলেন। কেননা, এই ইতিহাস সমস্ত উপাখ্যান থেকে শ্রেষ্ঠ ও নানা শাস্ত্রের সার-সংকলন করে রচিত।

সৌতি বললেন, আমি বেদব্যাস কথিত অতি পবিত্র বিচিত্র ইতিহাস বর্ণনা

করব। এই বিশাল পৃথিবীতে কত শত মহাত্মা ঐ ইতিহাস বলে গিয়েছেন, অনেকেই বলছেন এবং ভবিষ্যতেও বলবেন।

স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের কাহিনী বেদব্যাসের কবি-কল্পনা নয়, সমাজে আগে থেকেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। লোকসমাজের লোককথা-গাথা-কিংবদন্তি-পুরাবৃত্ত একত্রিত করে বেদব্যাস নিজের কবিমন ও বৈদগ্ধ্য যুক্ত করে অনন্য কাব্য-ইতিহাস মহাভারত রচনা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' লৌকিক উপাদানের বিষয়টি চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ মহাভারত সম্পর্কে ইতিহাস-সম্মত মন্তব্য করেছেন, 'আর্যসমাজে যতকিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।'

মহাভারতের অসংখ্য আখ্যান তৎকালীন ভারতবর্ষের ব্যাপক জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল আর সেসবের সংকলিত রূপই মহাভারত। তাই মহাভারত সংহিতা।

মহাভারতে সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণ

মহাভারতের কাহিনী-গঠন অত্যন্ত জটিল। এর মধ্যে যেসব ধর্মনীতি ব্যবহারনীতি ও দর্শন আলোচনা করা হয়েছে তা উচ্চাঙ্গের চিন্তা-চেতনা-মননের ফসল। সামাজিক সভ্যতার একটি বিশেষ স্তরে না পেঁছিলে এসব চিন্তার প্রকাশ সম্ভব নয়। অথচ সৃষ্টিবিষয়ক এমন একটি লোকপুরাণের সন্ধান আদিপর্বে রয়েছে যা প্রায় আদিম সমাজের চিন্তার প্রতিফলন বলে মনে হয়। লৌকিক এই ধারণাটি উচ্চতর সাহিত্যেও স্থান পেয়েছে। লোকসমাজে প্রচলিত প্রাচীন ধারণাটি অবিকৃতভাবে মহাভারতকার গ্রহণ করেছেন।

দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ যখন সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠল, তখন একটি প্রশ্ন তাকে বারবার ভাবিয়ে তুলেছিল। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কিভাবে সৃষ্টি হল? মানুষ-পশুপাখি কিভাবে সৃষ্টি হল? এই 'কেন' ও 'কিভাবে'-র উত্তর খুঁজতেই মানুষ লোকপুরাণ সৃষ্টি করেছিল। ডিম সম্পর্কিত লোকপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন। ডিমের বিবর্তনটি প্রাচীন মানুষের কাছে ছিল পরম বিস্ময়। ডিম তো একটি জড় পদার্থ। সে নিজে নড়াচড়া

করতে পারে না। ডিমকে ভেঙে ফেললেও তার মধ্যে থেকে কোনো প্রাণী বেরিয়ে আসে না, বের হয় কিছু সাদা ও রঙিন তরল পদার্থ। অথচ কিছুকাল মায়ের বুকের তলায় থাকার পরে তার মধ্যে থেকে একটি সজীব প্রাণ ফুটে বেরোয়। অথচ খোলসের মধ্যে দিয়ে কোনোকিছুই তো প্রবেশ করানো হয়নি! নারী-পুরুষের মিলনেই প্রাণের জন্ম হয়, এক্ষেত্রে প্রাণ জন্মাচ্ছে অন্যভাবে। জীবতত্ত্বের বিষয়টি অজ্ঞাত ছিল বলেই এই ঘটনা মানুষকে বিস্মিত করেছে। আর এই বিস্ময় থেকে ডিমকে কেন্দ্র করে প্রাচীন লোকপুরাণের জন্ম হল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলিতে ডিমকে কেন্দ্র করে অসংখ্য লোকপুরাণ সৃষ্টি হয়েছে। যেখানেই ডিমের লোকপুরাণ পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এই সব সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। মহাভারতে যে লোকপুরাণটি সংকলিত হয়েছে সেটিও খুব প্রাচীন চিন্তার পরিচয় বহন করছে। আর লৌকিক কথার ভাণ্ডার থেকেই এটি মহাকাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

একেবারে আদিতে ছিল ঘোর অন্ধকার,—এই ধারণাটিও এই লোকপুরাণে রয়েছে। এটিও খুব প্রাচীন বিশ্বাস এবং নিঃসন্দেহে লৌকিক ঐতিহ্যবাহিত। ঋক্‌বেদে আছে, আদিতে দিন ও রাত্রির কোনো যবনিকা ছিল না, ছিল একমাত্র তমসা, অন্ধকারের গভীরে অন্ধকার, অস্থিরতার অবিচ্ছেদ্য তমিস্রা। প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের পলিনেশীয় আদিবাসী লোকপুরাণে আছে, আদিতে কোনো কিছুই ছিল না, চারিদিকে ছিল মহাশূন্য। আর সেই মহাশূন্যের মধ্যে ছিল ঘোর অন্ধকার। এক শক্তিধর নিয়ন্তা সেই মহাশূন্যের অন্ধকারের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি করলেন জড় পদার্থকে। তারপর গাছপালা, পশুপাখি এবং শেষকালে মানুষের আদি পিতা ও আদি মাতাকে। উত্তর আমেরিকার পুয়েবলো ইণ্ডিয়ান আদিবাসী-লোকপুরাণে আছে, আদিতে জলরাশি, ভূমি, হরিণ, ভালুক, চিতা, বৃষ্টি, বজ্র, বিদ্যুৎ, তারা, মেঘ, কুয়াশা কিছুই ছিল না, ছিল গভীর অন্ধকার। গ্রীক লোকপুরাণে আছে, সৃষ্টির আদিতে পাতালপুরীর গভীরে অন্ধকার বিরাজ করত। প্রাচীন ব্যাবিলন-সুমের-মেসোপটেমিয়ার লোকপুরাণেও অন্ধকার ব্রহ্মাণ্ডের কল্পনা করা হয়েছে। সব চিন্তাই লৌকিক ঐতিহ্য থেকে রূপ পেয়েছে।

মহাভারতের সৃষ্টিবর্ণনও এই লৌকিক চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে: প্রথমত এই বিশ্বসংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সমস্ত বস্তুর বীজভূত এক অণ্ড প্রসূত হল। ঐ অণ্ডে অনাদি, অনন্ত, অচিন্তনীয়, অনির্বচনীয়, সত্যস্বরূপ, নিরাকার, নির্বিকার, জ্যোতির্ময় ব্রহ্মা প্রবিষ্ট হলেন। অনন্তর ঐ অণ্ডে ভগবান প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং জন্ম পরিগ্রহ করলেন। তারপরে স্থাণু, স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতা, দক্ষ, দক্ষের সপ্ত পুত্র, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ মনু জন্মলাভ করেন। তারপরে জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, দশ

দিক, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু ক্রমশ সঞ্জাত হল।

অণ্ড বা ডিম মানুষের লৌকিক বিশ্বাসকে কতদূর প্রভাবিত করতে পেরেছিল যার ফলে সে বলতে পারে যে অণ্ডই সমস্ত বস্তুর বীজভূত একটি বস্তু।

মহাভারতে পশুকথা-রূপকথা

মহাভারত সংকলন করবার সময় মহাভারতকার সেই কালের অনেক লোককথাকে মহাকাব্যের প্রয়োজনে লিপিবদ্ধ করেন। যেগুলো ছিল লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যে, তিনি তার লিখিত রূপ দিলেন। এইসব লোককথার রূপরীতি ও মোটিফ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, এগুলো নির্ভেজাল লোককথা। মহাভারতে হয়তো একটি অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করা হল, সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বক্তা লোককথাটি বললেন। অন্য কোনোভাবে জটিল সমস্যার সমাধান না করে লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করা হল। যেন নীতিশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে নীতিকথার মাধ্যমে। এইসব লোককথা বলবার সময় এগুলোকে পুরাবৃত্ত, ইতিহাস, অপূর্ব ইতিহাস, পুরাতন ইতিহাস, বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বেই রয়েছে সবচেয়ে বেশি লোককথা, এগুলো যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন পিতামহ ভীষ্ম। এই লোককথাগুলি তিনি হাজার বছর থেকে দু হাজার বছরের পুরনো। লিখিত রূপ পেলেও এদের লৌকিক রূপটি কিন্তু খুব বেশি পরিবর্তিত হয়নি।

মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে শরণাগত-বাৎসল্য বিষয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনি সমুদয় শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হয়েছেন। অতএব, শরণাগত ব্যক্তিকে প্রতিপালন করলে যে মহান ধর্মলাভ হয়, তা কীর্তন করুন।

ভীষ্ম সরাসরি কোনো উপদেশ না দিয়ে একটি পশুকথা শোনান। এই পশুকথাকে ভীষ্ম বলেছেন 'পুরাবৃত্ত ও ইতিহাস'। কেননা, বহু পূর্ব থেকেই এটি প্রচলিত আছে। ভার্গব মহারাজা মুচুকুন্দের কাছে এই বিচিত্র কথা বলেছিলেন। ভীষ্ম সেই 'অপূর্ব ইতিহাস' যুধিষ্ঠিরকে শোনালেন।

পশুকথার মাধ্যমে পিতামহ বলতে চেয়েছেন, শরণাগত ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া প্রধান ধর্ম। যে ব্যক্তি শরণাগতকে আশ্রয় দেয় না, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। যে শরণাগতকে বিনাশ করে, তার মুক্তি নেই। পশুকথার মধ্যে আরও রয়েছে, যে পতিব্রতা নারী স্বামীর অনুগমন করে, সে স্বর্গসুখ অনুভব করতে সমর্থ হয়।

পৌরাণিক ভারতবর্ষের সামাজিক ধ্যান-ধারণার চিত্র ফুটে উঠেছে এই 'পায়রা ও ব্যাধের' কথার মধ্যে।

অনেক কাল আগে এক বনে থাকত এক ব্যাধ। সে ছিল খুব নিষ্ঠুর। পাখিদের লোভ দেখিয়ে যখন-তখন সে তাদের হত্যা করত। তার দেহ কাকের মতো কালো, চোখদুটো লাল টক্‌টকে, পা-দুটো ছোট, বিরাট মুখ। তার নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্য তার বৌ ছাড়া অন্য আপনজন ও বন্ধুবান্ধব তাকে ত্যাগ করেছিল।

ঐ ব্যাধ জাল নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। পাখি ধরে তাদের মেরে ফেলত আর পাখির সেই মাংস বিক্রি করত। এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল। কিন্তু ব্যাধ নিজের দোষ বুঝতে পারল না।

একদিন ব্যাধ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় আরম্ভ হল প্রচণ্ড ঝড়। একের পর এক গাছ উপড়ে পড়ছে, আকাশের রঙ কালো হয়ে উঠল, বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল। জল আর থামে না। মাটির ওপরে জল জমে গেল।

ব্যাধ ভয় পেয়ে বনের মধ্যে ঘুরতে লাগল। তার খুব শীত করছে, মনে প্রচণ্ড ভয়। কিন্তু বনের সব জায়গা জলে ডুবে গিয়েছে, দাঁড়াবার উঁচু কোনো জায়গা নেই। যে দু-একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছে সিংহ, শুয়োর ও অন্য বন্য জন্তু। প্রবল বৃষ্টিতে অনেক পাখি মরে গাছের নিচে পড়ে রইল। ব্যাধ তখনও ঘোরাঘুরি করছে।

এমন সময় সেই ব্যাধ এক মেয়ে পায়রাকে দেখতে পেল। সে বৃষ্টির জলে গাছের নিচে পড়ে রয়েছে। ব্যাধের অবস্থাও কাহিল। তবু স্বভাব যাবে কোথায়? ব্যাধ পায়রাকে ধরে নিজের খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলল। ব্যাধ সেই বনে হঠাৎ মেঘের মতো নীলরঙের একটা গাছ দেখতে পেল। বিশাল গাছ। ঐ গাছে থাকে অনেক পাখি।

আস্তে আস্তে বৃষ্টি ধরে এল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল, ঠিক যেন টল্‌টলে জলের পুকুর। সাদা আকাশে তারা ফুটল। তখন ব্যাধ মনে মনে বলল, রাত হয়ে গেল। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূরে। এই গাছের নিচেই বরং রাত কাটাই। ব্যাধ পাতা দিয়ে বিছানা তৈরি করল, একটা পাথরে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। তার আজ মনে বড় দুঃখ।

ঐ মেঘের মতো নীলরঙের বিশাল গাছে অনেক বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাস করত এক পায়রা। অনেক দিন ধরে সে ঐ গাছে বাস করছে। ঐ দিন সকালে তার বৌ খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিল। রাত হয়ে গেল তবু বৌ ফিরছে না। তার খুব চিন্তা হল। শেষে বলল, আমার বৌ এখনও কেন ফিরছে না? দিনের বেলা যা ঝড় জল হল! বৌ-এর কিছু হয়নি ত? সে যদি আর না ফেরে? তার মতো পতিপরায়ণা কে আছে? এখন আমি কি করি?

এদিকে হয়েছে কি, ব্যাধ যে মেয়ে পায়রাকে খাঁচায় ধরে রেখেছিল, সেই হল পায়রার বৌ। বৌ খাঁচার মধ্যে থেকে স্বামীর কথা সব শুনতে পেল। সে তখন মনে মনে বলল, আমার কোনো গুণ থাক বা নাই থাক, আমার স্বামী যখন আমার গুণের কথা বলছে তখন আমার খুবই আনন্দ হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর সেই বন্দী বৌ স্বামীকে ডেকে বলল, ওগো, আমি এখন তোমাকে যে কাজ করতে বলব, তা ভালোভাবে শুনে তুমি সেইমতো কাজ করবে। এই ব্যাধের খুব খিদে পেয়েছে, তার খুব শীতও করছে। এই অবস্থায় ব্যাধ এসেছে তোমার বাড়িতে। ও এখন তোমার শরণাগত, ওকে ভালোভাবে দেখাশোনা করা উচিত। আমরা পায়রার বংশে জন্মেছি, আমাদের দেহে শক্তি কম। তবু সাধ্যমতো শরণাগতকে পালন করা উচিত। তোমার ছেলেমেয়ে হয়ে গিয়েছে, তুমি তাদের মুখ দেখেছ। তাই এখন দেহের মায়া ত্যাগ করে ব্যাধকে সন্তুষ্ট কর। আমার জন্য শোক করো না। তুমি বেঁচে থাকলে অন্য বৌ গ্রহণ করতে পারবে।

বৌ-এর এই উপদেশে পায়রা খুব আনন্দ পেল। সে ব্যাধকে বলল, এখানে তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি মনে করবে তোমার বাড়িতেই তুমি আছ। তুমি কি চাও বল। তুমি আমাদের বাড়িতে এসেছ, তুমি আমাদের অতিথি। তুমি যা চাইবে আমি সাধ্যমতো তা করব।

ব্যাধ বলল, পায়রা, আমার ভীষণ শীত করছে। কি করলে আমার শীত লাগবে না তাই করো।

পায়রা গাছ থেকে নেমে এল। অনেক শুকনো পাতা কুড়িয়ে এক জায়গায় রাখল। তারপরে আগুন আনতে গেল। আগুন নিয়ে এসে পাতায় আগুন ধরিয়ে দিল। সুন্দর আগুন জ্বলে উঠল। ব্যাধ আগুন পোয়াতে লাগল। আস্তে আস্তে দেহ গরম হল, শীত কমে এল।

তখন ব্যাধ পায়রাকে বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।

পায়রা বলল, আমার বাসায় তো কোনো জমানো খাবার নেই! কি দিয়ে তোমার খিদে মেটাই? আমরা এই বনে বাস করে দিনের খাবার দিনে যোগাড় করে খাই। আমাদের কিছুই জমানো থাকে না।

পায়রা এই কথা বললেও মনে মনে তার খুব কষ্ট হল। আহা! ব্যাধের খিদে পেয়েছে। অথচ আমরা কোনো কিছুই জমিয়ে রাখতে জানি না! সে তখন ঠিক করল,—নিজের মাংস দিয়েই ব্যাধের খিদে মেটাবে। ব্যাধকে বলল, তুমি একটু দেরি কর, আমি খাবার দিচ্ছি।

এই কথা বলে পায়রা আবার শুকনো পাতা জড়ো করল। পাতায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে ব্যাধকে বলল, আমি শুনেছি, অতিথির সেবা অতি প্রধান ধর্ম। তোমার সেবা করতে আমার খুব ইচ্ছে করছে।

পায়রা এই কথা বলে সেই আগুনকে ঘিরে তিনবার ঘুরল, তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনে।

পায়রা আগুনের মধ্যে ঢোকা মাত্রই ব্যাধের মন পালটে গেল। সে মনে মনে বলল, হায়! এ আমি কি করলাম! আমি এত নিষ্ঠুর! আমি পাখি মেরে বেড়াই, তাই আমাকে সবাই নিন্দে করে। আর এখন যা হল তাতে আমার আর পাপের শেষ নেই। হায়! এমন অধর্ম করলাম?

আগুনের মধ্যে সেই পায়রাকে দেখে ব্যাধ আবার মনে মনে বলে উঠল, আমার মতো নিষ্ঠুর পাপী আর কেউ নেই। পায়রা নিজের দেহ আগুনে পুড়িয়ে আমায় শিক্ষা দিয়ে গেল। আজ থেকে ঘর-সংসার স্ত্রীপুত্র ছেড়ে আমি মরবার জন্য তৈরি হলাম। আজ থেকে আর কিছু খাব না। গরমকালে পুকুর যেমন শুকিয়ে যায়, আমার শরীরও তেমনি শুকিয়ে যাবে। খিদে পেলেও কিছু খাব না। উপবাস করে জীবন দেব।

এই কথা ভেবে ব্যাধ পাখি ধরার লাঠি-শলা-খাঁচা-জাল সব ফেলে পায়রা-বৌকে মুক্ত করে সেখান থেকে চলে গেল।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে বৌ কাঁদতে লাগল, হায়! আমি এখন কেমন করে বাঁচব? স্বামী ছাড়া বৌ-এর এমন আপনজন কে আছে? তুমি নেই, আমারও আর বাঁচতে ইচ্ছে নেই।

পায়রা-বৌ এইভাবে কাঁদতে কাঁদতে পাতার আগুনে ঝাঁপ দিল। অবাক কাণ্ড! আগুনের মধ্যে ঢুকে দেখে, তার স্বামী নানারঙের মালা, সুন্দর পোশাক ও গয়না পরে পুষ্পকরথে বসে রয়েছে। পায়রা সেই রথে বৌকে তুলে নিয়ে স্বর্গে চলে গেল। পরম সুখে তাদের দিন কাটতে লাগল।

যখন পায়রা আর পায়রা বৌ রথে করে স্বর্গের পথে উড়ে যাচ্ছিল, তখন ব্যাধ হঠাৎ ওপর দিকে চেয়ে দেখল। দেখল, ওরা দুজন সুন্দর পোশাকে স্বর্গের দিকে চলেছে। ব্যাধের মনে খুব দুঃখ হল। সে অনাহারে থেকে প্রাণত্যাগ করবেই,—একথা ভেবে এগিয়ে চলল।

কিছুদূর গিয়েই সে একটা বিরাট সরোবর দেখতে পেল। পদ্মফুলে ভরা সেই সরোবর। চারিদিকে অনেক পাখ-পাখালি। ব্যাধের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। কিন্তু সে জলের দিকে ফিরেও তাকিয়ে দেখল না। সরোবর পেরিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সেই ঘন বনে ঢোকার সময় গাছ-গাছালির কাঁটায় তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। রক্ত ঝরতে লাগল। তবু সে থামল না, বনের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ জোরে হাওয়া বইতে শুরু করল। হাওয়ার দাপটে ডালে ডালে ঘষা লেগে আগুন জ্বলে উঠল। সাংঘাতিক দাবানল। বন জ্বলে উঠল। গাছ পুড়ছে, লতা পুড়ছে, পশুপাখি পুড়ছে। সমস্ত বনই যেন আগুন হয়ে গেল।

ব্যাধের কিন্তু একটুও ভয় নেই। বনের চারিদিকে আগুন দেখে তার খুব

আনন্দ হল। যেখানে বেশি আগুন সে তার মধ্যে এগিয়ে গেল। সে চায় প্রাণ দিতে। প্রচণ্ড আগুনে ব্যাধের শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শরীর পুড়ে যাওয়াতে ব্যাধের আর পাপের একটুও বাকি থাকল না। সে স্বর্গে চলে গেল। অন্য দেবতাদের সঙ্গে সুখে-শান্তিতে থাকতে লাগল।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে জানতে চাইলেন,—রাজা যদি শত্রু-পরিবৃত হন, অনেক রাজা যদি এক রাজাকে আক্রমণ করে তবে তিনি কিভাবে আচরণ করবেন? একাকী সহায়হীন হয়েও রাজা কিভাবে শত্রুদের মধ্যে অবস্থান করবে? প্রকৃত ও কৃত্রিম মিত্রকে রাজা কিভাবে চিনবেন? কার সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করবেন? কার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন?

পিতামহ বললেন, কোনো কোনো সময় শত্রুও মিত্র হয়, এবং মিত্রও শত্রু হয়ে ওঠে। কাজের গতি সর্বদা সমান হয় না। দেশকাল বিবেচনা করে বিশ্বাস ও সন্ধি করা উচিত। প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুদের সঙ্গেও সন্ধি করতে হয়। যে মূর্খ শত্রুদের সঙ্গে কখনও সন্ধি করতে চায় না, সে সুখভোগ করতে পারে না। আর যে ব্যক্তি সময়ে মিত্রদের সঙ্গে বিরোধ ও শত্রুদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে, তার বিপুল অর্থ ও মহৎ ফললাভ হয়। আমি এই উপলক্ষে 'বেড়াল ও ইঁদুরের কথা' নামে একটি 'পুরাতন ইতিহাস' বলছি।

পিতামহ জটিল একটি বিষয় বোঝাতে লোককথার আশ্রয় নিলেন। এই লোককথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে। ভীষ্ম নিজেই বলছেন, এই বৃত্তান্তটি পুরাতন ইতিহাস, অর্থাৎ অনেক কাল আগের শোনা লোককথা। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত লোককথাটি ব্যাসদেব মহাকাব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন। মৌখিক ঐতিহ্য স্থায়ী লিখিত রূপ পেল। লোককথাটি বিশ্লেষণ করলে ভীষ্মের উপদেশের মর্মার্থ অনুধাবন করা যাবে। সন্ধি-বিগ্রহের সময়, বিপদকালে কৃত উপকারের উপযোগিতা ও মিত্রনীতি এই লোককথার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

এক ঘন জঙ্গলে এক বিরাট বট গাছ ছিল। লতা জড়িয়ে উঠেছে বটগাছকে ঘিরে। সেই বটগাছে ছিল অনেক পাখির বাসা। গাছের গোড়ায় বাস করত এক ইঁদুর। তার নাম পলিত। সে খুব চালাক। গাছের গুঁড়িতে একশ' টা গর্ত করে রেখেছিল। গাছের ডালে বাস করত এক বেড়াল। তার নাম লোমশ। সে ছিল পাখিদের যম।

এইভাবে দিন কেটে যায়। কিছুদিন পরে সেই বনে এল এক চণ্ডাল। সে সেই বনে কুটির তৈরি করে বাস করতে লাগল। সে ঐ বটগাছের কাছে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা ফাঁদ পেতে রাখত। রাত পোহালে সকালে আসত গাছের কাছে। ফাঁদে যেসব জীবজন্তু ধরা পড়ত তাদের নিজের কুটিরে নিয়ে যেত। একদিন হয়েছে কি, সেই বেড়াল হঠাৎ ফাঁদে ধরা পড়েছে। ইঁদুর তার শত্রুকে ফাঁদে পড়তে দেখেই ফোকর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আর কোনো ভয় নেই। বেড়ালের

আশেপাশে ঘুরঘুর করছে আর মাঝে মধ্যে আড় চোখে বেড়ালকে দেখছে। হঠাৎ ইঁদুর দেখতে পেল, বেড়ালের খুব কাছে খাবার জিনিস রয়েছে। বেড়ালকে তো কোনো ভয় নেই! সে লাফিয়ে তার পিঠের ওপর চড়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগল। বেড়াল আষ্টে পিষ্টে ফাঁদে বাঁধা রয়েছে।

এমন সময় অল্প দূরে খাবার খুঁজছিল এক বেজি। তার নাম হরিত। হঠাৎ ইঁদুরের গায়ের গন্ধ পেয়ে ইঁদুরের দিকে এগোতে লাগল। সেই সময় গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এক পেঁচা গাছের ডালে এল। সেই পেঁচার নাম চন্দ্রক। ইঁদুর খেতে ব্যস্ত ছিল, কিন্তু হঠাৎ পাশে ও ওপরে দুই শত্রুকে দেখতে পেল। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সে। ভাবতে লাগল, এখন প্রাণে বাঁচি কেমন করে? ভীষণ বিপদে পড়েছি। ফাঁদ থেকে নিচে নামলেই বেজি ধরবে, আর এই ফাঁদের ওপরে বসে থাকলে পেঁচা ধরবে। দুদিকেই মৃত্যু। আর এর মধ্যে যদি কোনোভাবে ফাঁদ থেকে বেড়াল বেরতে পারে, তবে তার হাত থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। কিন্তু বাঁচতে আমাকে হবেই। বিপদে ভয় পেলে তো চলবে না। বুদ্ধি খাটাতে হবে। এই বেড়াল মহা বিপদে পড়েছে। ফাঁদে আটকে আছে। এই বেড়াল ছাড়া আমার বাঁচার অন্য কোনো পথ নেই। আমার শত্রু বেড়ালও বিপদে পড়েছে। আমি ওর উপকার করতে পারি। আমার প্রাণ বাঁচাতে বেড়ালের সাহায্যই এখন একমাত্র কাজ। আমার এই শত্রু বেড়ালের উপকার করে অন্য দুই শত্রুর হাত থেকে বাঁচতে হবে। এই বেড়াল এখন ঘোর বিপদে পড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে সে আমার সঙ্গে সন্ধি করবেই। মূর্খ মিত্রের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুর সাহায্য নেওয়াই ভালো। যদি এই বেড়াল পণ্ডিত হয়, তাহলে বেড়ালের সাহায্যেই আমার প্রাণ রক্ষা পাবে।

এইসব কথা ভেবে চালাক ইঁদুর বেশ নম্র হয়ে বলল, বন্ধু, তুমি তো এখনও বেঁচে আছ। আমি আমার ও তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য তোমাকে বাঁচাতে চাই। তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। যদি তুমি আমাকে হিংসা না কর, আমার শত্রুতা না কর, তবে তোমাকে এই বিপদ থেকে বাঁচাব। আমি একটা ফন্দি এঁটেছি, তাতে তুমিও ফাঁদ থেকে মুক্তি পাবে আর আমিও বিপদ থেকে বাঁচব। তাকিয়ে দেখ, সামনে বেজি আর মাথার ওপরে পেঁচা। ওরা দুজন যাতে আমাকে আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য তুমি চেষ্টা কর। এখন তুমি আমার পরম বন্ধু। যাইহোক, এখন তোমার প্রাণের কোনো ভয় নেই। আমি বন্ধুর মতোই কাজ করব। আমি ছাড়া কেউ তোমাকে এই ফাঁদ থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমি তুমি একই গাছের নিচে-ওপরে বাস করছি। তাই একে অন্যকে সাহায্য করা উচিত। আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে বাঁচাব, কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় বিপদ থেকে বাঁচাতে হবে।

বেড়ালও কম বুদ্ধিমান নয়। সে নিজের বিপদের কথা জানে। তাই

ইঁদুরের দিকে মিটমিট করে চেয়ে বলল, বন্ধু, তুমি যে আমার প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছ, তাতে আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি মনে কর আমাদের দুজনের মধ্যে ভাব হয়েছে, তবে আর দেরি কর না। আমরা দুজনেই ঘোর বিপদে পড়েছি। এখন তাড়াতাড়ি ভাব করাই ভালো। যা হয় তাড়াতাড়ি কর। আমি বাঁধন থেকে মুক্ত হলে তোমার উপকারই করব। আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করছি। তুমি আমাকে তোমার অধীন বলে জানবে।

ইঁদুর বেড়ালের মনের কথা বুঝে বলল, বন্ধু, কি করতে হবে তাই বলছি। বেজিকে দেখে আমার ভীষণ ভয় লাগছে আর পেঁচা আমার প্রাণ নিতে এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাই আমি তোমার কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ব। তুমি আমাকে মেরে ফেল না। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার ফাঁদ কেটে তোমাকে বিপদ থেকে বাঁচাব।

বেড়াল তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আমার কোলের মধ্যে ঢুকে পড়। তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তোমার দয়াতে আমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হতে পারব। আবার জীবন ফিরে পাব। তুমি আমাকে যে আদেশ দেবে, আমি তাই মেনে চলব। দুজনে ভাব করি। তোমায়-আমায় আর কোনো ঝগড়া-ঝাটি নেই। আমার কোলে ঢুকে পড়। দেরি করলে বিপদ বাড়বে।

বেড়ালের মনের ভাব বুঝতে পেরেই ইঁদুর বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। ছোট্ট ছেলে যেমন বাবা-মায়ের কোলের মধ্যে শুয়ে থাকে। তখন বেজি ও পেঁচা বেড়াল-ইঁদুরের বন্ধুত্ব দেখে অবাক হয়ে গেল। এমন অবাক-করা বন্ধুত্ব তারা আগে দেখেনি। বুঝতে পারল, ঐ ইঁদুরকে আর খাওয়া যাবে না। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। মন খারাপ করে তারা দুজনে দুদিকে চলে গেল।

এদিকে বেড়ালের কোলের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ইঁদুর ফাঁদের দড়ি কাটতে লাগল। শিকারী চণ্ডাল পশুর নাড়ী দিয়ে ফাঁদের দড়ি তৈরি করেছিল। তবু ফাঁদ কাটতে অনেক দেরি হচ্ছে। তখন বেড়াল বলল, ভাই, তোমার বিপদ তো কেটে গিয়েছে। তবে ফাঁদ কাটতে তোমার এত দেরি হচ্ছে কেন? ব্যাধ হয়ত এক্ষুনি এখানে চলে আসবে। ভাই, তাড়াতাড়ি ফাঁদ কেটে দাও।

বেড়ালের কোলের মধ্যে থেকেই ইঁদুর বলল, বন্ধু, তুমি শান্ত হও, ব্যস্ত হয়ো না, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কোনটা ঠিক সময় তা আমি খুব ভালোভাবে জানি। সে সময় কখনই পার হয়ে যাবে না। অসময়ে কাজ শুরু করলে তাতে ফল পাওয়া যায় না। ঠিক সময়ে কাজ শুরু করলেই সবার উপকার হয়। আমি যদি অসময়ে তোমায় মুক্ত করে দি, তবে তোমার কাছ থেকে আমার বিপদ ঘটতে পারে। তাই তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, শুধু শুধু ব্যস্ত হয়ো না। ব্যাধ অস্ত্র নিয়ে এখানে এলে আমাদের দুজনেরই

ভয় লাগবে। ঠিক সেই সময়ে আমি তোমার ফাঁদ কেটে দেব। তখন তুমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে গাছে চড়বে, আমিও গাছের গর্তে ঢুকে পড়ব।

তখন বেড়াল বলল, বন্ধু, আমি যেমন তাড়াতাড়ি তোমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, তুমিও সেইরকম আমাকে এখুনি মুক্ত কর। বেশি দেরি হলে আমাদের দুজনেরই ঘোর বিপদ ঘটতে পারে। ফাঁদ কেটে দাও বন্ধু। আর তুমি যদি আমাদের আগের শত্রুতা ভেবে দেরি কর, তবে আয়ু শেষ হবে। আমি যদি না বুঝে কোনোদিন তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি, তবে এখন ক্ষমা চাইছি। তুমি আমায় মুক্ত করে দাও।

ইঁদুর বলল, বন্ধু, নিজেদের স্বার্থের জন্যই আমরা একে অপরের কথায় বিশ্বাস করেছি। আমাদের দুজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তাতে ভয়ের সম্ভাবনা আছে। বলবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করে খুব সাবধানে নিজেকে না বাঁচাতে পারলে ভয়ের ব্যাপার হতে পারে। তাই পৃথিবীতে কেউ কারও স্বাভাবিক শত্রু বা বন্ধু নেই। কেবল কাজের খাতিরেই একজনের সঙ্গে অন্যজনের বন্ধুত্ব বা শত্রুতা গড়ে ওঠে। হাতি দিয়েই বনের হাতি ধরা হয়, সেরকম অর্থ দিয়ে অর্থ সঞ্চিত হয়। কাজ শেষ হয়ে গেলে কেউ আর তার সম্মান করে না। তাই সব কাজেরই কিছুটা বাকি রেখে শেষ করা উচিত। ব্যাধ এখানে এলে তুমি আমাকে আক্রমণ না করে ভয়ে পালাতে চেষ্টা করবে। তাই ঠিক সেই সময়েই আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করে দেব। সব দড়ি আমি কেটে ফেলেছি, আর মাত্র একটা বাকি আছে। খুব তাড়াতাড়ি আমি সেটাও কেটে দেব। তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকো।

বেড়াল আর ইঁদুর এইভাবে কথাবার্তা বলছে। এমন সময় রাত শেষ হয়ে প্রভাত হল। রাত শেষ হয়ে আলো ফুটলে বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অল্প পরেই পরিঘ নামে এক কালো লম্বা-চওড়া ব্যাধ ফাঁদের দিকে এগোতে লাগল। তার সঙ্গে অনেকগুলো কুকুর।

বেড়াল সেই ব্যাধকে দেখেই ভয়ে ইঁদুরকে বলল, বন্ধু, এখন কি করবে?

বেড়ালের একথা শেষ না হতেই ইঁদুর ফাঁদের শেষ দড়ি কেটে দিল। বেড়াল ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়েই দৌড় দিল, লাফিয়ে গাছে উঠে পড়ল। ইঁদুরও দৌড়ে গাছের কোটরে ঢুকে পড়ল। ব্যাধ ফাঁদের কাছে এসে অবাক হল, চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। শেষকালে হতাশ হয়ে ফাঁদ তুলে নিয়ে বনের পথে চলে গেল।

ঘোর বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে গাছের ডালে বসে বেড়াল গর্তের ইঁদুরকে বলল, বন্ধু, তুমি আমার উপকার করেছ। তুমি আমার পরম বন্ধু। এখন তো আর কোনো বিপদ নেই। এই সুখের সময়ে তুমি কেন দূরে আছ বন্ধু? আমার সব বন্ধুবান্ধব এখন থেকে তোমায় পুজো করবে। তুমি

আমার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছ, তোমাকে পুজো করব না? তুমি আমার সব কিছুর মালিক হও। তুমি মন্ত্রী হয়ে আমাকে তোমার ছেলের মতো শাসন কর। আমি নিজের জীবন দিয়ে পণ করছি; আমার কাছ থেকে তোমার কোনো বিপদ ঘটবে না। আমি চিরকাল তোমার অধীন হয়ে থাকব।

বেড়ালের এই কথা শুনে ইঁদুর মধুর গলায় বলল, বন্ধু লোমশ, আমি তোমার সব কথা শুনেছি। তুমি যা বললে তা সবই ঠিক। এখন আমি যা বলব তা মন দিয়ে শোন। শত্রু মিত্র দুজনকেই ভালোভাবে পরখ করা দরকার। কিন্তু সেটা বড়ই কঠিন। অনেক সময় শত্রুরা মিত্র আর মিত্ররা শত্রু হয়ে যায়। এই জগতে কেউ কারও বন্ধু নেই। শুধু স্বার্থের জন্যই কেউ কারও বন্ধু হয়, কখনও শত্রু হয়। চিরকালের জন্য মিত্রতা কিংবা শত্রুতা প্রায়ই দেখা যায় না। এই জগতে সব লোকই নিজেকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। বন্ধু, তুমি ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়েই স্বার্থপর হয়ে উঠলে? তুমি এখন যে মধুর ভাষায় আমাকে ডাকছ, তা শুধুমাত্র তোমার স্বার্থের জন্য। তোমার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তার বিশেষ কারণ ছিল। কিন্তু এখন অমন ভাব জমাবার কি দরকার? তোমার খাদ্য হওয়া ছাড়া আমি তো আর কোনো কারণ দেখি না। কিন্তু তুমি যাতে আমাকে খেতে না পার, সেদিকেও আমি খেয়াল রাখব। মেঘ যেমন সব সময় নিজের আকার পালটে ফেলে, তোমার ভাবও সেইরকম। আজকেই ফাঁদে পড়বার আগে তুমি আমার শত্রু ছিলে, আবার আজই তুমি আমার বন্ধু হয়েছ। যতক্ষণ আমাদের দরকার ছিল, ততক্ষণ আমরা বন্ধু ছিলাম। দরকার ফুরিয়ে গিয়েছে, ভাবও মিলিয়ে গিয়েছে। তুমি আমার স্বাভাবিক শত্রু, কাজের খাতিরে বন্ধু হয়েছিলে। তাহলে তুমিই বল বন্ধু, এত কথা জেনেও আমি কেন তোমার ফাঁদে পা দেব? তোমার শক্তিতে আমি মুক্ত হয়েছি, তুমিও আমার শক্তিতে মুক্ত হয়েছ। আর তো কোনো দরকার নেই। আমাকে খাওয়া ছাড়া তোমার আর কোনো অভিসন্ধি নেই। আমি খাদ্য, তুমি খাদক। আমি দুর্বল, তুমি সবল। আমাকে খাওয়ার জন্যই এখন আমার এত প্রশংসা করছ। তোমার খুব খিদে পেয়েছিল বলেই খাবারের খোঁজে বেরিয়েছিলে, হঠাৎ ফাঁদে আটকা পড়েছিলে। সেই তখন থেকে কিছু খাওনি। তাই ফাঁদ থেকে ছাড়া পেয়ে তোমার আরও খিদে পেয়েছে। তাই খিদের জ্বালায় তুমি কৌশল করে আমাকে খেতে চাও। আর যদি আমাকে খেতে না চাও, তবু তোমার কাছে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা, তোমার ছেলে-বৌ আছে। তারা কেন আমাকে খাবে না? তাই তোমার সঙ্গে আর ভাব করব না। ভাব করার কারণ এখন আর নেই। তোমার ভালো হোক। আমি চললাম। তোমাকে দূর থেকে দেখেও ভয় করছে। তবে তুমি যদি আমার উপকারের কথা মনে রাখ, তবে আমি অসাবধানে থাকলেও আমাকে মেরো

না। কিন্তু মেলামেশা আমি কখনই করব না। বলবান লোকের কাছ থেকে সবসময় দূরে থাকাই ঠিক।

বেড়াল ইঁদুরের কথায় বেজায় লজ্জা পেল। তবুও বলল, ভাই ইঁদুর, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট চিন্তা করিনি। বন্ধুর অনিষ্ট কখনও করতে নেই। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ বলেই তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। তুমি কি করে ভাবলে আমি তোমার ক্ষতি করব? তুমি যদি আদেশ কর, তবে আমি—ছেলে-মেয়ে-বৌ সবাই প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর বন্ধু।

ইঁদুর গম্ভীর হয়ে বলল, লোমশ, তুমি সাধু, তুমি যা বললে আমি সব শুনলাম। কিন্তু আমি জানি, যে খুব প্রিয় তাকেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাই তুমি আমাকে পুজোই কর আর ধনদৌলতই দাও, আমি তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করব না। ওগো বেড়াল, তুমি আমাদের চিরকালের শত্রু, তোমার থাবা থেকে বাঁচাই আমাদের একমাত্র কাজ। তোমাকে কোনো কালে বিশ্বাস করব না। তুমিও নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করবে।

ইঁদুরের এই কথায় বেড়াল ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ব্যাধের কথা তার মনে পড়ল। চণ্ডালের ভয়ে বেড়াল মহাবেগে পালিয়ে গেল। ইঁদুর গর্তে লুকিয়ে পড়ল।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, পিতামহ! আপনি কি কখনও কোনো মানুষকে প্রাণত্যাগের পর পুনরুজ্জীবিত হতে দেখেছেন কিংবা শুনেছেন? অত্যন্ত কঠিন ও জটিল প্রশ্ন। তখন পিতামহ নাতির এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে 'শকুন ও শেয়ালের কথা' বললেন। লোককথার মাধ্যমে ভীষ্ম বলতে চেয়েছেন, একদিকে দৈববল ও অন্যদিকে অধ্যবসায় থাকলে আশ্চর্য ফল লাভ করা যায়। পৌরাণিক ভারতীয় দর্শনের প্রভাবে ভীষ্ম শুধুই দৈববলের কথা বলেন নি, অধ্যবসায়ের মতো একটি বাস্তব বিষয়কেও দৈববলের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই লোককথাটি রয়েছে।

এই লোককথাটির শেষাংশে পার্বতী-মহাদেবের কথা এসেছে। অথচ প্রথমাংশে এটি লৌকিক জনজীবনের লোককথার সমস্ত গুণ নিয়ে উপস্থিত রয়েছে। লোককথার শেষাংশে থাকে, শেষকালে দেবতা এসে বর দিলেন। এখানে পৌরাণিক দেবদেবী এসেছে। উচ্চতর সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় এই পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তাছাড়া, এটির প্রাণ ও গঠনরীতি নিঃসন্দেহে লৌকিক।

অনেক অনেক কাল আগে নৈমিষারণ্যে একজন লোক বাস করত। অনেক দিন পরে তার একটি ছেলে হল। কিন্তু ছেলেটি বেশিদিন বাঁচল না। সে

অল্পবয়সে মারা গেল। শুধু বাবা-মা নয়, পড়শীরাও খুব কাঁদতে লাগল। সবাই খুব ভালোবাসত ছোট্ট ছেলেটিকে।

কিন্তু কি আর করবে! শেষকালে তাকে কোলে নিয়ে শ্মশানে যেতেই হল। কিন্তু কোল থেকে কিছুতেই মাটিতে নামাতে মন চাইছে না। ছোট্ট ছেলেকে ফেলে রেখে কেউ বাড়ি ফিরতে চাইছে না। শুধুই কাঁদছে।

তাদের কান্না শুনে এক শকুন সেখানে উড়ে এল। বলল, সবাইকেই একদিন মরতে হবে। তাই এই ছেলেটিকে এখানে রেখে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। এখানে হাজার হাজার মানুষের মৃতদেহকে ফেলে রেখে আত্মীয়রা বাড়ি ফিরে গিয়েছে। জগতে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। সবাই কখনও সুখ কখনও দুঃখ ভোগ করে। দুনিয়ার নিয়ম হল, সবাইকেই একদিন মরতে হবে। আর যে একবার মারা যায় তাকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। সে আর বেঁচে ওঠে না। সূর্য ডুবে যাচ্ছে, তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

শকুনের কথা শুনে ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির পথে ফিরে চলল।

ঠিক সেই সময় গর্ত থেকে বেরিয়ে এল একটা শেয়াল। তার রঙ কালো। সে তাদের বকাবকি করে বলে উঠল, তোমরা তো ভীষণ নির্দয়, একটুও দয়ামায়া নেই তোমাদের! এখনও সূর্য ডোবে নি, দিনের আলো রয়েছে। আর এই দিনের আলোতেই তোমরা ভয় পেয়ে গেলে? ছোট্ট ছেলের স্নেহ ভুলে তোমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছ? মুহূর্তের প্রভাব অতি চমৎকার। মুহূর্তের প্রভাবে এই ছেলে আবার বেঁচে উঠতে পারে। যার আধো আধো মিষ্টি কথা শুনে তোমাদের মন ভরে যেত, সেই ছোট্ট ছেলেকে কি বলে শ্মশানে ফেলে রেখে চলে যাচ্ছ? এত তাড়াতাড়ি তার স্নেহের কথা ভুলে গেলে? হায়! এতদিন পরে আমি বুঝতে পারলাম মানুষদের একেবারে দয়া নেই, স্নেহ-মমতা নেই। দুর্বল, অভিযুক্ত ও শ্মশানে মৃত ব্যক্তির কাছে যদি আত্মীয়-স্বজন থাকে তবে কেউ তাদের আক্রমণ করতে সাহস করে না। তোমরা ওকে ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেও না।

কালো শেয়ালের কথা শুনে তারা আবার শ্মশানে ছেলেটির কাছে ফিরে এল। তখন শকুন বলল, তোমরা দেখছি বোকারও অধম। নইলে কোথাকার কোন শেয়ালের কথা শুনে ফিরে এলে? ওর না আছে বুদ্ধি, না আছে কিছু। আর তোমরাই বা কেমন ধারা মানুষ? কাঠের মত পরে আছে যে মরা ছেলে, তার জন্য এমন শোক করছ? শোক করে লাভ নেই। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য জন্ম থেকেই থাকে। তোমাদের দুর্ভাগ্য, এই ছেলে তোমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছে। আগের জন্মের ফল। আগের জন্মে সুখদুঃখ সংগ্রহ করেই তবে মানুষ জন্মায়। তাই তোমরা খুব অধর্ম করছ। শোক-স্নেহ ছেড়ে দিয়ে তোমরা বাড়ি ফিরে যাও। বৃথাই কান্নাকাটি করছ।

শকুনের এই কথা শুনে একজন পড়শী বাড়ির পথে হাঁটা দিল। তখন তাকে যেতে দেখে শেয়াল বলল, এই লোকটি বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি, শকুনের কথায় এর স্নেহ চলে গিয়েছে। এই ছেলেটি মারা যাওয়ায় তোমাদের যে কত কষ্ট হয়েছে আমি তা বুঝতে পারছি। আমার চোখও জলে ভিজে উঠছে। সব বিষয়েই চেষ্টা করা দরকার। খুব ভালোভাবে চেষ্টা করা দরকার। চেষ্টা করলে দৈববল পাওয়া যায়, দুটো মিললে কাজ সফল হয়। আর মনের বল ও নিজের ক্ষমতা দিয়ে দৈববল লাভ করা যায়। সবসময় শোক করা ঠিক না, আহা-উহু করে কোনো লাভ নেই। চেষ্টা করতে হবে। শোক করে কোনো কিছু পাওয়া যায় না, বরং চেষ্টা করলেই ফল পাওয়া যায়। তাই এই ছেলেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা চেষ্টা কর। স্নেহ ভুলে নিষ্ঠুর হয়ে কেন এখান থেকে চলে যাবে? তোমরা অপেক্ষা কর। সূর্য ডুবে গেলে হয় তোমরা ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে কিংবা এখানেই বসে থাকবে।

তখন শকুন বলল, মানুষ, তোমরা শোন। আমার বয়েস এক হাজার বছর। কিন্তু কোনোদিন কাউকে বেঁচে উঠতে দেখিনি। একবার মারা গেলে তাকে আবার বাঁচতে দেখিনি। কেউ কেউ জন্মাবার আগেই মায়ের পেটে মরে যায়। কেউ জন্মাবার পরে অনেকদিন বেঁচে থাকার পরে মরে। নানা বয়সে প্রাণী মারা যায়। সবই অনিত্য। পরমায়ু ফুরিয়ে গেলেই সে মারা যায়। অনেকের অনেক সাধ-আহ্লাদ থাকে, কিন্তু সে সব না মিটতেই তাদের চলে যেতে হয়। তাই ঐ ছেলের জন্য স্নেহ দেখিয়ে আজ আর কোনো লাভ নেই। আমার কথাবার্তা খুব কঠোর বলে তোমাদের মনে হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। যে যায় সে আর ফেরে না। তোমরা বাড়ি ফিরে যাও।

শকুনের এই উপদেশ শুনে তারা বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হল। উঠে পড়ল।

শেয়াল তাড়াতাড়ি তাদের খুব কাছে চলে এল। মৃত ছেলেকে দেখে তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমরা শকুনের কথায় এমন আদরের ছেলেকে ফেলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছ? যে মারা গিয়েছে সে-ও আবার বেঁচে উঠতে পারে। একেবারে আজগুবি কথা নয়। তোমরা এখানে সবসময় কাঁদলে হয়ত কোনো দেবতা দয়া দেখিয়ে ওকে বাঁচিয়েও তুলতে পারে।

শেয়ালের কথায় তারা আবার মাটিতে বসে পড়ল। ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আবার কাঁদতে লাগল।

তাদের কান্না শুনে শকুন আবার উড়ে এল তাদের কাছে। বলল, তোমরা অকারণে এই ছেলের দেহ চোখের জলে ভাসাচ্ছ, এর দেহকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছ। কেউ ওর ঘুম ভাঙাতে পারবে না। ও শিশু আর বেঁচে উঠবে না। শত শত শেয়াল শত শত বছর ধরে প্রাণপণে চেষ্টা করলেও ও ছেলে আর বেঁচে উঠবে না। বৃথা, বৃথা শোক করা। তবে দেবতা যদি বর দেন তবেই এই ছেলে

বাঁচতে পারে। তোমরা হাজার কান্নাকাটি করলেও ও বাঁচবে না। কান্নাকাটি করে লাভ নেই।

শকুনের কথা শুনে ছেলের পড়শীরা বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে পড়ল। ভাবল, সত্যি, এখানে থেকে আর কোনো লাভ নেই।

তখন শেয়াল বলল, এই পৃথিবী বড় ভয়ানক জায়গা, এখানে কারও নিস্তার নেই। আপনজনের মৃত্যু বড় কষ্টের। তোমাদের শরীরে কি একটুও দয়ামায়া নেই? ঐ শয়তান শকুনের কথায় তোমরা ফিরে যাচ্ছ? সুখের শেষে দুঃখ ও দুঃখের শেষে সুখ হয়। কেউ চিরকাল সুখ কিংবা চিরকাল দুঃখ ভোগ করতে পারে না। কোথায় যাচ্ছ তোমরা? দুঃখের শেষে সুখ আসতে পারে। এই ছেলে আবার বেঁচে উঠবে, তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। এই শিশুকে ত্যাগ করে কোথাও যেও না।

শকুন বলল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে। শ্মশানে ছেলেকে ফেলে রেখে তোমরা ফিরে যাও। শেয়ালেরা চিৎকার করছে। মাংসাশী প্রাণীরা চারিদিকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আঁধার ঘনিয়ে এলেই হিংস্র জন্তুরা তোমাদের আক্রমণ করবে। এ এক ভয়ানক জায়গা। শেয়ালের কথা শুনো না। আর যদি বুদ্ধির দোষে শেয়ালের কথা শোন, তবে সবাইকেই এই শ্মশানে মরতে হবে।

শেয়ালও বলে উঠল, সূর্য এখনও ডোবে নি, চারিদিকে আঁধার হয়ে আসেনি। স্নেহের টানে অন্তত ততক্ষণ তোমরা অপেক্ষা কর! মোহের বশে শকুনের নিষ্ঠুর কথা শুনো না।

এইভাবে শেয়াল ও শকুন মৃত ছেলের পড়শীদের নানা যুক্তি দেখাতে লাগল। একসময় তারা শেয়ালের কথায় সেখানে বসে পড়ে, আবার অন্যসময় শকুনের কথায় বাড়ির পথে চলে। কার কথা শোনা উচিত তা তারা ঠিক করতে পারছে না। শেষকালে শ্মশানে ছেলেকে ঘিরে বসে থাকাই স্থির হল। তারা ছেলেকে নিয়ে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারা কাঁদছেই, কাঁদছেই···।

পার্বতীর মনে খুব দয়া হল। পার্বতী শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিবের মনেও খুব কষ্ট। শিব এসে বললেন, আমি তোমাদের বর দিতে এসেছি। তোমরা যা চাও এখুনি তাই পাবে।

পড়শীরা বলল, দেবতা, এই শিশুর মৃত্যুতে আমরাও মরার মতো হয়ে পড়েছি। একে জীবন দিয়ে আমাদেরও বাঁচান।

দেবতা তখন জলের ছিটে দিয়ে বললেন, শতায়ু হও। অমনি ছেলে বেঁচে উঠল, চোখ খুলল। তারা আনন্দ করতে করতে ছেলেকে নিয়ে ফিরে চলল। আনন্দ দেখে কে!

সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের বিবরণ শোনাচ্ছেন। তাঁর বিবরণ

থেকেই আমরা এই 'হাঁস ও কাকের' বৃত্তান্তটি জানতে পারি। এই পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের কর্ণপর্বে। দুর্যোধন অনেক চেষ্টার পর মদ্ররাজ শল্যকে কর্ণের রথের সারথি হতে রাজি করালেন। দুর্যোধন মনে করেছিলেন, কর্ণের মতো যোদ্ধার সারথি যদি মহাত্মা শল্য হন তবে পার্থগণ অবশ্যই সমরে পরাভূত হবেন। কেননা, মদ্ররাজ শল্য অর্জুনের সারথি কৃষ্ণের চেয়েও উৎকৃষ্ট। ইন্দ্রের সারথি মাতলির সঙ্গেই কেবল শল্যের তুলনা করা যায়। দুর্যোধন কর্ণকে বললেন, হে মহাবীর, পূর্বে সুররাজ যেমন অসুর সংহার করেছিলেন, সে রকম তুমি এখন পাণ্ডববিনাশে প্রবৃত্ত হও। সেনাপতির পদ পেয়ে মহাধনুর্ধর কর্ণ অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে শল্যকে বললেন, আমি রথারোহণ ও অস্ত্র ধারণ করলে ক্রোধাবিষ্ট বজ্রপাণি পুরন্দরকে নিরীক্ষণ করেও ভীত হই না। আরও নানাবিধ আত্মশ্লাঘার কথা বললে শল্য বিরক্ত হলেন। তাঁর আত্মাভিমানে আঘাত লাগল। তিনিও তো কম বড় বীর ছিলেন না। শল্য কর্ণের পরাজয় ও ভীরুতার অনেক কাহিনী বিবৃত করবার পরে এই লোককথাটি শোনালেন। হাঁস কাককে পরাজিত করেছিল, কাক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করে উচ্ছিষ্টভোজী হয়েছিল। কর্ণও সেই কাকের মতো দুর্যোধনের উচ্ছিষ্ট অন্নে প্রতিপালিত হয়ে সকলকেই অবজ্ঞা করতে শিখেছে। শল্য উদ্ধত কর্ণকে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিলেন, সেই কাক যেমন বুদ্ধি করে হাঁসকে আশ্রয় করেছিল, সেরকম কর্ণ তুমিও কৃষ্ণ ও অর্জুনকে আশ্রয় করো। ঐ দুই বীরকে আর অবজ্ঞা করো না।

মানবচরিত্রের এই ত্রুটির বিষয়ে উপদেশ দিতে শল্যকে একটি লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। মহাভারতে পিতামহ ভীষ্মই যুধিষ্ঠিরকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিতে সবচেয়ে বেশি লোককথার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ভীষ্ম মহাপ্রাজ্ঞ, তাই তাঁর পক্ষে লোককথা ব্যবহার করা স্বাভাবিক। কিন্তু যোদ্ধা শল্যও লোককথা ব্যবহার করছেন, এটাই বিস্ময়ের। তৎকালীন মহাভারতীয় সমাজ-জীবনে লোককথার প্রভাব বিস্তৃত না থাকলে শল্যের মুখে মহাভারতকার এই 'বৃত্তান্ত' শোনাতেন না।

সমুদ্রপারে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজার রাজ্যে বাস করতেন এক বৈশ্য। তিনি ছিলেন দাতা, ধার্মিক, সব প্রাণীকে তিনি ভালোবাসতেন। তার ছিল অনেকগুলো ছেলে। তারা একটা কাক পুষেছিল। ছেলেদের উচ্ছিষ্ট খেত সেই কাক। তারা ছিল বড়লোক। তারা খেত দই, ঘি, পায়েস, ক্ষীর, মধু। তাই এসব ভালো ভালো জিনিসের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে কাকেরও দেমাক গেল বেড়ে। সে নিজের জাতভাই কাকদের দেখতে পারত না। তার চেয়ে অনেক ভালো ভালো সুন্দর দেখতে পাখিদেরও দুচোখে দেখতে পারত না। সবাইকেই সে নিচু চোখে দেখে, হেয় মনে করে।

একদিন কয়েকটা হাঁস সেই সাগরতীরে এল। তাদের দেখতে সুন্দর, তারা

চঞ্চল, তাদের প্রচণ্ড গতি। ছেলেরা সেই হাঁসদের দেখতে দেখতে কাককে বলল, ওহে কাক! তুমি সব পাখির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর। উচ্ছিষ্ট-খাওয়া সেই কাক ছেলেদের কথার আসল অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। তাদের ঠাট্টা বুঝতে পারল না। উলটে কাক ভাবল, ছেলেরা সত্যি কথাই বলেছে। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তার দেমাক আরও বেড়ে গেল।

কাক মনে মনে ভাবল, এই হাঁসদের মধ্যে কে সর্দার সেটা জানা দরকার। এই মনে করে সে আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। হাঁসদের কাছে এসে একটা হাঁসকে দেখে কেন যেন তার মনে হল, এই হাঁসই নিশ্চয়ই এদের সর্দার।

কাক সেই হাঁসকে বলল, এসো, আমরা দুজনে আকাশে উড়ি।

এই কথা শুনে আশেপাশের সব হাঁস হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তারা বলল, হায় কাক! কি দুর্মতি তোমার! আমরা হলাম মানসসরোবরের হাঁস, আমরা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই। বহু বহু দূরে আমরা উড়ে যেতে পারি, আমাদের ডানায় যে অসীম শক্তি। তাই দুনিয়ার সব পাখি আমাদের আদর করে, আমাদের ওড়ার শক্তি নিয়ে কখনও কেউ পাল্লা দিতে আসে না। আর তুমি কাক হয়ে কোন্ সাহসে আমাদের সঙ্গে আকাশে উড়তে চাইছ? আচ্ছা বলত, তুমি কিভাবে আমাদের সঙ্গে আকাশে উড়বে?

তখন কাকের দেমাক আরও বেড়ে গেল। সে যে হাঁসের তুলনায় কিছুই নয় তা মনে থাকল না। সে হাঁসদের কোনোই পাত্তা না দিয়ে বলল, আমি একশ' রকমের ওড়া জানি। আমি এক এক বার উড়ে একশ' যোজন পথ ওপরে উঠতে পারি। আমি তোমাদের সামনে আকাশে ওপরে উঠব, নিচে নেমে আসব, সমান গতিতে সবদিকে যাব, সাধারণভাবে উড়ব, আস্তে উড়ব, সুন্দর গতিতে, এঁকেবেঁকে, কখনও জোরে, কখনও আস্তে, অল্পক্ষণের মধ্যে একবার ওপরে একবার নিচে, পেছনে পিছিয়ে গিয়ে, ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে, প্রচণ্ড বেগে, একেবারে পাথরের মতো থেমে গিয়ে ডানা না নড়িয়ে উড়তে পারি। আমি কাকদের সবরকম ওড়া জানি। এখন বল, আমি কিভাবে আকাশে উড়ব? তোমরা যেমনভাবে বলবে, আমি সেভাবেই আকাশে উড়ব। কিন্তু খুব ভেবেচিন্তে বলবে। কেননা, তোমাদেরও সেইভাবে আমার সঙ্গে উড়তে হবে। একইভাবে দুজনকে পাল্লা দিতে হবে। ভেবেচিন্তে বল।

এইসব কথাবার্তা যখন চলছে, তখন আরও কয়েকটা কাক সেখানে উড়ে এল। তারা সব শুনতে লাগল।

কাকের কথায় তখন একটা হাঁস বলল, হে কাক! তুমি একশ' রকমের ওড়া জানো। কিন্তু আমরা একটা মাত্র ওড়ার কায়দা জানি। যেমন জানে অন্য সব পাখি। আমি ঐ একটা ওড়া জেনেই তোমার সঙ্গে আকাশে উড়ব। এখন আগে তোমার ইচ্ছেমতন তুমি আকাশে উড়ে যাও।

অন্য সব কাক হেসে হেসে বলে উঠল, এই হাঁস জানে মাত্র একটা কায়দা, ও কিভাবে কাককে হারাবে? কাক তো জানে একশ' কায়দা।

তখন কাক আর সেই হাঁস আকাশে উড়ল। কাক তার জানা অনেক কৌশল করে উড়তে লাগল। নিচে কাকেরা চিৎকার করে তাকে বাহবা দিতে লাগল। হাঁসরাও গাছের ডালে চড়ে আবার কখনও বালুতীরে উড়ে গিয়ে ওপরের হাঁসকে উৎসাহ দিতে লাগল।

হাঁস শুধু আস্তে ডানা মেলে ওপরে উঠতে চাইছে। আর তখুনি কাক অনেক জোরে উড়ে ওপরে উঠে গেল। এই দেখে নিচের কাকরা চিৎকার করে বলল, ওহে হাঁসরা, তোমাদের মধ্যে যে হাঁস ওপরে উড়তে গিয়েছে, তার দশা দেখ। সে কাকের চেয়ে পিছিয়ে পড়ছে।

আকাশের হাঁস নিচের কাকদের এই কথা শুনতে পেল। শুনতে পেয়েই সে সাগরের ওপর দিয়ে মহাবেগে উড়তে লাগল। কাক হাঁসের ওড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। একটু পরেই কাক ক্লান্ত হয়ে পড়ল। নিচে তাকিয়ে দেখে, কোনো ডাঙা নেই, কোনো গাছ নেই,—শুধুই ঘন নীল জল। হায়! এখন সে নামবে কোথায়? শুধুই সাগরজল! এদিকে ডানা আর সোজা রাখতে পারছে না। কাক ভাবল, নিচে যদি পড়ি তবে সেখানে রয়েছে প্রচণ্ড ঢেউ ও সাংঘাতিক সব জলজন্তু। আকাশের মতোই বিশাল ঐ সমুদ্র। এখন আমি অত দূরের সাগরতীরে যাব কেমন করে?

এদিকে সাগরের ওপর দিয়ে হাঁস বহু বহু দূরে চলে গিয়েছে। তারপর গতি থামিয়ে কাকের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কাক ক্লান্ত হয়ে টলতে টলতে সেই হাঁসের কাছে এল। হাঁস দেখল, কাক আর উড়তে পারছে না, এই বুঝি জলে পড়ে যাবে।

হাঁস কাককে বাঁচাবার জন্য আরও কাছে এসে বলল, হে কাক, তুমি একশ' রকমের ওড়ার কায়দা জানিয়ে গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছ। তা তুমি এখন যেভাবে উড়ছ তার নাম কি? এই ওড়ার নাম তো আগে করনি? তুমি তোমার দুটো ঠোঁট আর দুটো ডানা দিয়ে বারবার সাগরের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছ,—এই ধরনের ওড়ার নাম কি? আমি এখানে রয়েছি, তুমি তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসো।

কাক সাগরের তীর দেখতে না পেয়ে জলে ডুবতে ডুবতে কোনোরকমে বলল, হে হাঁস, আমরা হলাম কাক। কা কা শব্দ করে আমরা এখানে ওখানে উড়ে বেড়াই। এখন আমি এখানে মরতে বসেছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। হাঁস, আমাকে সাগরতীরে নিয়ে যাও।

এই কথা বলতে বলতেই কাক ঠোঁট গুঁজে জলে পড়ে গেল। তার ডানা ছড়িয়ে পড়ল জলে। সে কোনোরকমে ডানা ঝাপটাতে লাগল।

কাকের এই দশা দেখে হাঁস বলল, হে কাক, তুমি বড্ড বড়াই করে বলে-

ছিলে তুমি একশ' রকমের ওড়ার কায়দা জানো। এখন সেই কথা মনে কর। তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো উড়তে জানো, তুমি একশ' কায়দা জানো। তবে এখন আমার সাহায্য চাইছ কেন? এত কায়দা জেনেও সাগরজলে আছড়ে পড়লে কেন?

তখন কাক ওপরের দিকে তাকিয়ে হাঁসকে বলল, হাঁস, আমি অন্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে নিজেকে সোনার মতো মনে করতাম। ভাবতাম, আমি সব কাকের চেয়ে সেরা, সব পাখির চেয়ে সেরা। তাই সব কাক সব পাখিকে আমি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম। আমার ভীষণ গর্ব হয়ে গিয়েছিল। এখন জীবন বাঁচাবার জন্য তোমার সাহায্য চাইছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। আমাকে কোনো দ্বীপে নিয়ে চল। যদি প্রাণে বেঁচে কোনোরকমে নিজের দেশে যেতে পারি তাহলে আর কখনও কাউকে হেলাফেলা করব না, কাউকে অপমান করব না। তুমি আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর। বাঁচাও আমাকে।

তখন হাঁস কাকের করুণ অবস্থা দেখে নেমে এল। দু'টো পা দিয়ে জল থেকে কাককে তুলে নিল। তারপরে নিজের পিঠের ওপর বসিয়ে নিল। উড়তে উড়তে সেই সাগরতীরের দ্বীপে এসে থামল। হাঁস দ্বীপে নামতে নামতে বলল, কাক, তোমার আর কোনো ভয় নেই।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মের কাছে রাজ্যের উন্নতিকারক নীতি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। তখন ভীষ্ম জাতি পরিবর্তনে পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ, অকৃতজ্ঞের অধোগতি, নীচসম্পর্ক নিন্দা—উচ্চসম্পর্কের উৎকর্ষ এবং জাতিগুণের অনুরূপ কাজে নিয়োগ বিষয়ে জ্ঞান দিতে গিয়ে 'কুকুর ও শরভের কথা' লোককথাটি বলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে এই লোককথাটি রয়েছে। রাজ্যশাসনের মতো জটিল বিষয়ে উপদেশ দিতে পিতামহ লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন। বিষয়টি সহজে বোঝানো যাবে বলেই এই উদাহরণ প্রয়োগ করেছেন। এই লোককথাটি ভীষ্ম শুনেছিলেন তপোবনে। জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম মুনিদের কাছে এই গল্প করেন। ভীষ্ম সেই 'পুরাতন ইতিহাস' নাতি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন। লোককথাটি অনন্যসাধারণ কবি-পণ্ডিত বেদব্যাসের হাতে পড়ে উন্নত লিখিত সাহিত্যের রূপ নিয়েছে, কিন্তু লোক-কথাটির প্রাণ যে লোকসমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। লোককথার সমস্ত বিশেষত্বই রয়েছে এর মধ্যে। তপোবনে অর্থাৎ গ্রামীণ সমাজে যে এই লোককথাটির প্রচলন ছিল তা ভীষ্মের উক্তিতেই প্রমাণিত।

সংস্কৃত হিতোপদেশে 'পুনর্মূষিকো ভব' পশুকথাটির কথা মনে পড়বে। গল্পের পাত্রপাত্রী আলাদা হলেও মূল কাঠামো ও বক্তব্য এক।

অনেক অনেক কাল আগে এক বনে এক মুনি বাস করতেন। ঐ বনে

কোনো লোকজন ছিল না। গাছের ফলমূল খেয়ে মুনির দিন কাটত। বনের সব পশু মুনির আশেপাশে ঘুরে বেড়াত। বাঘ, হাতি, চিতা, গণ্ডার, ভালুক খুব হিংস্র। তারা রক্ত খায়। কিন্তু শিষ্যের মতো শান্ত হয়ে তারা মুনির কাছে আসত, মুনি কেমন আছেন জেনে যেত।

মুনির আশ্রমে এক গেঁয়ো কুকুর ছিল। ঐ কুকুর মুনির মতো ফলমূল খেত। সে প্রায়ই উপবাস করত। কুকুর খুব দুর্বল আর শান্ত ছিল। মুনিকে ছেড়ে সে অন্য কোথাও যেত না। মুনিও তাকে খুব স্নেহ করতেন।

একদিন একটা ছোট বাঘ খিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করছিল। শিকারের আশায় সে আশ্রমের কাছে চলে এল। কুকুর সেই ছোট বাঘকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, মুনি, ঐ দেখুন, কুকুরদের পরম শত্রু বাঘ আমাকে খেতে এগিয়ে আসছে। আমাকে বাঁচান।

মুনি সব বুঝলেন, কুকুরের ভয়ের কারণ বুঝলেন। বললেন, বাছা, ছোট বাঘকে আর তোমার ভয় পেতে হবে না। সে তোমাকে মারতে পারবে না। তুমি তোমার রূপ ছেড়ে দাও, তুমি বাঘের রূপ নাও।

মুনি এই কথা বলামাত্র কুকুর ছোট বাঘ হয়ে গেল। তার ভয় চলে গেল। তখন বন থেকে আসা সেই ছোট বাঘ তার সামনে আর একটা ছোট বাঘকে দেখতে পেল। একই পশু দুটি। তাই বনের ছোট বাঘের রাগ পড়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে বনের এক বিরাট বাঘ সেই ছোট বাঘের সামনে লাফিয়ে পড়ল। বড় বাঘের ভীষণ খিদে পেয়েছে। ছোট বাঘ ভয়ে মুনির কাছে দৌড় দিল। মুনি দেখলেন, ছোট বাঘ বড় বাঘকে দেখে ভয়ে কাঁপছে। তখন তিনি ছোট বাঘকে সঙ্গে সঙ্গে বিরাট বাঘ করে দিলেন। তখন বনের বড় বাঘ তার সামনে তারই মতো বিরাট বাঘ দেখতে পেয়ে শান্ত হল।

এখন হয়েছে কি, আগে কুকুর বনের ফলমূল খেত। কিন্তু বড় বাঘ হবার পরে সে ফলমূল খাওয়া একেবারে ছেড়ে দিল। তখন থেকে সে পশুরাজ সিংহের মতো বনের জন্তুদের শিকার করতে লাগল। সে মাংস খেতে শুরু করল।

একদিন সেই বাঘ একটা হরিণ শিকার করেছে। মাংস খাওয়া হয়ে গিয়েছে। সে আরামে বিশ্রাম করছে। এমন সময়ে এক বিশাল হাতি তার সামনে এল। হাতির গায়ের রঙ কালো মেঘের মতো। বাঘ সেই বিশাল কালো হাতিকে দেখে ভয়ে মুনির কাছে দৌড় দিল। মুনি তক্ষুনি বাঘকে বিশাল হাতি করে দিলেন। বনের হাতি তার সামনে তারই মতো আর একটা হাতিকে দেখে শান্ত হল। বনের হাতি বনের পথে চলে গেল। তখন থেকে মুনির সেই হাতি বাবলা আর পদ্মবনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে অনেক অনেক দিন কেটে গেল।

এমন সময় একদিন পাহাড়ী গুহার এক বিরাট সিংহ হঠাৎ সেই হাতির

সামনে এল। সেই হাতি বলবান সিংহকে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মুনির কাছে গেল। মুনি সব বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাতিকে সিংহ করে দিলেন। পাহাড়ী গুহার সিংহ তার সামনে দাঁড়ানো সিংহকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেল। সে বনে পালিয়ে গেল।

এখন সেই সিংহ মুনির আশ্রমেই থাকতে লাগল। ছোট ছোট যেসব পশু আশেপাশে ছিল, তারা প্রাণের ভয়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগল। এমনি করে আরও কিছুকাল কেটে গেল।

এমন সময় একদিন মুনির আশ্রমে এল এক শরভ। এই পশুর আটটি পা, তার গায়ে অসীম শক্তি, সমস্ত পশুপাখিকে সে মেরে ফেলতে পারে। সে এসেছে মুনির সিংহকে মেরে ফেলতে। শরভকে দেখেই সিংহ ভয়ে কাঁপতে লাগল। তখন মুনি সিংহকে শরভ করে দিলেন। তখন বন থেকে আসা শরভ আরও বলবান এক শরভকে দেখে ভয় পেয়ে সেখান থেকে বনে পালিয়ে গেল।

এইভাবে সেই শান্ত দুর্বল কুকুর মুনির দয়ায় শরভ হল। শরভ পরম সুখে মুনির কাছে থাকতে লাগল। সব পশু তার ভয়ে বন ছেড়ে পালিয়ে গেল। আগে তো প্রাণ বাঁচানো চাই। শরভ ফলমূল খেত না, খেত পশু শিকারের মাংস। তাই বনের পশুরা পালিয়ে গিয়ে বাঁচতে চাইল।

শরভের রক্তের পিপাসা খুব বেড়ে গেল। তার লোভ বেড়ে গেল। তার বুদ্ধি লোপ পেল। তার চিন্তা অন্য রকম হয়ে গেল। শরভ ঠিক করল, এবার মুনিকে মেরে তার মাংস খাবে। মুনির উপকারের কথা একেবারেই ভুলে গেল।

এদিকে মুনি শরভের মনের কথা সব বুঝতে পারলেন। যাকে তিনি কুকুর থেকে শরভ করে দিলেন তার মনে এত পাপ? তাকে এত দয়া দেখালেন, আর তার পরিণাম এই? মুনি তখন শরভকে বললেন, তুই ছিলি একটা তুচ্ছ কুকুরের বাচ্চা। আমি তোকে দয়া করে কুকুর থেকে ছোট বাঘ, ছোট বাঘ থেকে বড় বাঘ, বড় বাঘ থেকে হাতি, হাতি থেকে সিংহ ও শেষকালে সিংহ থেকে শরভ করে দিলাম। আমি স্নেহ করে তোকে ধীরে ধীরে সবচেয়ে বলবান পশু করে দিলাম। আর এখন তুই আমাকে মেরে ফেলতে ফন্দি করেছিস? তুই আবার কুকুর হয়ে যা।

মুনির কথা শেষ হতেই সেই বিশাল শরভ আবার কুকুর হয়ে গেল। কুকুর হয়েই তার মন খারাপ হয়ে গেল। হায়! কি ছিলাম, আবার কি হলাম! ছিলাম শরভ, আবার হলাম কুকুর। মুনি তখন সেই কুকুরকে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দিলেন। অত সুখের আশ্রয় থেকে কুকুর পথে নামল।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, কোন্ কোন্ কাজ রাজাদের কর্তব্য? তারা কি করলে সুখলাভ করতে পারেন?

ভীষ্ম তখন 'উট ও শেয়ালের কথা' লোককথাটি বলেন। অলসতা যে মানবজীবনের সমস্ত অধঃপতনের কারণ একথাই ভীষ্ম বোঝাতে চেয়েছেন। যারা আলস্য পরিত্যাগ করে ইন্দ্রিয়দমনে সচেষ্ট হয়, বুদ্ধিকেই প্রাধান্য দেয় তারাই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বুদ্ধিবলে সমস্ত কাজ করতে উপদেশ দেন। এই পশুকথাটির মধ্যে সত্যযুগ ও ব্রহ্মার প্রসঙ্গ এসেছে। এই ধারণা উচ্চতর সাহিত্যের। মহাভারতকার লৌকিক পশুকথাটি লিখবার সময় সত্যযুগ ও ব্রহ্মার নাম ঢুকিয়ে দেন। এটা কোনোভাবেই লোক-সমাজের মানসজাত নয়। পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে। ভীষ্ম এই আখ্যানকে 'ইতিহাস' বলেছেন।

সত্যযুগে এক গভীর বনে বাস করত এক উট। সে ছিল জাতিস্মর। সেই বনে সে এক সময় কঠোর তপস্যা করেছিল। তার তপস্যায় মুগ্ধ হয়ে একদিন ব্রহ্মা উটের সামনে এলেন এবং তাকে বর দিতে চাইলেন। উট বলল, আপনার বরে আমার এই গলা শত শত যোজন লম্বা হোক। তিনি উটকে এই বর দিলেন।

উট বর পেয়ে সেই বনে নিশ্চিন্তে বাস করতে লাগল। সে খুব কুড়ে হয়ে পড়ল। বর পাওয়াব পর থেকেই সে খাবারের জন্য অন্য কোথাও যেত না, কুড়েমি করে এক জায়গাতেই বসে থাকত। লম্বা গলা বাড়িয়ে গাছের ডাল-পালা খেত, কোথাও যাওয়ার দরকার পড়ত না।

একদিন সেই উট লম্বা গলা বাড়িয়ে ডালপালা খাচ্ছে, এমন সময় ভীষণ ঝড় উঠল। বোকা উট তখন তার মাথা আর গলা একটা গুহার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এমন সময় আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল, একটু পরেই বৃষ্টি নামল। একভাবে বৃষ্টি পড়ছে, থামার নাম নেই। সমস্ত জায়গা জলে ভেসে গেল। জল থৈ থৈ করতে লাগল।

সেই বৃষ্টির মধ্যে এক শেয়াল আর তার বৌ শিকার করতে বেরিয়েছিল। বৃষ্টিতে ভিজে জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তারা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার খুব শীতও করছে। এমন সময় সামনে এক গুহা দেখে তারা তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। বৃষ্টি থেকে তো এখনকার মতো বাঁচা যাবে।

গুহাতে ঢুকেই দেখতে পেল উটের গলা। খুব খিদে পেয়েছে। দুজনে উটের গলায় কামড় বসাল। গলার নরম মাংস খেতে লাগল।

যন্ত্রণায় চিৎকার করে উট বাঁচতে চেষ্টা করল। গলা একবার ওপরে তোলার চেষ্টা করে, একবার নামাবার চেষ্টা করে, এপাশে-ওপাশে ঘোরাতে চায়। কিন্তু অত বড় গলা, কিছুতেই সামলে উঠতে পারল না। ছট্‌ফট করছে, শেয়াল শেয়াল বৌ মাংস খুবলে খেয়ে চলেছে। শেষকালে উট মরে গেল। মাংস খেয়ে খিদে মিটিয়ে শেয়াল-শেয়াল বৌ বৃষ্টি থামলে গুহা থেকে চলে গেল।

যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, কোনো সহায়হীন রাজা যদি কোনো দুর্লভ রাজ্য লাভ করেন, তবে প্রবল শত্রুর সঙ্গে তিনি কিভাবে ব্যবহার করবেন ?

ভীষ্ম তখন 'বেতগাছ, নদী ও সাগরের কথা' লোককথাটি শোনালেন। তিনি বললেন, আমি এই উপলক্ষে 'পুরাতন ইতিহাস' কীর্তন করছি। যে ব্যক্তি প্রবল শত্রুর তেজকে অসহ্য মনে করে, রাজার শক্তি কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, তার সর্বনাশ হয়। প্রাজ্ঞ লোকেরা নিজেদের ও শত্রুদের সার, অসার ও বলবীর্য বিবেচনা করে কাজ করেন বলেই তাদের অবসন্ন হতে হয় না। অভিজ্ঞ পন্ডিতজন শত্রুকে পরাক্রান্ত দেখলেই তার কাছে বেতগাছের মতো নম্র হন। 'বিনয়-নম্রের নিরাপত্তা' বিষয়ে ভীষ্ম তাই উপদেশ দেন। লোককথাটি রয়েছে মহাভারতের শান্তিপর্বে।

অনেক কাল আগে একদিন সমুদ্র অনেক চিন্তা করে নদীদের বলল, আচ্ছা তোমরা তোমাদের প্রবল স্রোতে কত বড় বড় গাছকে শেকড় সমেত উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে যাও। ডালপালা-শেকড় সমেত অত বড় বড় গাছকে ভাসাও, কিন্তু তোমাদের স্রোতে কোনোদিন তো কোনো বেতগাছকে ভেসে যেতে দেখলাম না ? এর কারণ কি ? বেত গাছ খুব ছোট, অসার, সেই জন্য কি ওদের অবহেলা কর ? কিংবা বেতগাছ তোমাদের কি খুব উপকার করে, যার জন্য ওদের উপড়ে আনো না ? যাইহোক, একবারও কেন তোমাদের স্রোতে ভেসে-যাওয়া বেতগাছ দেখতে পাই না ? এর কারণ কি ? খুলে বলো তো ?

তখন ভাগীরথী বলল, অন্য সব গাছ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের গতি রোধ করে, আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে। কিন্তু বেতগাছ কখনও তা করে না। তারা স্রোত দেখামাত্র নত হয়ে পড়ে, স্রোত চলে গেলে আবার নিজের জায়গায় ঠিক হয়ে থাকে। ওরা নম্র, বিনীত, বশ্য, ওরা উদ্ধত নয়। তাই আমরাও ওদের উপড়ে ফেলি না। শুধু বেতগাছ নয়, যেসব গাছ-গুল্ম হাওয়া ও জলের বেগে অবনত হয়, তাদের কাউকেই আমরা স্রোতে ভাসিয়ে আনি না।

যুধিষ্ঠির বললেন যে, সকলের প্রতি বিশেষ করে শত্রুর প্রতি বিশ্বাস করা কোনো মতেই কর্তব্য নয়। যদি কারও প্রতি বিশ্বাস না করা যায় এবং বিশ্বাস করলেই যদি মহাভয় দেখা দেয়, তবে রাজা কিভাবে রাজ্য রক্ষা করবেন কিংবা শত্রুকে পরাজিত করবেন ? আপনার মুখে সকলের প্রতি অবিশ্বাস করবার কথা শুনে আমার মহাসংশয় উপস্থিত হয়েছে, আপনি আমার সংশয় দূর করুন।

ভীষ্ম তখন 'অবিশ্বাসের পাত্র—ব্রহ্মদত্ত-পুজনী বৃত্তান্ত' শোনালেন। এই লোককথাটির মাধ্যমে রাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অত্যন্ত গূঢ় বিষয়ে শিক্ষা দিতে লোককথার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষত্রিয় জাতির সুবিধাবাদী স্বভাবের উল্লেখ রয়েছে, মহাভারতে লিখিত রূপের

সময়ে এই পরিবর্তন হয়েছে। ভীষ্ম নিজের প্রয়োজনে উপদেশ দিচ্ছেন, তাই লৌকিক ঐতিহ্যকেও তিনি নিজস্ব মত প্রকাশের অনুকূল করে নিয়েছেন। কিন্তু লোককথার মূল মোটিফ উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়। শান্তিপর্বে লোককথাটি রয়েছে।

অনেক কাল আগে কাম্পিল্যনগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম ব্রহ্মদত্ত। তাঁর অন্তঃপুরে একটা পাখি অনেক কাল থেকে বাস করত। পাখিটার নাম পুজনী। ঐ পাখি ব্যাধের মতো সব প্রাণীর স্বর বুঝতে পারত। পুজনী পাখি হয়েও সর্বজ্ঞ ছিল।

কিছুদিন পরে সেই পাখির একটা ছানা হল। যেদিন পাখির বাচ্চা হল, সেদিনই রানীরও একটি ছেলে জন্মাল। পাখি রানীর ছেলেকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করত। পাখি প্রতিদিন সমুদ্রের পারে উড়ে যেত, দুটো সুস্বাদু পুষ্টিকর ফল নিয়ে ঘরে ফিরত। একটা দিত রাজকুমারকে, অন্যটা দিত নিজের ছানাকে। রাজকুমার সেই ফল খেয়ে দিনে দিনে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠল।

একদিন ধাই-মা রাজকুমারকে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় সে পাখির ছানাকে দেখতে পেল। ছানার কাছে গিয়ে সে খেলা করতে লাগল। একবার ওপরে তোলে আবার নিচে নামায়। এমনি খেলতে খেলতে হঠাৎ পাখির ছানা ওপর থেকে পড়ে গেল। ছোট্ট ছানা মরে গেল। রাজকুমার তখন ধাই-মার কাছে ফিরে গেল।

এমন সময় পাখি দুটো ফল নিয়ে ফিরে এল সেখানে। এসে দেখল, রাজকুমার তার ছেলেকে মেরে ফেলেছে। পাখি কাঁদতে লাগল, এমন দুঃখ সে জীবনে পায় নি।

পাখি কাঁদতে কাঁদতে বলল, ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে একসঙ্গে বাস করা কারও উচিত নয়। ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে কখনও বন্ধুত্ব করতে নেই। ওরা কাজের সময় লোককে ভালোবাসে, কাজ ফুরিয়ে গেলেই তাকে ত্যাগ করে। যারা যুদ্ধবিগ্রহ করে তাদের কখনও বিশ্বাস করতে নেই। ওরা সবসময় অপকার করে আবার অপকার করে সান্ত্বনা দেয়। অপকার করে সান্ত্বনা দেবার কোনো মানে হয়? আমিও ছাড়ব না। আমিও আজ প্রতিশোধ নেব। আমার ছেলে একসঙ্গে জন্মেছে, একসঙ্গে বড় হয়েছে,—আর তাকেই কিনা সে মেরে ফেলল? রাজকুমার মহাপাপ করেছে। তাকে পাপের শাস্তি পেতেই হবে। আমি এর প্রতিশোধ নেবই।

এই কথা বলেই পাখি কাঁদতে কাঁদতে রাজকুমারের কাছে গেল। দুই পা দিয়ে তার দুটো চোখ উপড়ে ফেলল। রাজকুমার অন্ধ হয়ে গেল। পাখি বলল, যে লোক ইচ্ছে করে পাপ করে, পাপ তাকে রেহাই দেয় না। আর অনিষ্ট করার পরে যে প্রতিশোধ নেয়, পাপ তাকে স্পর্শ করে না। লোকে পাপ

করে যদি তার শাস্তি ভোগ না করে, তবে তার ছেলে-নাতিকে তার ফল ভোগ করতে হয়।

রাজা ব্রহ্মদত্ত সব দেখলেন। তার ছেলে অন্ধ হয়ে গেল। তবু তিনি বললেন, পুজনী, আগে আমার ছেলে পাপ করেছে, তারপরে তুমি সেই পাপের শাস্তি দিয়েছ। তোমার কোনো দোষ নেই, দোষ আমার ছেলের। তাই তোমাকে অন্য কোথাও পালিয়ে যেতে হবে না, তুমি এখানেই থাকো।

পাখি তখন বলল, মহারাজ, যে লোক একবার একজনের কাছে অপরাধ করে, তার কাছে থেকে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আপনার কাছ থেকে চলে যাওয়াই ভালো। আপনি আর আমাকে কখনও আগের মতো বিশ্বাস করতে পারবেন না। বিশ্বাস করাও ঠিক নয়। বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করা অন্যায়। এমন কি বিশ্বাসী লোককেও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে নেই। পিতামাতা ছাড়া আর কেউ পরম বন্ধু হতে পারে না। আমি যে কারণে এখানে থাকতাম, এখন আর সে কারণ নেই। একবার অপরাধ করে ফেলেছি, আর কখনও তেমন বিশ্বাসী হতে পারব না। আপনার সংগে আমার শত্রুতা হয়ে গেল, তাই আমি আর এখানে থাকব না।

রাজা বললেন, যে অপরাধীকে শাস্তি দেয়, পাপের প্রতিশোধ নেয়, সে কখনও অপরাধী নয়। সে ঋণ শোধ করেছে। তাই তুমি অন্য কোথাও না গিয়ে এখানেই থাকো।

পাখি বলল, পাপের প্রতিশোধ নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু আর কখনও আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হবে না। আপনার মনে অবিশ্বাস জাগবেই।

রাজা বললেন, অনেক সময় বিরোধের পরেও তো বন্ধুত্ব হয়! সন্ধি হয়। সন্ধির পরে আর তো অপকার হবার কথা নয়!

পাখি বলল, একবার শত্রুতা জন্মালে কখনও তা আর যায় না। তাকে কখনও বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করলেই আপনার সর্বনাশ হবে। তাই আমাদের দুজনের মধ্যে আর দেখাশোনা না হওয়াই ভালো।

রাজা বললেন, একসঙ্গে মিলেমিশে থাকলে শত্রুর সঙ্গেও স্নেহ-সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পক্ষপাতায় জলের মতো শত্রুতাও বেশি দিন থাকে না।

পাখি বলল, কোনোভাবে বন্ধুর সঙ্গেও যদি শত্রুতা ঘটে যায়, তবে তাকেও বিশ্বাস করতে নেই। কাঠের মধ্যে যেমন আগুন লুকিয়ে থাকে, সাগরের নিচে যেমন আগুন থাকে, শত্রুতাও তেমনি মনের কোণায় লুকিয়ে থাকে। কখন সে বেরিয়ে পড়বে তা কেউ বলতে পারে না। একবার শত্রুতা দেখা দিয়ে একজনকে না পুড়িয়ে সে শান্ত হয় না। বিশ্বাস নিয়ে একদিন আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আজ আর সে বিশ্বাস রাখতে পারছি না।

রাজা বললেন, পুজনী, তুমি আমার বন্ধু। ভালোবেসে তুমি এখানেই থাকো। আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করব না। তুমি যে অপরাধ

করেছ, তার জন্য আমি তোমায় ক্ষমা করলাম। তুমিও আমাকে ক্ষমা কর।

পাখি বলল, মহারাজ, আমরা একে অপরের যে ক্ষতি করেছি, যে অপকার করেছি, তা একশ' বছরেও ভুলে যাবার নয়। তাই বন্ধুত্ব করা আর সম্ভব নয়। ছেলেকে মনে পড়লেই আমার সঙ্গে আপনার নতুন করে শত্রুতা জন্মাবে। তাই কোনোভাবেই আমি আর এখানে থাকতে পারি না।

এই কথা বলে পাখি বনের পথে কোথায় উড়ে গেল।

ভীষ্ম এই লোককথাটি বলবার সময় জটিল দার্শনিক যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। লৌকিক ঐতিহ্যে এ ধরনের দার্শনিক কূট তর্ক থাকতে পারে না। লোককথায় অনেক জ্ঞানের কথা থাকে, কিন্তু অত্যন্ত সরলভাবে সেগুলো বলা হয়। কেননা বিচিত্র অভিজ্ঞতা জন্মালেও লোকসমাজ জটিল নয়। লোকসমাজের লোককথা উচ্চতর সাহিত্যে লিখিত রূপ পাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়। যিনি লোককথাটি ব্যবহার করছেন তার মানসিকতাই এই পরিবর্তন ঘটায়। লোককথা বলবার জন্যই তিনি লোককথা বলছেন না, এর পেছনে একটি উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা করতেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। এর নিদর্শন সবচেয়ে বেশি রয়েছে মহাভারতে। বিশেষ করে ভীষ্মের উপদেশ দেবার সময়। প্রাজ্ঞ মানুষ দার্শনিক ভাবনায় লোককথাকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দার্শনিক ব্যাখ্যা করতে গিয়েও তিনি সঙ্গত কারণেই লোককথাকে বেছে নিয়েছেন।

দার্শনিক ব্যাখ্যা ছাড়া এই একই ধরনের পশুকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়ালী লোককথায়। সেখানে রাজা হলেন বাজ পাখি আর সাধারণ পাখি হল টিয়া।

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মিত্রদ্রোহী ও অকৃতজ্ঞ কাকে বলে?

ভীষ্ম তখন বললেন, এই উপলক্ষে উত্তরপ্রদেশ নিবাসী ম্লেচ্ছদের দেশে যা ঘটেছিল সেই পুরাতন বৃত্তান্ত কীর্তন করছি।

ভীষ্ম একটি রূপকথা শোনালেন। 'সংসর্গের দোষ—গৌতমের অধোগতি।' এই রূপকথার মধ্যে বেদজ্ঞান, ঋষি, ব্রহ্মচারী প্রভৃতির উল্লেখ রয়েছে। ম্লেচ্ছ শব্দটি ব্যবহার করে অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করা হয়েছে। লৌকিক ঐতিহ্যে এই ধরনের মানসিকতা থাকে না। উচ্চতর সাহিত্যে লিখিত রূপ পাবার সময় এই পরিবর্তন ঘটেছে। রূপকথাটি আছে শান্তিপর্বে।

একদিন মধ্যদেশের অধিবাসী গৌতম ভিক্ষা করতে করতে এক গ্রামে এসে পৌঁছলেন। বেশ বড় গ্রাম, গ্রামের লোকজনের অবস্থাও ভালো। কিন্তু সেই গ্রামে কোনো ব্রাহ্মণের বাস ছিল না।

ঐ গ্রামে থাকত এক দস্যু। সে খুব বড়লোক, দানধ্যানও করত। গৌতম

সেই দস্যুর বাড়িতে গেলেন। গিয়ে বললেন, আমাকে এক বছরের জন্য থাকতে দিতে হবে, সেই এক বছরে খাওয়াতেও হবে।

দস্যু তক্ষুনি তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। তাকে নতুন কাপড় দিল আর তার সেবার জন্য একজন যুবতী দাসী দিল। গৌতম মহা আনন্দে সেই দস্যুর বাড়িতে থাকতে লাগলেন।

কিছুদিন সেখান থাকার পরে গৌতমের তীর-ধনুক ছোড়া শিখতে খুব ইচ্ছে হল। দস্যুর কাছে শিখলেন। তারপরে প্রত্যেক দিন গভীর বনে চলে যেতেন। আর বুনো মানুষদের মতো হাঁস মারতেন। দস্যুর সঙ্গে থাকতে থাকতে তাব মনেও হিংসা জাগল। দস্যুর মতো আচরণ করতে লাগলেন গৌতম। পাখি মেরে তার মাংস খেয়ে তিনি সেই গ্রামে দিন কাটাতে লাগলেন।

এমান করে অনেক দিন কেটে গেল। এক দিন সেই গ্রামে এলেন এক জটাজিনধারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। অনেক কাল আগে ইনি গৌতমের প্রাণের বন্ধু ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে ব্রাহ্মণের বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে তিনি এলেন গৌতমের বাড়িতে। ঐ সময় গৌতম ফিরছেন বন থেকে। পিঠে মরা হাঁস, তীর-ধনুক। দেহে কাঁচা রক্ত লেগে রয়েছে। তাকে দেখেই ব্রাহ্মণ চিনতে পারলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি মধ্যদেশে ভালো বংশে জন্মেছ। একি দশা? তুমি দস্যুর মতো জীবন কাটাচ্ছ? তুমি তোমার বংশের কলঙ্ক। যাইহোক এক্ষুনি এই জায়গা ছেড়ে চল। আবাব সুন্দর জীবন শুরু কর।

ব্রহ্মচারী গৌতম কাতরভাবে বললেন, আমি বড় গরিব ছিলাম, আমার বেদজ্ঞান ছিল না। তাই আমি সুখের জন্য, ধনের জন্য এখানে এসেছিলাম। আজ তোমাকে দেখে আমি সব বুঝতে পারছি। তুমি আজ রাতের মতো এখানে থাক। কাল খুব সকালেই দুজনে এখান থেকে চলে যাব।

গৌতমের করুণ কথায় ব্রাহ্মণ সেই রাতে সেখানে থাকতে রাজি হলেন। কিন্তু খুব খিদে পেলেও গৌতমের বাড়িতে কিছুই খেলেন না।

পরদিন সকালেই ব্রাহ্মণ চলে গেলেন। তার যাওয়ার একটু পরেই গৌতম গ্রাম থেকে বেরিয়ে গেলেন। চললেন সমুদ্রের দিকে। পথে দেখা হল একদল বণিকের সঙ্গে। তিনি তখন বণিকদের সঙ্গে চলতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে সেই বণিকের দল এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকল। হঠাৎ গুহা থেকে বেরিয়ে এল এক পাগলা হাতি। সে বণিকদের মেরে ফেলতে লাগল। এই কাণ্ড দেখে গৌতম ভীষণ ভয় পেয়ে দৌড় দিলেন। চললেন উত্তব দিকে। একা একা অসহায়ের মতো বনে বনে ঘুরতে লাগলেন।

শেষকালে সমুদ্রে যাওয়ার পথ খুঁজে পেলেন। সেই পথে যেতে যেতে

তিনি নন্দনকাননের মতো একটি সুন্দর কানন দেখতে পেলেন। সেখানে গাছে গাছে ফলফুল, সেখানে আমগাছে সারাবছর আম ফলে থাকে। শাল তাল তমাল চন্দন ও কালো অগুরু গাছে কানন ভর্তি। অপরূপ শোভা। যক্ষ ও কিন্নরেরা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষের মুখের মতো দেখতে পাখিরা মধুর স্বরে গান গাইছে। এরা সমুদ্র ও পাহাড়ের পাখি। পাখির গান শুনতে শুনতে গৌতম কিছুদূর এগিয়ে একটা বটগাছ দেখতে পেলেন। তার তলায় সোনার বালি। গাছের ডালপালা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তলায় শীতল ছায়া। ফুলেফলে ডালপালা ভর্তি। গৌতম সেই সুন্দর বটের ছায়ায় বসে পড়লেন। হাওয়া বইছে, হাওয়ায় চন্দনের গন্ধ। গৌতম গাছের নিচে শুয়ে পড়লেন।

কিছু ক্ষণ পরে দিন শেষ হল, সূর্য অস্ত গেল। এমন সময় ব্রহ্মলোক থেকে নেমে এল এক বক। দেবকন্যার গর্ভে তার জন্ম হয়েছে।

পাখিকে দেখে গৌতম অবাক হলেন। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। তিনি ঠিক করলেন, এই পাখিকে মেরে তার মাংস খেয়ে খিদে মেটাবেন।

এমন সময় সেই পাখি বলে উঠল, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। এইটিই আমার বাসা। আজ রাতে আপনি এখানেই থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, বিশ্রাম নিন। সন্ধ্যা হয়ে এল, আর কোথাও যাবেন না। কাল সকালে ইচ্ছেমতন কোথাও যাবেন।

গৌতম বকের মধুর কথায় বিস্মিত হয়ে অবাক চোখে তাকে দেখতে লাগলেন। পাখি বলল, আমার বাবা কশ্যপ, মা দাক্ষায়ণী। আপনি আমার অতিথি হোন।

আগুন জ্বালিয়ে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে বক সব ব্যবস্থা করে দিল। গৌতম খাওয়া-দাওয়া সেরে বসলেন। পাখি তার দুটো ডানা দিয়ে বাতাস করতে লাগল। গৌতমের ক্লান্তি দূর হল। এখন পাখি তার পরিচয় জানতে চাইল।

গৌতম বললেন, আমার নাম গৌতম, আমি ব্রাহ্মণ।

পাখি তখন সুন্দর বিছানা করে দিল। গৌতম শুয়ে পড়লেন।

বক বলল, আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?

গৌতম বললেন, আমি নিতান্ত দীনহীন। সামান্য অর্থের জন্য সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিলাম। পথে যেতে যেতে এখানে এসে পড়েছি।

পাখি বলল, আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনি শিগগিরই অর্থ নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন। আপনার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। আপনি যাতে ধনবান হন, আমি সেই চেষ্টাই করব।

গৌতম পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হল। বক গৌতমকে দূরের একটা পথ দেখিয়ে বলল, আপনি এই

পথে যান। এই পথে গেলেই আপনি যা চান তাই পাবেন। এখান থেকে তিন যোজন দূরে এক রাক্ষসরাজ বাস করে। সে মহা শক্তিশালী। তার নাম বিরূপাক্ষ। সে আমার পরম বন্ধু। আপনি তার কাছে গেলেই আপনার আশা পূর্ণ হবে।

গৌতম চললেন সেই পথে। পেঁছিলেন রাক্ষসের রাজ্যে। সেখানকার সব বাড়ি-ঘর-দোর-প্রাচীর পাথরের তৈরি। গৌতম সেখানে পেঁছিলেই এক রাক্ষস রাজার কাছে গিয়ে সেই খবর জানাল। রাক্ষসরাজ বুঝতে পারল তার পরম বন্ধু এই গৌতমকে পাঠিয়েছে। তাকে তার কাছে নিয়ে আসতে আদেশ দিল। গৌতম অবাক হয়ে নগরের শোভা দেখতে দেখতে রাক্ষসরাজের কাছে চললেন।

রাজভবনে ঢোকামাত্রই রাজা গৌতমকে খাতির করে বসালেন। গৌতমের পরিচয় নিয়ে তাকে সমাদর করলেন। রাজা সেদিনই এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন বলে আগে থেকেই ঠিক হযে ছিল। তাদেব যেসব ধন দেবার কথা ছিল, রাজা ঠিক করলেন গৌতমকেও তাই দেবেন।

এমন সময় সেই হাজার ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হল। ভৃত্যেরা তাদের কুশাসনে বসিয়ে দিতে লাগল। রাজা তিল-কুশ-জল দিয়ে তাদের পূজো করল। তারপরে চলল দানধ্যানের পালা। মণি-মুক্তা-হীরে-প্রবাল-সোনা-রুপো দান করা হল। তারপরে রাক্ষসরাজ বলল, শুধুমাত্র আজকের দিনের জন্য আপনাদের কোনো ভয় নেই, আজকে রাক্ষসরা আপনাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি নিজের নিজের জায়গায় চলে যান।

ব্রাহ্মণরা ধনসম্পত্তি নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে গেল। চারদিকে হাঁটা দিল। গৌতমও সেইসব অমূল্য ধন নিয়ে রওনা দিল বটগাছের দিকে। অনেক পথ, ক্লান্ত হয়ে শেষকালে পেঁছিল বটগাছের তলায়। তখন গৌতমের খুব খিদে পেয়েছে।

একটু পরেই বক ফিরে এল। গৌতমকে দেখে বুঝল তিনি খুব ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি ডানা দিয়ে তাকে বাতাস করতে লাগল। তারপর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। খাওয়ার পর বিশ্রাম নিতে নিতে গৌতম মনে মনে ভাবলেন, আমাকে অনেক দূরের পথে যেতে হবে। সঙ্গে অনেক ধনরত্ন রয়েছে, কিন্তু খাবার মতো তো কিছুই নেই। এত দূরের পথে চলতে চলতে খাব কি? এক কাজ করি। এই বককে মেরে ফেলি। অনেকটা মাংস হবে। তাই খেয়ে দূরের পথ চলব। তাহলে আর কষ্ট পেতে হবে না।

এই কথা চিন্তা করে গৌতম উঠে বসলেন। গৌতম যেখানে শুয়ে ছিলেন তার একটু দূরেই বক আগুন জ্বালিয়ে পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল। গৌতম দেখলেন, বক ঘুমিয়ে আছে। আস্তে আস্তে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ তুলে

নিয়ে বকের গায়ে আঘাত করলেন। বক মরে গেল। গৌতম যে কত খারাপ কাজ করলেন সে সময়ে তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। এসব কথা তার মনেই এল না। তার খুব আনন্দ হল। পাখির পালক ছাড়িয়ে আগুনে ভালো করে ঝলসে নিলেন। তারপরে ধনরত্ন সমেত পাখির দেহ নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন।

পরের দিন। রাক্ষসরাজ প্রাণের বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে ছেলেকে বলল, আজকে বককে দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে প্রতিদিন সকালে ব্রহ্মাকে প্রণাম করতে তার কাছে যায়। ফেরার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। দেখা না করে কোনোদিন সে যায় না। কিন্তু আজ দুরাত কেটে গেল, সে তো এল না? আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। এক্ষুনি তুমি তার খোঁজ নিয়ে এস। আমার মনে হচ্ছে সেই গৌতম নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলেছে। গৌতমের ভাবভঙ্গি দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, সে বড় নির্দয় নিষ্ঠুর, তার আচার-আচরণ দস্যুর মতো। সে আবার বটগাছের দিকেই গিয়েছে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তুমি দেখে এস আমার বন্ধু বেঁচে আছে কিনা।

কয়েকজন রাক্ষস নিয়ে রাজপুত্র তক্ষুনি গেল বকের বাসায়। গিয়ে দেখে, গাছের নিচে বকের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে। বকের এমন দশা দেখে রাজপুত্র কেঁদে ফেলল। তারপরে প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রাক্ষসদের নিয়ে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল। যেপথে গৌতম গিয়েছিলেন সেপথে ছুটতে লাগল। অনেক দূরে গিয়ে গৌতমকে ধরে ফেলল। তার অনুমানই ঠিক, গৌতমের সঙ্গে রয়েছে বকের মাংস। ধরে নিয়ে গেল রাক্ষসরাজের কাছে।

পরম বন্ধুর মৃতদেহ দেখে রাজা খুব দুঃখ পেল। রাজার সঙ্গে মন্ত্রী, পুরোহিত সবাই কাঁদতে লাগল। খবর পৌঁছলে বাড়ির মধ্যেও সবাই কাঁদতে লাগল। এমন শোক তারা আগে পায় নি।

তারপরে রাজা ভীষণ রেগে গেল। রাজপুত্রকে ডেকে বলল, বৎস, অন্যান্য কয়েকজন রাক্ষসকে সঙ্গে নিয়ে তুমি এখুনি এই নিষ্ঠুর গৌতমকে হত্যা কর। এর মাংস খেয়ে রাক্ষসরা তৃপ্তি পাক। এ ভয়ানক পাপী, এর মৃত্যু হওয়াই ভালো।

তখন কয়েকজন রাক্ষস রাজার পায়ে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, এই পাপী ব্রাহ্মণের মাংস খেতে আমাদের একটুও ইচ্ছে করছে না। আপনি একে দস্যুদের হাতে দিয়ে দিন। এমন পাপীকে আমাদের খাওয়ার জন্য দেওয়া আপনার উচিত নয়।

তাদের অনুরোধ শুনে রাজা নরম হল। তাদের কথায় রাজি হয়ে রাজা বলল, আজই এই পাপীর দেহকে দস্যুদের হাতে দিয়ে দাও।

তখন রাক্ষসরা ড়ুখ দিয়ে গৌতমের দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। তারপরে খণ্ড খণ্ড দেহ দস্যুদের দিয়ে দিল। কিন্তু দস্যুরাও সেই পাপীর

মাংস খেতে চাইল না। অনেক পাপের নিস্তার আছে, কিন্তু যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, যে অকৃতজ্ঞ তার পাপের নিস্তার নেই। তার মাংস রাক্ষস, দস্যু এমনকি পোকারাও খায় না।

তারপর রাক্ষসরাজ সুগন্ধময় চিতা সাজিয়ে তাতে আগুন দিয়ে বকের মৃতদেহ দাহ করতে লাগল। এমন সময় চিতার ওপরে নেমে এল বকের মা দাক্ষায়ণী। মায়ের মুখ থেকে অনবরত ক্ষীরমেশানো ফেনা বেরিয়ে চিতায় পড়তে লাগল। সেই ফেনা গিয়ে লাগল বকের দেহে। বক বেঁচে উঠল তার স্পর্শে। বক চিতা থেকে বেরিয়ে এসে রাক্ষসরাজের কাছে গেল।

এমন সময় ইন্দ্র সেই রাক্ষসরাজের কাছে এলেন। তাকে দেখে বক বলল, যদি আমার প্রতি আপনার দয়া থাকে, তবে আপনি আমার পরম বন্ধু গৌতমকে বাঁচিয়ে দিন। ইন্দ্র বকের কথায় গৌতমকে বাঁচিয়ে দিলেন।

তখন বক গৌতমের ধনসম্পত্তি নিয়ে তাকে তার ইচ্ছেমতো যেতে বলল। গৌতম ফিরে চললেন সেই দস্যুর গ্রামে। ব্যাধের জীবনে তিনি ফিরে গেলেন। সেখানে গৌতম বিয়ে করেছিলেন এক কিরাতীকে। সেই বৌয়ের কাছেই গেলেন তিনি। পরে তার অনেক ছেলেমেয়ে হল।

এই রূপকথাটি বলার পর ভীষ্ম এটি বিশ্লেষণও করেছেন। অর্থাৎ রূপকথাটির অভিপ্রায় কি? যে অকৃতজ্ঞ তার কোথাও যশ আশ্রয় বা সুখ নেই। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয়, কোনোভাবেই তার নিষ্কৃতি নেই। বন্ধুর অনিষ্ট করা কারও উচিত নয়. মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি যন্ত্রণা ভোগ করে। সুপণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই পাপী অকৃতজ্ঞকে পরিত্যাগ করে।

এই সময়েই ভীষ্ম বলেছিলেন, যুধিষ্ঠির, পূর্বে মহর্ষি নারদ আমার কাছে এই উপাখ্যান কীর্তন করেছিলেন। আগে থেকেই এই উপাখ্যান প্রচারিত ছিল। ভীষ্ম পুরনো ঐতিহ্যকেই আবার বিবৃত করেছেন।

অনেক কাল আগে কোনো এক বনে শেয়াল বাঘ ইঁদুর নেকড়ে একসঙ্গে বাস করত। এই চার বন্ধুর সঙ্গে ছিল একটা বেজি। শেয়াল ছিল বেজায় চালাক, স্বার্থপর আর বুদ্ধিমান।

একদিন সেই বনের মধ্যে তারা একটা বিশাল হরিণকে দেখতে পেল। সে ছিল হরিণদের সর্দার। তারা হরিণকে মারার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তার গায়ে ছিল খুব জোর, ছুটতে পারত খুব জোর। তাকে ঘায়েল করতে না পেরে শেয়াল বলল, এভাবে হবে না, এই হরিণ খুব বুদ্ধিমান, যুবক বয়স, ছুটতেও পারে খুব, এভাবে ধরা যাবে না। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ওকে সহজে শিকার করতে পারব না। তাই বুদ্ধি করে ওকে মারতে হবে। হরিণ যখন গা এলিয়ে শুয়ে থাকবে, সেই সময় ইঁদুর গিয়ে ওর পায়ে কামড় বসাক। তখন বাঘ লাফিয়ে গিয়ে ওকে সহজেই কাবু করতে পারবে। তারপর আমরা সবাই ওর মাংস আনন্দ করে খাব।

অন্য চার বন্ধু শেয়ালের কথায় রাজি হল। শেয়াল ঠিক পরামর্শ দিয়েছে। শেয়ালের কি বুদ্ধি।

তখন ইঁদুর গুটি গুটি এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ ঘাস-পাতা খেয়ে হরিণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। এক গাছের ছায়ায় ঘন ঘাসের মধ্যে হরিণ গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে হরিণের পায়ে কামড় বসাল ইঁদুর। যন্ত্রণায় যেই কাতরে উঠেছে হরিণ, সেই সুযোগে প্রচণ্ড লাফ মারল বাঘ। ঠিক হরিণের পিঠের ওপরে। হরিণ একটু ছটফট করেই মরে গেল।

হরিণের দেহ পাথরের মতো পড়ে রয়েছে। অন্য সকলে সেখানে এল। হঠাৎ শেয়াল বলল, বন্ধু, তোমরা সবাই চান করে এস, আমি একে পাহারা দিচ্ছি।

অন্য চারজন চান করতে নদীর দিকে গেল। শেয়াল চিন্তা-চিন্তা ভাব করে সেখানে চুপ করে বসে রইল। সবার আগে চান সেরে বাঘ ফিরে এল। এসে দেখে শেয়াল কেমন আনমনা হয়ে বসে রয়েছে।

শেয়ালকে এমনভাবে বসে থাকতে দেখে বাঘ বলল, ভাই শেয়াল, আমাদের মধ্যে তুমিই শুধু বুদ্ধিমান, তুমি শোক করছ কেন? শিকার পড়ে রয়েছে, এস আমরা সবাই আনন্দ করে মাংস খাই।

শেয়াল বলল, বন্ধু, ইঁদুর যা বলেছে আমি তোমাকে ভাই বলছি। তুমি চান করতে গেলে ইঁদুর অহংকার করে বলল, আজ আমিই এই হরিণকে মেরেছি। বাঘের আর কি বলবিক্রম আছে? আজ আমারই বলে হরিণ মরেছে, তার মাংস তোমাদের সবাইকে খাওয়াব, আনন্দ দেব। ইঁদুর অহংকার করে এমন হম্বিতম্বি করছিল যে হরিণের মাংস খেতে আর আমার একটুও ইচ্ছে নেই।

বাঘ রেগে গিয়ে গর্জন করে বলল, শেয়াল, তাই যদি বলে থাকে ইঁদুর, তবে তুমি ঠিক সময়ে আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ। আজ নিজের শক্তি দেখাব, বনের পশুদের মেরে শেষ করে দেব। আমি চললাম, কত মাংস তুমি খেতে পার দেখব। এই বলে বাঘ বনের গভীরে মিলিয়ে গেল।

এমন সময় চান সেরে সেখানে এল ইঁদুর। তাকে দেখে শেয়াল বলল, ইঁদুর, তুমি ভালো আছ তো? নেকড়ে কি বলেছে শোনো। তুমি চান করতে গেলে সে আমাকে বলল, এই হরিণের মাংস খেতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না। এই মাংসকে আমার বিষ বলে মনে হচ্ছে। তো তোমার যদি মত থাকে, তাহলে আমি এক্ষুনি গিয়ে ইঁদুরকে খাই।

এই কথা শুনেই ইঁদুর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাছের এক গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এমন সময় নেকড়ে চান করে সেখানে এল। শেয়াল তাকে বলল, ভাই, বাঘ তোমার ওপরে খুব রেগে গিয়েছে, তোমার অনিষ্ট ঘটতে পারে। বাঘ

তার বৌকে নিয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে। এখন যা ভালো বোঝ তাই কর।

এই কথা শুনেই নেকড়ে ভয় পেয়ে গভীর বনে পালিয়ে গেল। পালিয়ে যাওয়াই ভালো, কি থেকে কি হয় কে বলতে পারে ?

এমন সময় চান করে সেখানে এল বেজি। তাকে আসতে দেখেই শেয়াল বলল, বেজি, নিজের শক্তিবলে আমি সবাইকে হারিয়ে দিয়েছি। পরাজিত হয়ে তারা যার যার জায়গায় পালিয়ে গিয়েছে। এখন তুমি শেষকালে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, যদি আমাকে হারিয়ে দিতে পার, তাহলে তুমি ইচ্ছেমতো হরিণের এই মাংস খেতে পারবে।

তখন বেজি আস্তে আস্তে বলল, ভাই শেয়াল, বাঘ নেকড়ে আর বুদ্ধিমান ইঁদুর যখন যুদ্ধে তোমার কাছে হেরে গিয়েছে, তখন বোঝাই যাচ্ছে, তুমি এদের মধ্যে সবচেয়ে বলবান। তাই আমি আর কি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব! তোমার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। আমি চললাম। এই কথা বলেই বেজি পালিয়ে গেল।

চারজন চলে গেলে বুদ্ধিমান শেয়াল মহা আনন্দে একাই সেই হরিণের মাংস খেতে লাগল।

এটি একটি অতি সরল লৌকিক পশুকথা। পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ-ঈশপ কিংবা পিলপের নীতিকথার সঙ্গে এর কোনো তফাৎ নেই। এইসব সংকলনের কাহিনীর সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এই পশুকথাটি রয়েছে মহাভারতের আদিপর্বে। মহাভারতের বিশেষত্ব হল, এই মহাকাব্যের অর্ন্তভুক্ত হবার পরেই সাধারণ উপাখ্যানও তত্ত্বকথায় অসাধারণ হয়ে ওঠে। প্রাজ্ঞ মহাভারতকার অকারণে কোনো কাহিনীকে বিবৃত করেন নি। নিজস্ব তত্ত্ব ও দর্শনকে সুস্পষ্ট করবার জন্যই তিনি কাহিনীকে মহাকাব্যের মধ্যে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে এইসব কাহিনী যখন বলেন ভীষ্ম, বৈশম্পায়ন, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর। লৌকিক এই পশুকথাটি যখন মন্ত্রিবর কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে আহবান করে বলছেন তখন আপাতত মনে হবে একটি সাধারণ কাহিনী তিনি বলছেন। কিন্তু কাহিনীটি বলবার পরে তিনি যখন এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়টি বিশ্লেষণ করছেন তখন বিস্মিত হতে হয়। একটি সাধারণ কাহিনীর মধ্যে কত তত্ত্বকথা লুকিয়ে রয়েছে। লোকসমাজ নিশ্চয়ই এত গভীরভাবে এইসব দার্শনিক তত্ত্ব তাদের গল্পের মধ্যে বলতে চাননি। কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পশুকথাটির অভিপ্রায়-বিশ্লেষণে নতুন মাত্রা যুক্ত হল। মহাভারতকারের হাতে এর নতুন ব্যাখ্যা শুনে পাঠক আলোকিত হবেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এই তত্ত্বকথা প্রকাশ করতে তিনি নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজের একটি সাধারণ পশুকথাকে ব্যবহার করলেন।

এই একই ধরনের লোককথা আমরা পেয়েছি পঞ্চতন্ত্রে, ঈশপে, ভারতের

গোন্দ ও মারিয়া আদিবাসী, আফ্রিকার মাসাই ও ইফে আদিবাসী এবং পলিনেশীয় লোককথায়। শুধু পাত্র-পাত্রী অন্যান্য পশুপাখি।

কণিক ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের একজন ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী ও মন্ত্রণাদাতা। পাণ্ডবদের সর্বনাশ করবার জন্য ইনি সবসময় ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেন। এই পশুকথাটি বিশ্লেষণ করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে আরও উত্তেজিত করেন। ধৃতরাষ্ট্র যেন এই উপাখ্যান থেকে পাণ্ডবদের বিনাশের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন।

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করেন, হে কণিক! সন্ধি দান ভেদ ও দণ্ড দ্বারা কিভাবে শত্রুসংহার করা যেতে পারে, তুমি আমকে তাই আনুপূর্বিক বল।

তখন কণিক বললেন, মহারাজ! পূর্বকালে নীতিশাস্ত্রবিশারদ অরণ্যবাসী জম্বুকের যেরূপ ঘটেছিল, তা আমি আনুপূর্বিক বর্ণনা করছি। কণিক তখন 'নকুল-ব্যাঘ্র-জম্বুক-বৃক-মূষিক কথা' শোনালেন। তারপরে পশুকথাটির অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করলেন।

কণিক বিশ্লেষণ করে বললেন, যে রাজা শেয়ালের মতো এই রকম আচরণ করেন, তিনি চিরকাল সুখভোগ করে থাকেন। ভীত ব্যক্তিকে ভয়প্রদর্শন, বীরের কাছে বিনয়ভাব, লুব্ধকে অর্থদান, সম বা ন্যূন ব্যক্তিকে বল প্রকাশ করে বশীভূত করতে হয়। শত্রু, সখা, ভাই, পিতা এবং গুরুও যদি শত্রুর মতো বিদ্রোহ করে, তাহলে তক্ষুনি তাদের বিনষ্ট করা উচিত। শত্রুকে শপথ, অর্থদান, বিষপ্রয়োগ বা মায়াপ্রকাশ করে বিনাশ করা বিধেয়। কখনও তাদের উপেক্ষা করতে নেই। কিন্তু যদি জিগীষাসম্পন্ন উভয়পক্ষই তুল্যবল ও তুল্য উপায়বশত সান্দিহান হয়ে থাকেন, তাহলে যিনি তার মধ্যে গাঢ়তর অধ্যবসায়ের সঙ্গে জয়শ্রীলাভের প্রত্যাশা করেন, তারই অভ্যুদয় ঘটবে। আর যদি গুরুও গর্বিত, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, নিতান্ত নিন্দনীয় ও কুপথগামী হন, তাহলে সেই গুরুকেও শাসন করা ন্যায়বিরুদ্ধ নয়। ক্রোধের উদ্রেক হলেও কখনও ক্রুদ্ধ হবে না, সবসময় হাসিমুখে সকলকে সাদর সম্ভাষণ করবে। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কখনও বিশ্বাস করবে না, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস করবে না। যেহেতু, বিশ্বাস থেকে ভয় উৎপন্ন হলে মূল পর্যন্ত উচ্ছিন্ন হতে পারে। হৃদয়ে ক্ষুরধার রেখেও সবসময় সহাস্যমুখে মিষ্টি বাক্যে বিনীতভাবে সম্ভাষণ করবে। অসূয়া-পরবশ না হয়ে যত্নপূর্বক নিজ মন্ত্রণা গোপন করে রাখবে। সহায় সংগ্রহ ও শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে চেষ্টা করবে। সম্পদলাভের ইচ্ছা ও সেই বিষয়ে প্রভূত উৎসাহ দেখানো দরকার। এই ধরনের লোকের কাজ শত্রু-মিত্র কেউ কিছুমাত্র বুঝতে পারে না, কেবল কাজের উদ্‌যোগ ও কাজের সমাপ্তি প্রত্যক্ষ করে। যতক্ষণ ভয় উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ ভয়কে ভয় পাবে। কিন্তু ভয় আগত হলে স্থিরচিত্তে প্রতিকার করতে চেষ্টা করবে। অনাগত কাজকেও অচিরাগত বিবেচনা করে বুদ্ধিবলে তার অনুসরণ করবে, কিন্তু বুদ্ধিভ্রংশবশত নিজের উদ্দেশ্য-সাধনে কখনও উপেক্ষা বা অনাদর

প্রদর্শন করবে না। শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অল্প হলেও কখনও উপেক্ষা করবে না, কারণ তারাই আবার কালক্রমে শত্রুভাব বদ্ধমূল করতে পারে।

কণিকের উদ্দেশ্য হল ধৃতরাষ্ট্রকে উত্তেজিত করা। এই উদ্দেশ্যকে তিনি গোপন করেন নি। কিন্তু নীতিহীন কাজটির সমর্থনে কি নিপুণভাবে একটি পশুকথাকে কাজে লাগালেন। পশুকথাটির সৃষ্টির সময় লোকসমাজেরও নিশ্চিতই একটি বক্তব্য ছিল, শেয়ালের এই কুৎসিত কাজের প্রতি একধরনের ঘৃণাই জন্মায়। গল্পটি শুনে সাধারণ মানুষ কোনোভাবেই শেয়ালের কাজকে সমর্থন করবে না। কিন্তু একজন প্রাজ্ঞ নীতিহীন মন্ত্রণাদাতা শেয়ালের কাজের সপক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব উপস্থিত করলেন। উচ্চতর সাহিত্যে যুক্ত হয়ে পশুকথাটির অভিপ্রায়ই বদলে গেল। পশুকথাটিকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করে কণিক ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, পাণ্ডব বা অন্য যে কেউ হোন না কেন, তাদের সঙ্গে ন্যায়ানুগত ব্যবহার করলে আপনি কখনই বিপদে পড়বেন না, এবং নির্বিবাদে আপনার কার্যসাধন করতে পারবেন।

পশুকথা ও তার অভিপ্রায় বিশ্লেষণ করার পরে মহাভারতকার সেই সর্বনাশা জতুগৃহ পর্বের কথা শুনিয়েছেন। কণিক তো চলে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রও তখন থেকে নিতান্ত শোকাকুল হলেন। তারপর সুবলনন্দন শকুনি, দুর্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ দুষ্টমন্ত্রণা করে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করে কুন্তী ও তার পঞ্চপুত্রকে দগ্ধ করতে মনস্থ করলেন। আশ্চর্য, ধৃতরাষ্ট্রও এই অমানবিক বীভৎস কাজের সমর্থন জানিয়েছিলেন। যেন মনে হয়, পশুকথাটির বিশ্লেষণ ধৃতরাষ্ট্রকে এই কাজে সমর্থন জানাতে উৎসাহ দিয়েছিল। উচ্চতর সাহিত্য নিজের প্রয়োজনেই লৌকিক ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছে।

যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করলেন, অসার দুর্বল ব্যক্তি দীর্ঘকাল নিকটে থেকে উপকার ও অপকারে সক্ষম উদ্যোগশালী মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুকে কথায় অবমানিত করলে সেই শত্রু যদি রাগে তাকে উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসে, তবে ঐ দুর্বল ব্যক্তি কিভাবে আত্মরক্ষা করবে? ভীষ্ম এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে একটি 'ইতিহাস' বললেন, শিমুল গাছ ও হাওয়ার কথা'। এই লোককথাটির মধ্যেই যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তর প্রচ্ছন্ন রয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে লোককথাটি রয়েছে।

ভীষ্ম লোককথার মাধ্যমে বলতে চেয়েছেন, যে ব্যক্তি দুর্বল হয়েও দুষ্টবুদ্ধির জন্য বলবানের সংগে শত্রুতা করে তাকে শেষকালে অনুতাপ করতে হয়। তাই বলবানের সংগে শত্রুতা করা দুর্বলদের উচিত নয়। তুল্য পরাক্রম ব্যক্তির সংগেও সহসা শত্রুতা করতে নেই। ঐরূপ ব্যক্তির সংগে ক্রমে ক্রমে বলপ্রয়োগ করাই বিধেয়। এই পৃথিবীতে বুদ্ধি ও বলের মতো উৎকৃষ্ট আর কিছুই নেই।

এই লোককথায় নারদ চরিত্র রয়েছে। নারদ আসলে কথক ও চারণকবি। নারদ লোকসমাজে অসাধারণ জনপ্রিয় একটি লৌকিক চরিত্র। উচ্চতর সাহিত্যে প্রবেশ করে তিনি দেবর্ষির মর্যাদা পেয়েছেন। দেবর্ষি হলেও তার কার্যকলাপ লোকচরিত্রের মতোই, অন্যান্য ঋষি-চরিত্রের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। লোকসমাজের সৃষ্ট চরিত্র বলেই তার ধরন-ধারণ লৌকিক।

হিমালয় পাহাড়ে ছিল এক বিশাল শিমুল গাছ। গাছ ছিল চারশ হাত বিস্তৃত। অসংখ্য ডাল-ফুল-পাতায় ছড়ানো। গাছের অনেক বয়েস। গাছের ডালে বসে থাকত নানা ধরনের পাখি। বনের হাতি, হরিণ ও অন্যান্য অনেক জন্তু গরম কালে সূর্যের তেজে ক্লান্ত হয়ে ঐ গাছের ছায়ায় দুদণ্ড বসে যেত, বিশ্রাম নিত।

এমনি একদিনের কথা। নারদ চলেছেন পথে। হঠাৎ ঐ বিশাল সুন্দর শিমুল গাছ দেখে তিনি বললেন, বাঃ! তুমি তো সুন্দর দেখতে! তোমার ছায়ায় বসে থাকতে সবারই ভালো লাগবে। তোমার ছায়ায় পশুপাখি বিশ্রাম নেয়। তোমার ডালপালা অনেক বড় আর শক্ত। ওগুলো হাওয়ার দাপটে কখনই ভেঙে পড়ে না। হাওয়া যে তোমায় রক্ষা করে তার কারণ কি? হাওয়া তো দেখছি তোমার কোনোই ক্ষতি করে নি? সে কি তোমার আত্মীয়? না কি তোমার সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব? হাওয়া বড় বড় গাছকে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু তোমার তো কোনো ক্ষতি করে নি। বুঝতেই পারছি, বন্ধুত্বের জন্যই তোমাকে সে রক্ষা করছে। হাওয়ার দয়াতেই তোমার এমন সুন্দর ডালপাতা। নইলে, এই পৃথিবীতে হাওয়ার দাপটে ভেঙে পড়ে না এমন পাহাড়-বাড়িঘর-গাছগাছালি আমি দেখি নি। বন্ধুর মতো হাওয়া তোমায় রক্ষা করছে বলেই তুমি নিশ্চন্ত রয়েছ।

শিমুল গাছ বলল, হাওয়া আমার বন্ধুও নয়, আমার দেবতাও নয়। সে কেন আমার দয়া দেখাবে? তার চেয়ে আমার তেজ ও বল অনেক বেশি। আমার আঠার ভাগের এক ভাগ বলও তার নেই। হাওয়া যদি সব গাছকে ভাঙতে ভাঙতেও আসে, তবু আমার কাছে এসে তাকে থমকে যেতে হবে। হাওয়া প্রবল বেগে অনেকবার আমার দিকে ধাওয়া করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারেনি। তাই হাওয়া যদি ভীষণ রেগেও যায়, তবু এখন আমার আর ভয় করে না।

নারদ বললেন, আরে, তুমি তো আচ্ছা বোকার মতো কথা বলছ! হাওয়ার মতো অত শক্তিশালী এই পৃথিবীতে আর কেউ নেই। ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ পর্যন্ত হাওয়ার মতো বলবান নয়, তুমি তো কোন্ ছার! হাওয়া সকলের প্রাণ রক্ষা করছে। শান্তভাবে হাওয়া বয়ে যায়, তাই নিঃশ্বাস নিয়ে প্রাণী বেঁচে থাকে। হাওয়া যদি অশান্ত হয়, তবে সকলকেই জীবনের আশা ছাড়তে হবে। দেখছি, তুমিই কেবল হাওয়ার বিরুদ্ধে কথা বলছ। তুমি

খুব বোকা, তুমি মহা বাচাল। তুমি খুব অসার। তুমি জেনেশুনে মিথ্যে কথা বলছ। তোমার তো খুব অহংকার। ঠিক আছে, তোমার এই দেমাকের কথা আমি হাওয়াকে গিয়ে বলছি। হাওয়ার নিন্দে আমি একেবারে শুনতে চাই না। চন্দন, তিনিশ, তাল, দেবদারু, বেতস ও বকুল গাছের মতো অমন শক্ত শাছও কখন হাওয়ার বিরুদ্ধে এসব কথা বলে না। তারা হাওয়ার শক্তি জানে বলেই চুপ করে থাকে। তুমিই দেখছি হাওয়ার শক্তি সম্পর্কে কিছুই জান না। ঠিক আছে, আমি হাওয়ার কাছে যাচ্ছি।

নারদ চললেন গাছ আর হাওয়ার মধ্যে ঝগড়া বাধাতে। হাওয়ার কাছে এসে নারদ বললেন, হাওয়া, হিমালয় পাহাড়ের ওপরে এক বিশাল শিমুল গাছ রয়েছে। সে তোমাকে মানতে চায় না। তার ওপরে তোমার বিরুদ্ধে আজেবাজে কথা বলে। আমি সেসব খারাপ কথা বলতে পারব না। আমি শুধু জানি, তুমি সবচেয়ে বলবান, তোমার ভীষণ রাগ।

নারদের এই কথায় হাওয়া খুব রেগে গেল। এত বড় আস্পর্ধা! রেগে লাল হয়ে সে শিমুল গাছের কাছে গিয়ে বলল, তুমি নারদের কাছে আমার নিন্দে করেছ? আমার নাম হাওয়া। আমি কে, আমার শক্তি কেমন,—তা এক্ষুনি তোমায় দেখিয়ে দেব। তোমার শক্তি আমার জানা আছে। তোমায় দয়া করে আমি রক্ষা করি, কোনো ক্ষতি করি না। কিন্তু তুমি নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়ে আছ তা কিন্তু কখনও ভেবো না। যাক, তুমি যখন আমার নিন্দা করে অপমান করেছ, তখন আমার শক্তি দেখাচ্ছি।

হাওয়ার এই কথায় হাসতে হাসতে শিমুল গাছ বলল, তোমার সাধ্যমতো তোমার শক্তি দেখাও। তুমি রেগে গেলে আমার কি হবে? তোমাকে আমি একটুও ভয় করি না, কেননা আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান। যাদের বুদ্ধি থাকে তারাই সত্যিকার বলবান। শুধু দেহের বল থাকলেই সে শক্তিমান হয় না।

শিমুল গাছের এই বেপরোয়া ভাব দেখে হাওয়া ভীষণ রেগে বলল, আমি কালকেই দেখাব, আমার শক্তি কেমন। এই কথা বলে হাওয়া সেখান থেকে চলে গেল।

একটু পরেই আঁধার ঘনিয়ে এল। রাত্রি হল। তখন শিমুল গাছ মনে মনে বলল, আমি তো জানি আমি কত দুর্বল। আমি জানি হাওয়ার কি প্রচণ্ড শক্তি। নারদের কাছে আমি যা বলেছি সবই মিথ্যা। হাওয়ার দাপট আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। নারদ যা বলেছেন তা সবই ঠিক। হাওয়ার শক্তি সত্যি অসাধারণ। যাইহোক, আমি অনেক গাছ থেকে সত্যিই দুর্বল, কিন্তু আমার মতো বুদ্ধিমান আর কোনো গাছ নেই। তাই বুদ্ধি দিয়েই হাওয়াকে হারাতে হবে। এখন আমার যেরকম কৌশল করতে ইচ্ছে করছে, সব গাছ যদি তাই করত, তবে হাওয়ার দাপটে বনের গাছ উপড়ে পড়ত না।

মনে মনে এই কথা বলে শিমুল গাছ তার সব ডালপালা কেটে ফেলল। শিমুল গাছে এখন ডাল নেই, ফুল নেই, ফল নেই, পাতা নেই। সব কেটে ফেলে গাছ অপেক্ষা করতে লাগল।

আঁধার কেটে গেল। আলো ফুটল চারিদিকে। সকাল হল। এমন সময় হাওয়ার শন্‌শন্‌ শব্দ শোনা গেল। দূরে দেখা গেল, বিশাল বিশাল গাছ মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। হাওয়া শিমুল গাছের কাছে এল। এসে দেখল, শিমুল গাছ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। নিজেই ভয়ে ডালপালা কেটে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শিমুল গাছের ভয় দেখে হাওয়ার আনন্দ দেখে কে!

তখন হাসতে হাসতে হাওয়া বলল, হায় গাছ! তুমি নিজেই তোমার যা অবস্থা করেছ, আমি তোমাকে এই রকমই করতাম। সেই দুরবস্থাই তোমার কপালে জুটত। যাক, আমার শক্তির কথা ভেবেই তুমি এই রকম হয়ে গিয়েছ। আমার নিন্দে করেছিলে, নিজের দোষেই আমার ভয়ে তোমার এই দশা। তোমার দেহে ডালপালা নেই, সুন্দর পাতা নেই, ফুল নেই।

হাওয়া এই কথা বলাতে শিমুল গাছ খুব লজ্জা পেল। সে অনুতাপ করতে লাগল।

মহাভারতের মধ্যে এই ধরনের অনেক পুরাণকথা-পশুকথা-রূপকথা-কিংবদন্তি স্থান পেয়েছে। কিছু লোককথা রয়েছে যেগুলি আজ আর লৌকিক ঐতিহ্য বলে চিনবার উপায় নেই। শাস্ত্রজ্ঞ প্রাজ্ঞ মহাকবির লেখনীতে তাদের রূপ আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। মোটিফ বিশ্লেষণ করে হয়তো তাদের লৌকিক রূপটির অস্পষ্ট আভাস মেলে, কিন্তু লিখিত রূপে তাদের এমনই বিবর্তন ঘটানো হয়েছে যে, লৌকিক ঐতিহ্য-রূপটি প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। কিন্তু লোককথার অনেক উদাহরণ যে অবিকৃত আকারেই পাওয়া যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মহাভারতীয় কাহিনীর স্বরূপ

মহাভারতকে বলা হয়েছে সংহিতা, মহাভারতকে বলা হয়েছে পঞ্চম বেদ। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত নিবন্ধ করেন চব্বিশ হাজার শ্লোকে। অষ্টাদশ পর্বের অতিরিক্ত মহাভারতের পরিশিষ্ট খিলহরিবংশ পুরাণ ধরলে এর শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ। কিন্তু এই অংশ অর্বাচীন, বহু পরে রচিত। মহারাজ জনমেজয় ও শৌনকাদি ঋষিকে মহাভারত শোনাতে গিয়ে বৈশম্পায়ন, উগ্রশ্রবা ও সৌতি যে বিষয়গুলি যোগ করেছিলেন এই অংশেই তা যুক্ত হয়েছে। শুধু এই

অংশই নয়, মূল অংশও একজন কবির রচনা নয়। হরিবংশ পুরাণ থেকে একটি সত্য প্রমাণিত হয়,—মহাভারত কালে কালে আদি বীজ থেকে মহাদ্রুমে পরিণত হয়েছে। মহাভারতকে লোক-মহাকাব্য বললেই যেন এর সঠিক স্বরূপ ধরা পড়ে। এ যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাথমিক ভারত-সংহিতা প্রথম সংকলিত মহাকাব্য। কেননা, লোকসমাজে মৌখিকভাবে প্রচলিত অসংখ্য লোককথার সংকলন রয়েছে এই মহাকাব্যে, বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লোককথার সমাবেশ ঘটেছে এখানে। পণ্ডিতেরা বলেন, আদিম কোনো লোককাহিনী কালে কালে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়ে মহাকাব্যের রূপ নেয়। মহাভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হয়তো ছিল লোককথার প্রাথমিক বীজ, তারপরে লৌকিক জনপদের অসংখ্য মৌখিক ঐতিহ্য এর কলেবর-বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। সংকলকের মুন্সিয়ানা হল, এইসব বিচ্ছিন্ন কাহিনীকে মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা রেখে যুক্ত করে দেওয়া। মহাভারতের সংকলকগণ এই কাজটি অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে করেছেন।

মহাভারতের আমলে কিছু নগর থাকলেও মূল সাংস্কৃতিক ধারা ছিল গ্রামীণ ও আরণ্যক। যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা পাওয়া যায় তাও মোটামুটি জাতি-উপজাতির মধ্যেকার বিরোধ, খাদ্য-সংগ্রাহক ও খাদ্য-উৎপাদকের মধ্যে যুদ্ধ,—যুদ্ধ ঘটেছে গোধন কিংবা রাজ্য নিয়ে। গ্রামীণ ও আরণ্যক পরিবেশে নানা গোষ্ঠীর মধ্যে আন্তরিকতার সম্পর্ক না থাকলেও নিবিড় যোগাযোগ ছিল,—বিবাহ-দাসদাসী গ্রহণ প্রভৃতি সম্পর্ক ছিল। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ছিল, মানসিক ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম ছিল,—এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে মহাভারতে। তাই মহাভারত সংকলিত হবার সময় ও পরবর্তীকালে কলেবর বৃদ্ধির সময়কালে খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ লৌকিক উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই পদ্ধতিতেই অনেক লোককথা মহাকাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।

জাতক

পৃথিবীর প্রাচীন যে সব লোককথার সংগ্রহ লিখিত আকারে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, জাতক তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকলন গ্রন্থ। জাতককে বলা হয় গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মগুলির বৃত্তান্ত। ধর্মীয় উপদেশ-দানই জাতকের মূল লক্ষ্য। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করতেন, মানুষ এক জন্মে কোনোভাবেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হয় না। বুদ্ধদেবের মতো 'অপারবিভূতি

সম্পন্ন সম্যকসম্বুদ্ধ' মানুষ এই জন্মের আগে অনেকবার জন্মগ্রহণ করেই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বোধ থেকেই জাতকগুলির সৃষ্টি।

রামায়ণ-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্র বা ঈশপের লোককথা যেমন সংকলন গ্রন্থ, জাতকও তাই। মূল কাঠামো হয়তো একজন রচয়িতার সৃষ্টি, কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কথক এর কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। তাই এসবের সঠিক কালনির্ণয় প্রায় অসম্ভব। বৌদ্ধদর্শন যতই জটিল ও উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, এই ধর্মে এমন কিছু আবেদন রয়েছে যা এককালে সাধারণ মানুষকে আন্তরিকভাবে আন্দোলিত করেছিল। জনশিক্ষা বা লোকশিক্ষা ছাড়া এই প্রভাব এত ব্যাপক হতে পারেনি। ধর্মদর্শনের মূল বিষয়গুলো সাধারণ মানুষকে বোঝাবার জন্য লোককথার ব্যবহার করা হত। বুদ্ধদেবের মতো অসাধারণ প্রাজ্ঞ মানুষ এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন। নিরক্ষর গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নিজের ধর্মমতকে প্রচার করবার সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হল গল্পকথার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া। তাই মনে হয়, জাতকের মূল প্রেরণা বুদ্ধদেব স্বয়ং। তিনি গল্পের মাধ্যমে ধর্মমত প্রচার করতেন। সেই হিসেবে বলা যায়, জাতকের প্রথম গল্পগুলি বুদ্ধদেব বলেছিলেন। তার সংখ্যা কত তা বলা সম্ভব নয়। তবে তিনিও যে লোককথাকে ব্যবহার করেছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গৌতমবুদ্ধের জীবনকাল হল ৫৬৩-৪৮৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। জাতকের মূল কাঠামোও এইকালে সংকলিত হয়। তারপর বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর থেকে জাতক স্ফীত হতে থাকে। গৌতমবুদ্ধই সমগ্র জাতকের স্রষ্টা, এই ধর্মীয় বিশ্বাসকে কোনোভাবেই গ্রহণ করা যায় না। জাতকের অর্ধেক কাহিনীতে কোনো বৌদ্ধ প্রভাব নেই, বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মগুলির সঙ্গেও তার কোনো সম্পর্ক নেই। লোককথাগুলি সংকলন করে জাতকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কষ্ট-কল্পনা করে কোনোভাবে মূল অংশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। লোককথাটির সঙ্গে জাতকের মানসিকতার সম্পর্ক যেন আরোপিত,—'পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোনো বনমধ্যবর্তী পদ্ম সরোবরের নিকটস্থ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন।' লোককথায় যা ঘটে গেল তিনি শুধু তা দেখলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশ হলে এভাবে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য লোককথা জাতকে স্থান পেত না।

জাতকের সংকলন শুধুমাত্র বৌদ্ধরাই করেন নি। একদিন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে গৌণধর্ম হয়ে গেল। বৌদ্ধেরা পুরনো হিন্দুধর্মে ফিরে এলেন। অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির হিন্দু মন্দিরে পরিণত হল, বৌদ্ধ দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীতে রূপান্তরিত হল। বুদ্ধকে অবতার হিসেবে প্রচার করলেন হিন্দুরা যখন বুঝলেন বৌদ্ধধর্মকে আর 'ভয়' পাওয়ার কিছু নেই; তখন জাতকের মধ্যেও তাদের অনুকূল বিষয়সমূহ অনুপ্রবিষ্ট হল। ভারতীয় লোকসমাজের

লোককথাগুলি নির্বিচারে জাতকের অন্তর্ভুক্ত হতে থাকল। তাই জাতকের মূল কাঠামোর সময়কাল নির্ধারণ করা গেলেও গোটা জাতকগ্রন্থ কবে বর্তমান সংকলনের রূপ পেল তা আর কোনোদিনই সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে একথা ঠিক, পালিভাষা যখন সমাজের গভীরে ব্যাপক ছিল তখনই জাতক সংকলিত হয়ে বর্তমান রূপ পেয়েছিল।

জাতকের আদি কাঠামো সংকলিত হয়েছিল প্রথম যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারলাভ করল। মগধ বা কলিঙ্গে এটি প্রথম সংকলিত হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম যখন প্রাচীন মগধ ও কলিঙ্গ ছাড়িয়ে কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া সাংকাশ্যা, অঙ্গ, বৈশালীর পথ বেয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ল, জাতকও একই ভাবে একই পথ বেয়ে প্রচারিত হতে থাকল। একদিন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাতকও সিংহল, তিব্বত, চীন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও জাপানে পাড়ি দিল। ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে জাতক প্রথম প্রচারিত হয় সিংহলে। কেননা, ২৪১ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে মহেন্দ্র বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যখন সিংহলে যান তখন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে জাতকও সঙ্গে নিয়েছিলেন। তবে তখনকার জাতকের আকার সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা দুরূহ।

ফসবৌলের যে জাতক সংকলনটি সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছে তাতে জাতকগুলির সংখ্যা হল ৫৪৭টি। ১৮৯৫-১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ই. বি কাওয়েল পালিভাষা থেকে ইংরেজিতে যে জাতক অনুবাদ করলেন তাতেও এই সংখ্যাই রয়েছে। যদিও এর মধ্যেও অনেক কাহিনীর পুনরুক্তি ঘটেছে। জাতকের আকার কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। উদীচ্য সংস্কৃত জাতকমালায় রয়েছে ৩৪টি জাতক। অনেকে বলেন, এগুলিই আদি জাতক। আবার মহাবস্তু গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে ৮০টি জাতক। তিব্বতের জাতকমালায় রয়েছে ৫৬৫টি জাতক কাহিনী। দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধশাস্ত্রে জাতকের সংখ্যা ৫৫০ টি। বুদ্ধদেবের সংকলন হলে সংখ্যার এমন তারতম্য ঘটত না, ধর্মপ্রবক্তার সংকলিত জাতক ধর্মীয় কারণেই অপরিবর্তিত থাকত। আসলে কথক কিংবা সংকলক কালে কালে তার নিজের সংগ্রহকে জাতকের অন্তর্ভুক্ত করে গৌরবান্বিত হতে চেয়েছেন।

জাতকমালার অন্তত সাড়ে চারশ' টি জাতক লৌকিক ঐতিহ্য থেকে সংকলন করা হয়েছিল। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য লৌকিক কাহিনীর মধ্যে থেকে নিজেদের প্রয়োজনে এগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। যেহেতু জাতক প্রচারের একটি বিশেষ ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল, তাই সংকলক যখন এগুলিকে গ্রন্থভুক্ত করলেন তখন মূল কাহিনীর প্রথমে ও শেষে কিছু মন্তব্য জুড়ে দিলেন। আর মাঝখানে কবিতার আকারে গাথাও দেওয়া হল। লোককথায় মাঝে-মধ্যে দু-এক ছত্র কবিতা যে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না তা নয়। কিন্তু এটা সাধারণত লোককথার ধর্ম নয়। পঞ্চতন্ত্রেও এই ধরনের উপদেশাত্মক কবিতা

ব্যবহৃত হয়েছে। জাতক বা পঞ্চতন্ত্রে এই কবিতার ব্যবহার করেছেন প্রাজ্ঞ সংকলক। লোককথা বলবার আগে সংকলক এইভাবে শুরু করেছেন : শাস্তা জেতবনে এক লোভী ভিক্ষুকের উদ্দেশে এই কথা বলেছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষু একদিন শাস্তার কাছে গিয়ে বললেন, ভগবন, এই ভিক্ষু বড় লোভী। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হে, এ কথা কি সত্যি? সে বলল, হ্যাঁ প্রভু। শাস্তা বললেন, তুমি অতীতকালেও লোভের জন্য প্রাণ হারিয়েছিলে, আর তোমার দোষে যারা বুদ্ধিমান তারাও নিজের নিজের আবাস থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই কথা বলে শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলতে আরম্ভ করলেন। এরপর শুরু হয় এইভাবে, পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব……জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারপর লোককথাটি বিবৃত করা হল। আর শেষাংশে 'সমবধান' অংশে বলা হয় বোধিসত্ত্ব সেই লোককথায় কে ছিলেন। গাথার প্রথম ও শেষ অংশ সংকলকের সৃষ্টি কিন্তু মাঝখানের কাহিনী অংশটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লোককথা।

একটি বিতর্কিত জাতক

বৌদ্ধজাতকে দশরথ-জাতক নামে একটি জাতককে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে বিতর্ক চলছে। একদিকে রয়েছেন যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত কিছু জ্ঞানী মানুষ আর অন্যপক্ষে রয়েছেন ধর্মীয় ভাবনায় উদ্দীপিত কিছু পণ্ডিত। দশরথ-জাতকটি একটি রূপকথার গল্প, এই কাহিনীর সঙ্গে বাল্মীকির রামকথার আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। দশরথ-জাতকের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে বিতর্কের কারণ বোঝা যাবে।

শাস্তা জেতবনে থাকবার সময় এক পিতৃহারা ভুস্বামীকে লক্ষ্য করে এই কথা বলেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি শোকে এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি সব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে শুধুই শোক করতেন। একদিন প্রভাতে শাস্তা সর্বলোক পর্যবেক্ষণ করতে বুঝলেন যে তার স্রোতাপন্ন-ফলপ্রাপ্তির সময় এসে গিয়েছে। তাই দেখে তিনি দিনমানে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার পরে আহার করলেন এবং অন্যান্য ভিক্ষুকে বিদায় দিয়ে কেবল একজন শ্রমণকে সঙ্গে নিয়ে সেই ভুস্বামীর বাড়িতে গেলেন। ভুস্বামী তাকে প্রণাম করলেন। তখন শাস্তা মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, উপাসক, তুমি কি খুব শোকার্ত হয়েছ? ভুস্বামী বললেন, হ্যাঁ ভদন্ত, পিতার মৃত্যুতে খুবই কাতর হয়েছি। শাস্তা বললেন, দেখ উপাসক, প্রাচীন পণ্ডিতেরা অষ্টলোক

ধর্ম জানতেন বলে পিতার মৃত্যু হলে অনুমাত্র শোকও অনুভব করেন নি। তখন ভুস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলতে লাগলেন,—

পুরাকালে বারাণসীতে দশরথ নামে এক মহারাজ ছিলেন। তিনি ছন্দ, দ্বেষ, মোহ, ভয়, এই চার রকমের অগতি পরিহার করতেন। তার ষোল হাজার অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন, তার মধ্যে অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার ও মেয়ের নাম সীতাদেবী।

অগ্রমহিষীর মৃত্যু হল। দশরথ তার বিয়োগে অনেক দিন শোকাভিভূত হয়ে রইলেন, শেষে মন্ত্রীদের পরামর্শে রানীর শ্রাদ্ধের পরে আর একজন স্ত্রীকে অগ্রমহিষীর পদে অধিষ্ঠিত করলেন।

নবীনা মহিষীও দশরথের প্রিয়া এবং মনোজ্ঞা হলেন। কিছুদিন পর তিনি গর্ভবতী হলেন ও তার একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। এই ছেলের নাম রাখা হল ভরতকুমার। রাজা পুত্রস্নেহের আবেগে একদিন রানীকে বললেন, প্রিয়ে, আমি তোমায় একটি বর দেব, কি বর চাও, বল। রানী বললেন, মহারাজা, আপনার বর দাসীর শিরোধার্য, কি বর চাই, তা এখন বলব না।

ভরতকুমারের বয়স সাত বছর হল। তখন একদিন রানী দশরথের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনি আমার ছেলেকে একটি বর দেবেন বলেছিলেন। এখন সেই প্রতিজ্ঞা পালন করুন। রাজা বললেন, কি বর চাও বল। রানী বললেন, আমার ছেলেকে রাজপদ দিন।

রাজা রেগে গিয়ে বললেন, নিপাত যাও বৃষলি, জ্বলন্ত আগুনের টুকরোর মতো আমার আরও দুটি ছেলে রয়েছে। তুমি কি তাদের মেরে ফেলতে চাও যে, নিজের ছেলেকে রাজ্য দেবার কথা বলছ?

রানী রাজার রাগ দেখে ভয় পেয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিন্তু তারপর থেকে বারবার রাজার কাছে ঐ একই অনুরোধ জানাতে লাগলেন। রাজা তাকে ওই বর দিলেন না বটে, কিন্তু চিন্তা করতে লাগলেন,—নারীজাতি অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী, রানী নিজের দুরভিসন্ধি সফল করার জন্য উৎকোচ দিয়ে আমার ছেলেদের প্রাণবধ করাতেও পারে। তখন রাজা বড় দুই ছেলেকে ডেকে এনে সব কথা জানিয়ে বললেন, এখানে থাকলে তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে। তোমরা কোনো সামন্ত রাজ্যে কিংবা বনে গিয়ে বাস কর। যখন শ্মশানে আমার দেহ ভস্মীভূত হবে, তখন ফিরে এসে পিতৃ-পিতামহের রাজ্য গ্রহণ করবে।

দুই ছেলেকে এই কথা বলে দশরথ দৈবজ্ঞ ডাকালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, বলুন তো, আমি আর কতকাল বাঁচব?

তারা বললেন, আরও বারো বছর আপনি বেঁচে থাকবেন।

সেই কথা শুনে রাজা বললেন, তোমরা বারো বছর পরে এসে রাজছত্র গ্রহণ করবে।

দুই ছেলে সম্মতি জানিয়ে পিতার পায়ে প্রণাম করে জলভরা চোখে প্রাসাদ থেকে চলে গেলেন। তখন সীতাদেবী বললেন, আমিও সহোদরদের সঙ্গে যাব। তিনিও পিতাকে প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পেছন পেছন গেলেন।

এই তিনজন যখন প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন, তখন হাজার হাজার নরনারী তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। এরা তাদের আসতে নিষেধ করলেন। কিছু-দিন পরে হিমালয়ে এলে তারা একজায়গায় আশ্রম তৈরি করে থাকতে লাগলেন। সেই জায়গায় ছিল ফলমূলের অনেক গাছ, সেখানে ছিল জলের উৎস।

লক্ষ্মণপণ্ডিত ও সীতাদেবী রামপণ্ডিতকে বললেন, আপনি আমাদের পিতৃ-স্থানীয়, আপনি আশ্রমেই থাকবেন, আমরা আপনার জন্য বনের ফল যোগাড় করে আনব।

রামপণ্ডিত এতে সম্মত হলেন। তখন থেকে তিনি আশ্রমেই থাকতেন। লক্ষ্মণ ও সীতা যে ফলমূল নিয়ে আসতেন, তাই খেতেন।

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা এইভাবে ফল খেয়ে সেখানে থাকতে লাগলেন। এদিকে মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে নয় বছরেই দেহত্যাগ করলেন। তার শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে ভরতের মাথার ওপরে রাজছত্র ধারণ করতে হবে।

কিন্তু মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না। তারা বললেন, যারা ছত্রের অধিপতি, তারা বনে বাস করছেন। তারা ভারতকে ছত্র দিলেন না। তখন ভরত ঠিক করলেন, আমি বনে গিয়ে অগ্রজ রামপণ্ডিতকে এনে রাজছত্র দেব।

তারপরে ভরত পাঁচ রকমের রাজচিহ্ন নিয়ে ও চতুরঙ্গ বলে পরিবৃত হয়ে সেই বনে গেলেন, কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি রামের আশ্রমে ঢুকলেন। সেই সময় লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ছিলেন না। রাম আশ্রম-দুয়ারে পরম নিশ্চিন্তে বসে রয়েছেন। ভরত তার কাছে গেলেন এবং দশরথের মৃত্যু-সংবাদ জানালেন। তারপর মন্ত্রীদের সঙ্গে রামের পায়ের কাছে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। রামপণ্ডিত কিন্তু শোক করলেন না, কাঁদলেনও না, তার সামান্য ইন্দ্রিয়বিকার ঘটল না।

কান্নার পরে ভরত রামের পাশে বসে রইলেন। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল, ফলমূল যোগাড় করে লক্ষ্মণ ও সীতা আশ্রমে ফিরে এলেন। তাদের দেখে রামপণ্ডিত ভাবতে লাগলেন, এদের বয়েস অল্প, এখনও আমার মতো পুরো জ্ঞানলাভ করেনি, যদি হঠাৎ বলি যে পিতার মৃত্যু হয়েছে, তাহলে শোক সামলাতে পারবে না, বেদনায় বুক ফেটে যাবে। তাই কোনোভাবে এদের জলের মধ্যে নামিয়ে এই দুঃসংবাদ জানাতে হবে।

তখন সামনে একটি জলাশয় দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, তোমরা আজ অনেক দেরি করে ফিরেছ, তাই তোমাদের সাজা দিচ্ছি, তোমরা এই জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাক।

লক্ষ্মণ ও সীতা এই কথা শোনামাত্র জলে নেমে গেলেন। তখন রামপণ্ডিত তাদের সেই দুঃসংবাদ জানালেন। লক্ষ্মণ ও সীতা পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জ্ঞান ফিরে আসার পরে আবার যখন এই কথা শুনলেন তখন আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এইভাবে তারা তিনবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলার পরে মন্ত্রীরা তাদের পারে নিয়ে এলেন। সেখানে জ্ঞান ফিরলে সকলে মিলে বিলাপ করতে লাগলেন। তখন ভরতকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, আমার ভাই লক্ষ্মণকুমার ও বোন সীতাদেবী পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছেন না, কিন্তু রামপণ্ডিত শোকে অভিভূত হননি, বিলাপও করছেন না। তার শোক না করবার কারণ কি? তাকেই জিজ্ঞাসা করি।

রামপণ্ডিত নিজের অশোকের কারণ বোঝাবার জন্য কয়েকটি গাথা বললেন। গাথাগুলির অর্থ হল: দিনরাত কান্নাকাটি করেও কেউ কাউকেই রক্ষা করতে পারে না, তাই বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও জ্ঞানবান ব্যক্তি তার জন্য বৃথা শোকে কখনই কাতর হয় না। শিশু বৃদ্ধ ধনী গরিব মূর্খ বিজ্ঞ সকলেই মৃত্যুর অধীন। গাছের ডালে ফল যখন খুব পেকে যায়, তখন সবসময়েই তার পতনের ভয় থাকে, জীবেরাও তেমনি জন্মাবার পর থেকেই দিনরাত মৃত্যুভয়ে কাঁপতে থাকে। সকালে যাদের দেখা পাই, সন্ধ্যাবেলায় তাদের অনেককেই দেখতে পাওয়া যায় না, এদের মধ্যে অনেকেই সকাল ফিরে আসবার আগেই যমের হাতে অদৃশ্য হয়ে যায়। মূঢ় ব্যক্তি বৃথা শোকে অভিভূত হয়ে আত্মার অশেষ ক্লেশ সৃষ্টি করে, শোকে শরীর ক্ষয় হয়, কোনো লাভ হয় না। শোক করে তো জীবন ফিরে পাওয়া যায় না, তাই কেঁদে কি লাভ? কর্মের বশে জীব যাতায়াত করে, কেউ মরে কেউ জন্মগ্রহণ করে। পিতা স্বর্গে গিয়েছেন, তাই তার জন্য কেঁদে লাভ কি? আমি ভেবেছি, পিতার স্থান নিয়ে গরিবকে দান করব, মানীর মান রাখব, আত্মীয়-স্বজনকে সাবধানে পালন করব। যারা সুধীর ও শাস্ত্রজ্ঞ বড় শোক এলেও তাদের হৃদয়কে দগ্ধ করতে পারে না। এই গাথাগুলির সাহায্যে রামপণ্ডিত সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়ে দিলেন। রামপণ্ডিতের এই ব্যাখ্যা শুনে সকলে শোকমুক্ত হলেন।

তারপর ভরতকুমার রামের চরণবন্দনা করে বললেন, চলুন, এখন বারাণসীতে ফিরে চলুন।

রাম বললেন, ভাই, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে যাও, আর এদের সঙ্গে রাজ্য শাসন কর।

না, দাদা, আপনাকেই রাজ্য গ্রহণ করতে হবে।

রাম বললেন, ভাই, বাবা বলেছিলেন বারো বছর পরে এসে রাজ্য নেবে। এখন ফিরলে তার আদেশ লঙ্ঘন করা হবে। আরও তিন বছর যাক। তারপরে আমি ফিরব।

এতদিন কে রাজ্য শাসন করবে ?

তুমি করবে।

আমি কখনই করব না।

তবে, আমি যতদিন না ফিরি ততদিন এই পাদুকা রাজ্য শাসন করবে। এই বলে রাম নিজের তৃণনির্মিত পাদুকাটি খুলে ভরতের হাতে দিলেন।

তখন ভরত লক্ষ্মণ ও সীতা ঐ পাদুকা নিয়ে রামের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, হাজার হাজার অনুচর নিয়ে তারা বারাণসীতে ফিরে গেলেন।

রামের পাদুকাই তিন বছর বারাণসীরাজ্যের শাসনকাজ চালাল। বিবাদের নিষ্পত্তির সময়ে মন্ত্রীরা পাদুকাকে সিংহাসনের ওপরে রেখে দিতেন, যদি নিষ্পত্তি ন্যায়বিরুদ্ধ হত, তাহলে পাদুকাদুটিতে পরস্পর আঘাত লাগত, তা দেখে মন্ত্রীরা সেই বিবাদের আবার বিচার করতেন। নিষ্পত্তি ন্যায়সঙ্গত হলে পাদুকাদুটি নিশ্চল হয়ে থাকত।

তিন বছর কেটে গেল। রামপণ্ডিত বন থেকে ফিরে এসে বারাণসীর উদ্যানে পৌঁছলেন। কুমার দুজন তার আসবার কথা শুনে মন্ত্রীদেব নিয়ে উদ্যানে গেলেন এবং সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে উভয়কে অভিষেক করলেন। রাম রথে চড়ে পুরবাসীদের সঙ্গে নগরে প্রবেশ করলেন। নগর প্রদক্ষিণ করে সুচন্দ্রক নামে প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচুতলায় উঠলেন। তারপর তিনি ষোল হাজার বছর যথাধর্ম রাজ্য শাসন করে স্বর্গবাসীদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এইভাবে ধর্ম উপদেশ দিয়ে শাস্তা জাতকের সমবধান করলেন। সত্য ব্যাখ্যা করবার পরে ঐ ভুস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হলেন। সমবধান—তখন মহারাজ শুদ্ধোধন ছিলেন মহারাজ দশরথ, মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, রাহুলজননী ছিলেন সীতা, আনন্দ ছিলেন ভরত, সারিপুত্র ছিলেন লক্ষ্মণ, বুদ্ধ-অনুচরেরা ছিলেন অন্যান্য ব্যক্তি এবং আমি ছিলাম রামপণ্ডিত।

মহাভারত আলোচনায় উল্লেখ করেছি, প্রাজ্ঞ সংকলকগণ নিজেদের দর্শন ও তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই লোককথাকে ব্যবহার করেন। এবং তাদের সেই উদ্দেশ্য তারা কোনোভাবেই গোপন করেন না। জাতকমালার সংকলক বিশেষ উদ্দেশ্যেই রামচন্দ্রের এই রূপকথাটি গ্রহণ করলেন। শাস্তা ভুস্বামীকে ধর্মীয় উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি জানেন বিমূর্ত উপদেশে তেমন ফল হয় না। তাই একটি অতীত কথা বললেন। সংসারের অনিত্যতা বিষয়ে বোঝানোই তার উদ্দেশ্য। বৌদ্ধধর্মে এই বিষয়টি সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। শোকাভিভূত হওয়া যে বিজ্ঞজনের পক্ষে অনুচিত,—এই বিষয়টি বোঝাবার জন্যই রামপণ্ডিতের উপাখ্যানের অবতারণা করা হয়েছে। মহাভারতকার যেমন ব্যবহার নীতি শেখাবার জন্য লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন, জাতককারও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে সেইভাবে লোককথার ব্যবহার করেছেন। দশরথ-জাতকের অভিপ্রায়

বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে এর মূল লক্ষ্য কি। ভরতের মনে প্রশ্ন জেগেছিল পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েও রামপণ্ডিতের শোক না করবার কারণ কি? এখন রাম তেরটি গাথা বললেন যার উদ্দেশ্য সংসারের অনিত্যতা ব্যাখ্যা করা। কাহিনী বলতে হয়েছে তাই বলা, কিন্তু মূল লক্ষ্য এই তেরটি গাথা। রামের মানসিকতা যেন বৌদ্ধধর্মের মানুষ গ্রহণ করেন সেই কারণেই অতীত কথার অবতারণা।

বাল্মীকি-রামায়ণের রামকথার সঙ্গে এই জাতকের কাহিনীর শুধুমাত্র কাঠামোতে মিল রয়েছে। সুখে রাজত্ব করছিলেন দশরথ। অশান্তি ডেকে আনলেন এক রানী। বনবাসে গেলেন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা। বনবাস থেকে ফিরে রাজা হলেন রাম। এ ছাড়া রামায়ণের সঙ্গে আর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণের কাহিনী অনেক জটিল, সেই কাহিনীতে যে নাটকীয়তা ও বীরত্বের কথা রয়েছে তার কিছুই এই জাতককাহিনীতে নেই। সহজ-সরল একটি রূপকথা। রামায়ণে রাবণ চরিত্রটি যে জটিলতা সৃষ্টি করল, যে অপরূপ নাটকের জন্ম দিল তার কোনো হদিস এই জাতকে নেই। সত্যি কথা বলতে কি, মিলের চেয়ে অমিলই বেশী। বিশেষ করে কয়েকটি ঘটনা এত ভিন্ন যে, রামায়ণ-পাঠকের অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দশরথ-রাম-লক্ষ্মণের চরিত্রগুলি মোটামুটি মেনে নেওয়া যায় কিন্তু ভরতের প্রথমদিকের কাজকে কেমন যেন আরোপিত বলে মনে হয়। মন্ত্রীরা ভরতকে রাজ্য দিলেন না বলেই ভরত যেন রামকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। অবশ্য পরে তিনি অনুজের মতোই ব্যবহার করেছেন। জাতকে তৃতীয় রানী ও চতুর্থ পুত্রের কোনো উল্লেখ নেই। পাটরানীর মৃত্যু হল, পরে আর একজনকে পাটরানী করা হল, কিন্তু তাকে যে কুমন্ত্রণা দিত সেই দাসী অনুপস্থিত। নারী হয়ে সীতা ফল আহরণ করতে যেতেন, রামপণ্ডিত আশ্রমেই থাকতেন। রাম একা বনে থাকলেন এবং লক্ষ্মণ ও সীতা ফিরে এলেন। সীতা রাম-লক্ষ্মণের বোন ও শেষকালে রামের পাটরানী। রামায়ণের সঙ্গে এইসব পার্থক্য বেশ চোখে পড়ে।

বাল্মীকি রামকথাকে গ্রহণ করেছিলেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে। তা হল: বাল্মীকি এমন একজন ব্যক্তির কথা শুনতে চেয়েছিলেন যিনি গুণবান বিদ্বান মহাবল-পরাক্রান্ত মহাত্মা ধর্মপরায়ণ সত্যবাদী কৃতজ্ঞ দৃঢ়ব্রত ও সৎচরিত্র। নারদ তখন রামচন্দ্রের কথা বলেন। আর ব্রহ্মা বাল্মীকিকে সমগ্র রামচরিত রচনা করতে আদেশ দিলেন। জাতক-সংকলক অন্য উদ্দেশ্যে রামকথাকে গ্রহণ করলেন।

দশরথ-জাতকের তিনটি অংশে এমন উক্তি রয়েছে যা থেকে প্রচণ্ড বিতর্কের শুরু। (ক) অগ্রমহিষীর গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বড় ছেলের নাম রামপণ্ডিত, ছোট ছেলের নাম লক্ষ্মণকুমার ও মেয়ের নাম

সীতাদেবী। (খ) তখন ভরতকুমার চিন্তা করতে লাগলেন, আমার ভাই লক্ষ্মণকুমার ও বোন সীতাদেবী পিতার মৃত্যু-সংবাদ শুনে শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছেন না। (গ) সীতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করে উভয়কে অভিষেক করলেন। অর্থাৎ জাতকে বলা হয়েছে, সীতা রামচন্দ্রের বোন এবং পরে বিবাহিতা স্ত্রী। জাতকে খুব সহজভাবে এই সম্পর্কের কথা জানানো হয়েছে, সামান্যতম বিদ্বেষ বা ঘৃণার কোনো ভাব নেই। ভাই-বোনের বিয়ে যেন খুব সহজ ঘটনা এবং তাই জাতকের রূপকথায় সহজভাবেই বলা হয়েছে। কাহিনীটিকে বিকৃত করা হয়েছে এমন কোনো আভাসই কিন্তু জাতকের রূপকথায় নেই। অথচ ধর্মীয় ভাবাবেগ কখন কিভাবে কাকে যে আঘাত করে তা বোঝা বড় কঠিন, বিশেষ করে অশিক্ষিত দেশে যেখানে মহাকাব্য-পুরাণ প্রভৃতির নায়ক-নায়িকারাও দেবদেবীর আসন দখল করে বসেন। জাতকের কাহিনীতে কোনো অসৎ উদ্দেশ্য না থাকলেও বিশেষ শ্রেণীর মানুষ তার মধ্যেও বিকৃতির গন্ধ পেলেন। অবশ্য ভাবাবেগই এর পেছনে কাজ করেছে, যুক্তি নয়।

বছর কয়েক আগে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, রামকথার আদি উৎস হল বৌদ্ধ-জাতকের দশরথ-জাতক। তিনি শুধু এই মন্তব্যই করেন নি, যুক্তি ও তথ্য দিয়ে বিষয়টি প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তার মন ছিল যুক্তিবাদী ও সংস্কারমুক্ত। একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই নির্ভয়ে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আমরা জানি, এর ফলে আচার্যকে অনেক লাঞ্ছনা ও শ্লেষবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। তিনি ভাইবোনের বিয়ের সম্পর্কটিকেও মেনে নিয়েছেন,—তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠেছিল।

এই ধরনের যুক্তিহীন অভিযোগ অনেক পুরনো। বৌদ্ধজাতকের অবিস্মরণীয় অনুবাদক আচার্য ঈশানচন্দ্র ঘোষের সময়েও হিন্দু-কাহিনীর অপকর্ষ ঘটানোর জন্য জাতককে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বাংলায় অনূদিত জাতকের ভূমিকায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ঈশানচন্দ্র লিখেছেন, রামায়ণ সম্ভবতঃ মূল মহাভারতের পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। ইহার এক অংশে বুদ্ধদেবের নাম দেখা যায় বটে; কিন্তু উহা পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। যদি এই অনুমান সত্য হয় তবে দশরথ-জাতকের সহিত রামায়ণের পার্থক্য ঘটিবার কারণ কি? 'দস বস্স-সহস্সানি···—'দশরথ জাতকের এই গাথাটীর প্রথমার্দ্ধ সংস্কৃতাকারে বাল্মীকির কাব্যে অবিকৃতভাবে দেখতে পাওয়া যায় (রামায়ণ, বালকাণ্ড, প্রথম সর্গ, ৯৮ শ্লোক—দশবর্ষসহস্রানি দশবর্ষ শতানি চ·····)। কাজেই সন্দেহ জন্মে যে, জাতককারই সমস্ত আখ্যানটী রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বিকৃতি ঘটাইয়া আখ্যানটীর অপকর্ষ সম্পাদন করা জাতককারের উদ্দেশ্য-বিরুদ্ধ এ যুক্তিও নিতান্ত দুর্বল নহে। তবে কি

বলিতে হইবে যে জাতকরচনার সময়েও রামায়ণের শ্লোকগুলি নানাস্থানে নানাভাবে চারণাদির মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; অতঃপর তাহাদের সঙ্কলন সম্পাদিত হয়?

ঈশানচন্দ্র শেষকালে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন তার মধ্যেই এই অপকর্ষ বিষয়টির সমাধান-সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। জাতককার কোনোভাবেই জনপ্রিয় এই রামকথার অপকর্ষ ঘটান নি। তারও উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার, জনপ্রিয় কোনো আখ্যানের অপকর্ষ ঘটালে শ্রোতা বা পাঠক তা কখনও সহজে মনে নেন না। মানুষের বিরক্তি উৎপাদন করা বৌদ্ধজাতকের উদ্দেশ্য নয়। আর দশরথ-জাতকটি পড়লেও বোঝা যাবে সেভাবে কাহিনীটি বলা হয়নি।

বাল্মীকি রামায়ণের সূচনাতেই আমরা জানতে পেরেছি, রামকথা ছিল বিদিত ও প্রচারিত কাহিনী। লোকাসমাজের নিজস্ব সম্পদ ছিল এই লোককথাটি। বাল্মীকি নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে তাকে অপরূপ মহাকাব্যে রূপান্তর ঘটালেন আর জাতকে প্রয়োজন ছিল শুধু কাহিনীটির। দুজনেই লৌকিক উৎস থেকে আখ্যানটি গ্রহণ করেছেন। কেউ কারও কাছে ঋণী নন, ঋণ শুধু লৌকিক ঐতিহ্যের কাছে। জাতক-মহাভারত-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতির অসংখ্য কাহিনীতে যে এত মিল তার কারণ উৎস। এক এক জন সংকলক এক এক উদ্দেশ্যে কাহিনীগুলিকে গ্রহণ করেছেন। কথক বা চারণকবিদের মুখে মুখে ফিরত এসব লোককথা-গাথা, সেখান থেকেই এগুলো উচ্চতর সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। তাই রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসিতে যা ঘটেছে, জাতকের কাহিনীমালাও সেভাবেই সংকলিত হয়েছে। পরে আমরা জাতকের অনেক কাহিনীর এই একই উৎসের সন্ধান দেব।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। জাতকের রামকাহিনীটি রামায়ণ কাহিনী থেকে এত আলাদা কেন? আসলে, রূপকথা-পশুকথা-লোকপুরাণ-পরীকথা নানা রূপে নানা অঞ্চলে দেখা যায়। মূল কাঠামোটি এক, কিন্তু এলাকাভেদে রূপের কিছু পরিবর্তন ঘটে। তাই আমরা দেখেছি, একটি লোককথার পঞ্চাশ-ষাটটি পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জাতকে এমন অনেক পশুকথা রয়েছে, যা কিছুটা অন্যভাবে পঞ্চতন্ত্র কিংবা হিতোপদেশে রয়েছে। যিনি যে এলাকা থেকে সংগ্রহ করেছেন সেখানকার রূপই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। জাতককার যে এলাকা থেকে দশরথের আখ্যানটি সংগ্রহ করেছিলেন সেখানকার লোকসমাজে এইভাবেই রূপকথাটি বলা হত। তাই রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে এত তফাৎ। দশরথ-জাতক ও রামকথার উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য, কিন্তু ভিন্ন এলাকার লোকসমাজের গল্প সংগ্রহ করেছিলেন দুই সংকলক।

দুটি আখ্যানের ভিন্নতার কারণ না হয় স্বীকার করে নেওয়া গেল, কিন্তু ভাইবোন রাম সীতার বিয়ের বিষয়টি তো বিতর্কিতই থেকে যায়।

লোকসমাজ নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ হতে পারেন কিন্তু তারা অশিক্ষিত নন, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ আশ্চর্য শিক্ষিত মানুষ। তাদের সৃষ্ট মৌখিক লোককথায় থাকে ইচ্ছাপূরণের তাগিদ। জীবনে যা পাওয়া হল না, লোককথার মাধ্যমে সেই ইচ্ছাকে তারা পূর্ণতা দেন। লোককথায় প্রতীক ও রূপকের আড়ালে থাকে অবিচার-বেদনা-অত্যাচার-আশা-আকাঙ্ক্ষার রূঢ় বাস্তব ছবি। আর থাকে সামাজিক ইতিহাস ও রীতিনীতির খণ্ড চিত্র। এক সময়ে লৌকিক সমাজে যে রীতি প্রচলিত থাকে তা লোককথায় স্থান করে নেয়। পরবর্তী কালে রীতিটি বিলুপ্ত হলে অনেক সময় লোককথায় তা বাদ পড়েও যায়, আবার অনেক সময় থেকেও যায়। সমাজের এমন একটি স্তরে আমরা পৌঁছই যখন সেই রীতিটিকে উদ্ভট-অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। কিন্তু একসময় তা যে সমাজে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ মেলে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়। ভারত ও আফ্রিকার রূপকথায় আমরা দেখি, রাজপুত্র অনেক বাধা পেরিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করল, তারপরে রাজকন্যাকে বিয়ে করে অর্ধেক রাজত্ব পেয়ে সেখানেই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল। অধিকাংশ রূপকথায় দেখি, রাজপুত্র আর পিতৃরাজ্যে ফিরে এল না। এটা হয়তো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভুলে-যাওয়া চিত্র। রাজকন্যা পেল পিতার সম্পদ, আবার রাজপুত্রের বোন হয়তো পাবে রাজপুত্রের পিতার সম্পদ। তাই ফেরার প্রশ্নই ওঠে না।

সামাজিক কোনো রীতিনীতি এককালে অনুমোদিত থাকলেও পরে তা যদি নিন্দিত হয় তবে তার ওপরে দেবত্ব বা অতিলৌকিকত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু মূল কাহিনীটি থেকেই যায়। দেবত্ব আরোপের পরে রীতিটি আর তেমন কুৎসিত বলে মনে হয় না। একসময় কুমারীর সন্তান হওয়া ছিল স্বাভাবিক, সমাজে তা স্বীকৃতও ছিল। কিন্তু যেই সমাজ এই প্রথাকে নিষিদ্ধ করল তখনই দেবত্ব আরোপের প্রশ্ন ওঠে। কুন্তী ও মাতা মেরীর কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ার বিষয়টি ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু সমাজ-বিবর্তনের পথে এই রীতিটি যখন নিষিদ্ধ হল, তখনই দৈব প্রভাবের বিষয়টি যুক্ত হল।

ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি এই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। ভারতবর্ষে

বহুকাল আগেই এই বিয়ে নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু দশরথ-জাতকের ঐ আখ্যানে তার রেশ রয়ে গিয়েছে। সামাজিক ইতিহাসের একটি বিশেষ প্রথা ক্ষীণভাবে আখ্যানটির মধ্যে রয়ে গিয়েছে। ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি শুধু লোককথাতেই নয়, ইতিহাসও তার সাক্ষী। স্বয়ং বুদ্ধ যে বংশে জন্মেছিলেন, সেই লিচ্ছবিদেরই কোনো শাখার মধ্যে এই রীতি প্রচলিত ছিল।

ভারতের সাঁওতাল আদিবাসীদের এক প্রাচীন মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তাদের সংস্কৃতি ও ভাষার শব্দভাণ্ডারের কাছে আমরা ঋণী। তাদের সৃষ্টি-বিষয়ক লোকপুরাণে রয়েছে ঃ

খেরোওয়াল বংশের আদি পিতামাতার নাম পিলচু হাড়াম ও পিলচু বুড়ি। তাদের সাত ছেলে ও সাত মেয়ে ছিল। ছেলেদের নাম লিটা কাতরি, লাও লাসান, ভীম অর্জুন, কাপি কারান, টেগচ সুরাই, রতন পঁড়া ও হুদুড় দুর্গা। মেয়েদের নাম ছিতা, কাপারা, দানগী, পুড়গী, হিঁসি, ছুমনী ও গুইরী।

ছেলেমেয়েরা বড় হলে বাবা-মা ভাবলেন, এরা যদি একসাথে থাকে তাহলে যৌবনের চপলতার সুযোগে পদস্খলন হতে পারে এবং অসামাজিক কাজ করতে পারে। কারণ তারাও নিজেরা হাঁস ও হাঁসীর ডিম থেকে জাত ভাই ও বোন। কিন্তু তারা মারাং বুরুর সাহচর্যে থেকে দেবভাবাপন্ন হলেও মানুষের বংশ-বৃদ্ধির জন্য গুরুদেব তাদের হাঁড়িয়া খাইয়ে অজ্ঞান করায় তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে ঐ ধরনের দোষ-দুষ্ট না হয়, সেই জন্য পিলচু বুড়া ছেলেদের নিয়ে খাদেরা বনে চলে যায় আর পিলচু বুড়ি মেয়েদের নিয়ে খাইরী বনে চলে যায়।

বাবা ছেলেদের সাবধান করে বলেছিলেন, তারা যেন খাইরী বনে শিকার করতে না যায়। কেননা, সেই বনে এক ধরনের কুকুর আছে, তারা মানুষকে পেলে ভীষণভাবে আক্রমণ করবে। পিলচু বুড়িও মেয়েদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, তারা যেন খাদেরা বনে শাকপাতা বা ছাতু কুড়োতে না যায়। কেননা, খাদেরা বনে এক ধরনের হিংস্র কুকুর আছে, তারা মানুষকে পেলে ভীষণ-ভাবে আক্রমণ করবে।

কিন্তু ছেলেদের তখন যৌবন কাল, কাউকে ভয় করে না। সেইজন্য পিতার আদেশ লঙ্ঘন করে খাইরী বনে শিকার করতে গেল। দৈবক্রমে তারা একটি হরিণ পেয়ে গেল, তাকে তীর ছুড়ে মারল। তারা তীর খুঁজতে খুঁজতে ও হরিণের রক্ত অনুসরণ করতে করতে এক জায়গায় এল। সেখানে তাদের বোনেরা চাঁপাকিয়া বড় গাছের ঝুরিতে ঝুলছিল। ভাইয়েরা বোনেদের দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। বোনেরাও ভাইদের দেখে অবাক।

তারা পরস্পরের জাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে বোনেরা বলল, আমাদের জাতি ঠাণ্ডা কলসী ও বেটনা। বোনেরাও ভাইদের জিজ্ঞাসা করাতে ভাইরা বলল, লাঙলের বাঁকা বোঁটা ও গোরু তাড়াবার লাঠি। পরস্পরের উত্তর শুনে

তারা বিচার করে দেখল, তারা এক জাতি নয়। ওদিকে যৌবনের চপলতার সুযোগে ও কামের তাড়নায় ভাই বোন আগুপিছু না ভেবে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করল ও আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। তারা কেউ বাবা-মার কথা স্মরণ করল না।

অনেক রাত হয়ে গেল তবু মেয়েরা মায়ের কাছে ফিরে গেল না। তখন পিলচু বুড়ি পিলচুর কাছে গিয়ে বলল, মেয়েরা আজ এখনও ফিরে যায় নি। পিলচু বুড়াও বলল, ছেলেরাও ফিরে আসেনি।

তখন পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ি ছেলেমেয়েদের খোঁজে বের হল ও সেই চাঁপাকিয়া বড় গাছের তলায় তাদের দেখতে পেল। অগত্যা তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে তাদের সংসারী করে দিল।

এইসব ঘটনা লিটার কানে পেঁছাতে তিনি ভাবলেন, এরা সকলেই কামাসক্ত। তাহলে কি উপায়ে একটি সৎ বংশ জন্মগ্রহণ করে জগতে দেবভাব প্রচার করবে। তখন মারাং বুরু ছোট ছেলে হুদুড় দুর্গা ও ছোট মেয়ে গুইরীর মনের মধ্যে দাদা-দিদিদের প্রতি ঘৃণা ও তার প্রতি ভক্তি ও সংসারে অনাসক্ত ভাবের সঞ্চার করলেন। তখন তাদের মনে সংসারে বিরাগ ভাবের সঞ্চার হওয়াতে এবং মারাং বুরুর মনোরঞ্জনের জন্য তারা ঘর থেকে বেরিয়ে বনে তপস্যা করতে গেল।

তারা নানা বনে প্রবেশ করে বনের ফলমূল আহরণ করে দিন কাটাতে লাগল। রাতে তারা গাছের কোটরে বাস করত। মারাং বুরু সময় সময় তাদের কাছে যেতেন এবং বিয়ে দেবার প্রস্তাব করে তাদের মন পরীক্ষা করতেন। উত্তরে দুর্গা ও গুইরী বলত, দাদা, আমাদের বিয়ের কথা বলবেন না। আমরা ভালো আছি। আপনার সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দেব।

এইভাবে তারা বনে বাস করে, ফলমূল খেয়ে, গাছের কোটরে রাত কাটিয়ে ও নিয়মিত মারাং বুরুর সেবা করে কষ্ট সহিষ্ণু ও সংযমী হয়ে উঠল। তারা অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হল।

পুরুষমানুষ চিরকাল সাধু-সন্ন্যাসীর মতো হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু মেয়েরা সেভাবে চিরকাল থাকতে পারে না। গুইরীর মনেও এই একা একা থাকা দুর্বহ হয়ে উঠল। এইজন্য সে সময় সময় তার এই নিঃসঙ্গতার জন্য মনের দুঃখ গানে প্রকাশ করত।

দুর্গা বনের মধ্যে ফলমূল আহরণের জন্য সব জায়গায় ঘুরত। দৈবক্রমে গুইরীর এই গান দুর্গার কানে পৌঁছল। সে ভাবল, এতদিন আমি বনের মধ্যে বাস করছি, কোনোদিন কোনো মানুষের দেখা পাই নি। আজ কে কোথা থেকে এসে এখানে কাঁদছ ? আমি তাকে দেখব, সে কেন কাঁদছে তা জিজ্ঞেস করব।

এই কথা ভেবে দুর্গা গান লক্ষ্য করে সেই দিকে গেল। এদিকে গুইরী মানুষের সাড়া পেয়েই সেই গাছের কোটরে আশ্রয় নিল। কতদিন ধরে দুর্গা গুইরীকে ধরার জন্য চেষ্টা করল। কিন্তু তাকে ধরতে পারল না।

শেষকালে দুর্গা বনের মধ্যে লুকিয়ে রইল। আর যেমনি গুইরী আবার গান আরম্ভ করেছে, অমনি পেছন দিক থেকে গিয়ে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। গুইরী পালাবার অনেক চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পরে বলল, কে তুমি ডোম না হাড়ি আমাকে স্পর্শ করলে? আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার বাসায় চলে যাব।

তখন দুর্গা বলল, আমি ডোম কি হাড়ি নই, আমি তপস্বী। তোমার পরিচয় দাও। কেন তুমি কাঁদ? এসব কথার উত্তর না দিলে আমি তোমায় ছাড়ব না।

তখন গুইরী বলল, আমি কে তা জানি না, তবে আমি এই বনে বাস করি। আমি একা একা থাকি। আমার স্বামী নেই, তাই যখন মনে খুব দুঃখ হয় তখন গানে মনের দুঃখ জানাই, মনকে হালকা করতে চেষ্টা করি।

গুইরীও দুর্গাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? কোথা থেকে এলে?

দুর্গা বলল, আমি অন্য বনে থাকি। আমিও একা একা থাকি। ফল-মূল আহরণ করতে এসে তোমার কান্না শুনতে পাই। তুমিও একা, আমিও একা,—একসঙ্গে থাকলে কি ভালো হয় না? চল, আমরা একসঙ্গে থাকি।

দুর্গার এই প্রস্তাব শুনে গুইরী বলল, আমরা একা একা আছি, বেশ ভালোই আছি, যা দুঃখ-কষ্ট তা অন্য কাউকেই ভোগ করতে হবে না। দুজন একসঙ্গে থাকলে দুঃখ-কষ্ট বাড়বে।

দুর্গা তখন বলল, দুজন একসঙ্গে থাকলে দুঃখ-কষ্ট ভাগ করে নেব। দুজন একসঙ্গে থাকলে মনোবল বাড়বে, দুঃখ-কষ্ট কম হবে। চল আমরা একসঙ্গেই থাকি।

এবারে গুইরী আর কিছু বলতে পারল না। দুজন একসঙ্গে অযোধ্যা বনে বাস করতে লাগল। এরাই মুরমু ঠাকুর বা ব্রাহ্মণ। যেহেতু সংসারে থাকার জন্য যে গুণ দরকার বনের মধ্যে থেকে অভ্যাস করে তারা তা শিখেছিল। দুর্গা ও গুইরী সংসারী হল। তাদের সাত ছেলে জন্মাল। শেষের দুজনেই কুরমু ধুরমু।

সমাজে একটি রীতি অনেকদিন প্রচলিত থাকার পরে তা অনেকসময় নিষিদ্ধ হয়। মূল্যবোধ পালটে যায়, মানুষের চিন্তার উন্নয়ন ঘটে। এই আদিবাসী সমাজে ভাইবোনের মধ্যে বিয়ের প্রচলন ছিল। কিন্তু সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে যখন চিন্তায় বিবর্তন ঘটে গেল, তখন এই বিয়ের সম্পর্কটিও বন্ধ হয়ে গেল। বাবা-মায়েরা যেদিন উপলব্ধি করলেন, ভাই-বোনের বিয়ের সম্পর্কটি সমাজের পক্ষে শুভ নয় তখনই তারা ছেলেমেয়েদের আলাদা বনে পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ সচেতনতা জেগে উঠেছে। কিন্তু এই ভাইবোন বিয়ের বিষয়টি পরবর্তী কালে আদিবাসী সমাজ থেকে বিলুপ্ত হলেও প্রাচীন প্রথার রেশ রয়ে গিয়েছে এই সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণটিতে।

আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশে কালাহারি মরুভূমি এলাকার নুগোমুবে আদিবাসীদের একটি লোককথায় রয়েছে এই একই বিষয়। পৃথিবীতে এত লোক এলো কেমন করে,—এই ভাবনা থেকেই এই লোকপুরাণটির জন্ম। লোকপুরাণটি হল ঃ

সেই আদ্যিকালে আমাদের এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ ছিল না। মানুষ আকাশে আকোংগোর সঙ্গে সুখে-শান্তিতে বাস করত। সেই আকাশে থাকত এক বৌ, তার নাম মুবোকোমু। সব বিষয়েই তার ছিল বিরক্তি, সে ছিল ভীষণ দজ্জাল।

একদিন হল কি, আকোংগো রেগে গিয়ে সেই বৌকে আর তার এক মেয়ে ও এক ছেলেকে ঝুড়ির মধ্যে রেখে, কিছু গম, কিছু আখ আর মেটে আলু দিয়ে ঝুড়ি নামিয়ে দিলেন। তারা এসে পৌঁছল পৃথিবীতে।

তারা পৃথিবীতে এসে একটা বাগান তৈরি করল। গম, আখ আর আলু বুনল। দিনরাত যত্ন নিত সেই বাগানের। প্রচুর ফসল হল।

একদিন মা বলল, আমরা মরে গেলে এই বাগানের যত্ন নেবার আর কেউ থাকবে না। বাগান শুকিয়ে যাবে।

ছেলে বলল, তা আর কি করা যাবে ? কেউ না থাকলে বাগান তো শুকিয়ে যাবেই।

মা বলল, তোমার ছেলেমেয়ে হওয়া দরকার।

ছেলে বলল, কেমন করে ? আমরা তো এখানে মাত্র তিনজন রয়েছি। অন্য কেউ তো নেই। আমি বৌ পাব কোথায় ?

মা সঙ্গে-সঙ্গে বলল, তোমার বোন তো একজন মেয়ে। তাকেই বিয়ে কর, তাহলে ছেলেমেয়ে হবে।

ছেলে কিন্তু মায়ের কথায় রাজি হল না। মা বারবার একই কথা বলে আর ছেলেও রাজি হয় না। এমনি করে দিন যায়।

শেষকালে মা একদিন রেগে গিয়ে বলল, এইভাবেই কি চলবে ? ছেলেমেয়ে না রেখেই মরে যাবে ? বাগানের গাছ-গাছালি দেখবে কে ? তুমি যদি বোনকে বিয়ে কর, তবেই তোমাদের ছেলেমেয়ে হতে পারে। ওসব কথা শুনছি না, বোনকে বিয়ে করতেই হবে। অনেক হয়েছে।

শেষকালে ছেলে রাজি হল। বোনকে বিয়ে করল। মেয়েও হাসিমুখে মেনে নিল ছেলেকে। তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে লাগল। কিছুদিন পরে মেয়েটি পোয়াতি হল। মেয়ের ছেলে হল। তারপর তাদের আরও অনেক ছেলেমেয়ে হল। পৃথিবী মানুষে ভরে গেল।

ভাই-বোনের বিয়ে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ছেলে যে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল তা পরবর্তীকালে গল্পে আরোপিত হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ধারায় পারিবারিক সম্পর্ক যখন উন্নত হল, মানুষের সম্পর্কগত মূল্যবোধ

যখন পরিশীলিত হল, ভাইবোনের মধুর সম্পর্কটি যখন সমাজ অনুভব করল তখনই মৃদু আপত্তি করতে করতে একদিন সেই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গেল। সমাজ একদিন এমন স্তরে এসে পৌঁছল যখন ভাইবোনের সম্পর্কের মধ্যে দৈহিক মিলনের স্থূল বিষয়টিকে বর্জন করল। তাই আজকের সমাজ-ব্যবস্থায় বেড়ে-ওঠা মানসিকতায় সেই প্রাচীন প্রথাটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ভাইবোনের বিয়ের সম্পর্ক বিষয়ে লোককথা খুব যে বেশি রয়েছে তা নয়। তবে ঐতিহ্যবাহিত কিছু সমাজে এরকম কিছু লোককথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বিহারের গিরিডি জেলার বেনিয়াডি এলাকার শিকারজীবী একজন আদিবাসী ও উত্তরপ্রদেশের মুসৌরীর চাক্রাতা রাস্তার পাশে এক গ্রামে একজন গাড়োয়ালী পাহাড়িয়ার মুখে ভাইবোনের বিয়ের লোককথা শুনেছিলাম। আর কেউ নেই, ভাইবোন তাই বাধ্য হয়ে বিয়ে করল। কিন্তু পাহাড় ও বনের দেবতা ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, তোমাদের ক্ষমা করলাম, কিন্তু এই কাজ আর যেন কেউ না করে। বোঝাই যাচ্ছে, এই বিয়ের সম্পর্কটি ট্যাবু হয়ে যাওয়ার পরেই দেবতার রোষের কাহিনীটি যুক্ত হয়েছে।

এস্কিমো, আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব ও ম্যাকেনজি এলাকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে 'সূর্য ও চন্দ্র'র কিছু লোককথা রয়েছে। সূর্য হল ভাই, চন্দ্র হল বোন। তারা বিয়ে করেছিল কিন্তু আকাশের দেবতার অভিশাপে তাদের মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি হয়ে যায়। তাই আজ আর কখনই তাদের একজনের সঙ্গে অন্যজনের দেখা হয় না। উত্তর আমেরিকার অনেক আদিবাসীর মধ্যেও এ ধরনের ভাইবোনের বিয়ের লোককথা রয়েছে।

পৃথিবীর অনেক জনগোষ্ঠীর লোকপুরাণে রয়েছে, কোনো কারণে একটি নারী ও একটি পুরুষ স্বর্গচ্যুত হল। তারাই পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। তারপরে পৃথিবীতে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল। বাইবেলের আদম-ইভের কাহিনী তো অতি পরিচিত। এখানেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেওয়া হল। এই আদি মানব-মানবীর ছেলে বৌ পেল কোথায়? মেয়ে স্বামী পেল কোথায়? তারা নিশ্চয়ই সহোদর-সহোদরা ছিল। অবশ্য এই আদি মানব-মানবীর কথা নেহাতই কল্পনা।

তবে ভাইবোনের বিয়ে সম্পর্কে যত লোককথা সংগৃহীত হয়েছে, তার অধিকাংশের মধ্যেই এই সম্পর্কটিকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া হয়নি।

ইতিহাসের বাস্তব উদাহরণের দিকে তাকালেও আমরা ভাইবোনের বিয়ের নিদর্শন পাই। মিশর, পারস্য, পেরু, শ্যাম, সিংহল, ওয়েলস, ব্রহ্মদেশ, হাওয়াই ও উগাণ্ডার রাজপরিবার, সামন্তপ্রভু ও সমাজের উচ্চস্তরের ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে এই সেদিনও ভাইবোনে বিয়ে হত। এটা প্রাগৈতিহাসিক বা

আদিম কালের কথা নয়। মিশরে শুধু রাজ পরিবারে নয় সাধারণ লোকসমাজেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। ইউরোপীয় মানুষেরা যখন এসব দেশে আসতে শুরু করল, খ্রীস্টধর্ম যখন প্রভাব ফেলতে শুরু করল, তখন থেকেই ধীরে ধীরে সমাজে এই বিয়ের সম্পর্কটি বিলুপ্ত হতে থাকল। হাওয়াই দ্বীপে এই প্রথা এখনও প্রচলিত রয়েছে। ভারতের হিমালয় এলাকায় বিষয়সম্পত্তি অটুট রাখার জন্য কিছু আদিবাসী সমাজে এখনও এই ধরনের বিয়ের প্রথা চালু রয়েছে।

তাই একথা বলা যায় যে, জাতকের সংগ্রাহক দশরথ-জাতকে কোনো সম্পর্কের অপকর্ষ ঘটান নি। তিনি এই ধরনের একটি লোককথাকে হুবহু সংকলনে স্থান দিয়েছেন। আর হিন্দুধর্মের অপকর্ষ দেখানোও তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা, হিন্দু পুরাণেও ভাইবোনের বিয়ের বিষয়টি একেবারে অনুল্লিখিত নয়।

ভারতীয় পুরাণে ধর্মরাজ, দক্ষিণদিকের অধিপতি, জীবের পাপপুণ্যের ফলদানকারী যম সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এর পিতা সূর্য, মাতা সংজ্ঞা। এর বাহন মোষ ও অস্ত্র দণ্ড। দক্ষ প্রজাপতির তেরটি কন্যাকে ইনি বিয়ে করেন, এদের গর্ভে যমের সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব, নর ও নারায়ণ এই কটি পুত্র জন্মায়। কুন্তীর গর্ভে যমের ঔরসে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়।

আরও কাহিনী রয়েছে। বৈদিক পুরাণে বলা হয়েছে, যমের প্রতি দেবত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু তিনিই প্রথম মানুষ যিনি মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। যম ও তার বোন যমী পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। তাহলে লোকপুরাণের মতে, তাদের সন্তানদের নিশ্চয়ই ভাইবোনে বিয়ে হয়েছিল যেমন তারাও ভাই-বোন ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। ঋগ্বেদে অন্য কাহিনী আছে। বোন যমী নির্জন দ্বীপে ভাইকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন,—বিস্তীর্ণ সমুদ্র-মধ্যবর্তী এই দ্বীপে এসে এ নির্জন প্রদেশে তোমার সহবাসের জন্য আমি অভিলাষিণী। কেননা, গর্ভাবস্থা থেকে তুমি আমার সহচর। বিধাতা মনে মনে চিন্তা করে রেখেছেন যে তোমার ঔরসে আমার গর্ভে আমাদের পিতার এক সুন্দর নাতি জন্মাবে। ভাই যম যে এই প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়েছেন, পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা পরবর্তীকালে আরোপিত। বৈদিক সমাজের এক স্তরে এই প্রথা অবশ্যই প্রচলিত ছিল।

বিষ্ণু, কুর্ম, ব্রহ্মাণ্ড ও গরুড় পুরাণে আছে, মনুর অন্যতমা কন্যা কাকুতি প্রজাপতি রুচির স্ত্রী ছিলেন। কাকুতির গর্ভে যজ্ঞ নামে এক ছেলে ও দক্ষিণা নামে এক মেয়ে জন্মায়। যজ্ঞ নিজের বোন দক্ষিণাকে বিয়ে করেন।

দ্বাপরের অবসানে ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্মের জন্ম হয়। অধর্মের স্ত্রীর নাম মিথ্যা। তাদের দম্ভ নামে এক ছেলে হয়। দম্ভ নিজের বোন মায়াকে বিয়ে করে। এই কাহিনীটির মধ্যে সুন্দর প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। দম্ভ ও মায়ার এক ছেলে হয়। তার নাম লোভ। লোভ নিজের বোন নিবৃত্তিকে বিয়ে করে। তাদের আবার ক্রোধ ও হিংসা নামে ছেলেমেয়ে হয়। ক্রোধ নিজের বোন হিংসাকে বিয়ে করে। অধর্ম ও মিথ্যা মিলিত হলে যে সর্বনাশের জন্ম হয় এই কাহিনী যেন তারই ইঙ্গিত বহন করছে।

এরকম অনেক কাহিনী রয়েছে ভারতীয় লোকপুরাণে। সমাজে ভাইবোনের বিয়ের প্রথাটি ছিল বলেই লোকপুরাণ-রূপকথায় তা স্বাভাবিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরকম একটি রূপকথাই হল দশরথ-জাতক। লৌকিক ঐতিহ্য থেকেই জাতককার, বাল্মীকি ও বেদব্যাস দশরথের কাহিনীকে তাদের সংকলনে লিপিবদ্ধ করে যান। উৎস এক, কারও প্রভাবে কেউ প্রভাবিত হননি।

জাতকে পশুকথা

জাতকে অসংখ্য পশুকথা সংকলিত হয়েছে। অবশ্যই জাতকের আদর্শের প্রয়োজনে। এর মধ্যে অনেক পশুকথা লিপিবদ্ধ রয়েছে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে, সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে, হিতোপদেশে এবং ঈশপের নীতিকথায়। এর মধ্যে নেকড়ে ও সারস এবং সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভ পশুকথা দুটি খুবই জনপ্রিয়। যেহেতু অন্য সংকলনগুলোর অনেক আগে জাতকের জন্ম, তাই স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে, জাতকের সংকলন থেকে এগুলো অন্য সংকলনে অনুপ্রবেশ করেছে। কিন্তু বিষয়টি তা নয়। লৌকিক উৎস থেকেই প্রত্যেকে সংগ্রহ করেছেন। নিজের নিজের সংকলনের প্রয়োজনেই এগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

লৌকিক পশুকথা কিভাবে জাতকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখা দরকার। শুধুমাত্র কাহিনীটি ব্যবহার করলেই জাতককারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। তার মধ্যে একটি ধর্মীয় দর্শনকেও প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে। জাতককার সেটা কিভাবে ব্যবহার করেছেন? অতি পরিচিত 'বক ও কাঁকড়ার কথা' পশুকথাটি নেওয়া যেতে পারে। জাতকে এটি বক-জাতক নামে রয়েছে। একটু অন্যভাবে এই কাহিনী রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে।

শাস্তা পশুকথাটি বললেন। কিন্তু এই কাহিনী বিবৃতির আগে একটি

প্রস্তাবনা রয়েছে। অকারণে শাস্তা কোনো পশুকথা বলতে পারেন না, জাতকে যখন এটি সংকলিত হল তখন নিশ্চয়ই এর কোনো উদ্দেশ্য রয়েছে। কাহিনী বলবার আগে প্রস্তাবনায় রয়েছে ঃ

জেতবনের একজন ভিক্ষু খুব সুন্দর কৌপীন তৈরি করতে পারত। খুব ভালো কৌপীন তৈরি করতে পারত বলে অনেকেই তার কাছ থেকেই কৌপীন নিত। লোকে তাকে 'চীবর-বর্ধক' বলত। সে ছেঁড়া কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করে নিজের নৈপুণ্যে সুন্দর কৌপীন বানাত। যারা এটা তৈরি করতে জানত না, তারা নতুন কাপড় নিয়ে তার কাছে যেত। বলত, আমরা কৌপীন তৈরি করতে জানি না, আপনি আমাদের কৌপীন তৈরি করে দিন। সে বলত, ভাইসব, কৌপীন তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। এই একটা কৌপীন তৈরি করা আছে, যদি ইচ্ছে হয় তবে কাপড়গুলোর বদলে এই কৌপীন নিতে পার। এই কথা বলে সে কৌপীন বের করে দেখাত। ভিক্ষুরা বাইরের চটক দেখে ভুলে যেত, ভেতরে কি আছে তা জানত না।। তারা চীবর-বর্ধককে নিজেদের নতুন কাপড় দিয়ে তার বদলে সেই পুরনো কাপড়ে তৈরি কৌপীন নিয়ে যেত। কিন্তু কৌপীন ময়লা হয়ে গেলে ভিক্ষুরা তা গরম জলে কাচত, তখন আসল ব্যাপার বুঝত। এখানে জোড়া, ওখানে তালি দেওয়া, আরেক জায়গায় ফাটা। তখন তারা বুঝত, নতুন কাপড়ের বদলে তৈরি-করা কৌপীন নিয়ে তারা নিতান্ত প্রতারিত হয়েছে। তখন সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেল, চীবর-বর্ধক ছেঁড়া-ফাটা পুরনো কাপড় দিয়ে কৌপীন বানিয়ে ভিক্ষুদের প্রবঞ্চিত করছে।

ঐ সময়ে কাছের এক গ্রামে একজন সুনিপুণ চীবর-বর্ধক ভিক্ষু বাস করত এবং জেতবনবাসী ভিক্ষুর মতো সেও গ্রামবাসীদের প্রতারিত করত। জেতবনের ভিক্ষুদের মধ্যে এই ব্যক্তির কয়েকজন বন্ধু ছিল। তারা একদিন তাকে বলল, লোকে বলে জেতবনে একজন চীবর-বর্ধক আছে, সেও তোমার মতোই সবাইকে ঠকায়। তা শুনে সেই লোকটি ভাবল, আচ্ছা আমি সেই জেতবনের চীবর-বর্ধককেই ঠকাব। তখন সে ছেঁড়া-ফাটা কাপড় দিয়ে একটা সুন্দর কৌপীন তৈরি করল, সেটা খুব উজ্জ্বল রক্তবর্ণে রাঙিয়ে নিল। তারপরে সেই কৌপীন গায়ে পরে জেতবনে গেল। জেতবনের চীবর-বর্ধক তা দেখে লোভে পড়ে জিজ্ঞেস করল, এই কৌপীন কি তুমি তৈরি করেছ? সে বলল, হ্যাঁ, আমিই এটা তৈরি করেছি। তখন জেতবনের ভিক্ষু বলল, এই কৌপীনটা আমায় দাও না, আমি এর বদলে অন্য কিছু দিচ্ছি। তখন গ্রামের ভিক্ষু বলল, আমরা গ্রামের ভিক্ষু, গ্রামে ভিক্ষুদের ব্যবহারের জিনিস সহজে পাওয়া যায় না, তোমাকে এই কৌপীন দিলে আমি কি পরব? অন্য ভিক্ষু বলল, আমার কাছে নতুন কাপড় রয়েছে। তুমি সেই কাপড় নিয়ে গিয়ে কৌপীন বানিয়ে নিও। গ্রামের

ভিক্ষু বলল, আমি অনেক যত্নে এই কৌপীন বানিয়েছি, কিন্তু তুমি যখন এটা চাইছ, তখন আমি আর কি বলতে পারি ? তুমি এই কৌপীনটা নাও। এইভাবে গ্রামের ভিক্ষু জেতবনের ভিক্ষুকে ঠকিয়ে নতুন কাপড়ের বদলে পুরনো কৌপীন দিয়ে সেখান থেকে চলে এল।

জেতবনের ভিক্ষু কয়েকদিন ব্যবহার করে একদিন সেই কৌপীন জলে ধুতে গেল আর কৌপীন পুরনো কাপড়ে তৈরি বুঝতে পেরে অপ্রতিভ ও লজ্জিত হল। গ্রামের ভিক্ষু জেতবনের ভিক্ষুকে ঠকিয়েছে এই কথা সংঘের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্মসভায় এই কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বললেন, জেতবনবাসী ভিক্ষু পূর্বজন্মেও এইভাবে প্রতারণা করত এবং এবার যেমন নিজে প্রতারিত হয়েছে, পূর্বজন্মেও সেইভাবে প্রতারিত হয়েছিল। তখন তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করলেন।

মূল লোককথাটির সঙ্গে অত্যন্ত সুকৌশলে এই প্রস্তাবনাকে যুক্ত করে দিয়েছেন জাতককার। এইখানেই সংকলকের কৃতিত্ব। এরপর শুরু হল মূল লোককথা।

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব কোনো এক বনের মাঝখানে পদ্মসরোবরের কাছের এক গাছে বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। তখন একটা মাঝারি মাপের পুকুরে প্রতি বছর গরমকালে জল খুব কমে যেত। এই পুকুরে মাছ ছিল। একদিন এক বক মাছদের দেখে মনে করল, এদের কোনোভাবে ঠকিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একদিন খুব চিন্তা করছে এইরকম ভাব করে পুকুরের ধারে বসে রইল।

মাছেরা বককে দেখতে পেয়ে বলল, আর্য, আপনি এত কি ভাবছেন ?

বক বলল, আমি তোমাদের কথাই চিন্তা করছি।

আমাদের জন্য কিসের চিন্তা ?

এই পুকুরের জল কমে আসছে। খাবার-দাবারের অভাব পড়ছে, খুব গরমও পড়েছে,—তাই বসে ভাবছি, মাছ বেচারীরা এখন কি করবে।

বলুন তো আর্য, এখন তবে আমরা কি করব ?

তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহলে এক কাজ করা যেতে পারে। কিছুদূরে একটা সরোবর আছে, তাতে পাঁচ রঙের পদ্ম ফোটে। আমি তোমাদের এক একজনকে ঠোঁটে করে তার জলে ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।

আর্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কোনো বক মাছদের কথা ভাবেনি। বলুন দেখি, আপনি আমাদের এক একজনকে খাবার ইচ্ছে ফেঁদেছেন কিনা ?

না, না, তোমরা যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহলে তোমাদের কখনও

খাব না। আমি যে সরোবরের কথা বললাম, সেই সরোবর আছে কিনা তা যদি তোমাদের দেখার ইচ্ছে হয়, আমাকে যদি সন্দেহ হয়, তবে তোমাদের মধ্যে একজনকে আমার সঙ্গে দাও, সে নিজের চোখেই দেখে আসুক।

মাছেরা বকের কথামতো এক বিরাট কানা মাছকে এনে বলল, এই মাছকে নিয়ে যান। তারা ভাবল, বক জলে কিংবা ডাঙায় কোথাও এই কানা মাছের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

বক কানা মাছকে নিয়ে গিয়ে সেই সরোবরের জলে ছেড়ে দিল। তারপরে তাকে আবার সেই আগের পুকুরে ফিরিয়ে আনল। কানা মাছ সেই সরোবরের গভীর জল ও শোভার কথা সবাইকে বলল। তা শুনে সব মাছই সেখানে যাবার জন্য আগ্রহ দেখাল ও বককে বলল, আর্য, আপনি খুব সুন্দর উপায় বের করেছেন। আমাদের সেই বিশাল সরোবরে নিয়ে চলুন।

তখন বক প্রথমেই সেই কানা মাছকে নিয়ে চলল। তাকে সরোবরের তীরে নামিয়ে প্রথমে জল দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে বরুণ গাছের ডালে বসল আর ঠোঁট দিয়ে মেরে ফেলল। তার মাংস খেয়ে কাঁটাগুলো গাছের নিচে ফেলে দিল।

তারপর আবার সেই পুকুরে এসে বলল, তাকে জলে ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখন তোমরা আর কে কে যাবে চল।

এইভাবে বক এক একটি করে মাছ নিয়ে যেতে লাগল। শেষে পুকুরের সব মাছ প্রায় শেষ হয়ে এল। শেষে থাকার মধ্যে থাকল একটা কাঁকড়া। বক তাকেও খেয়ে ফেলতে চাইল। বলল, আমি পুকুরের সব মাছ নিয়ে গিয়ে সরোবরে রেখে এলাম। চল, এবার তোমাকেও সেখানে নিয়ে যাই।

কাঁকড়া জিজ্ঞেস করল, আমাকে কিভাবে নিয়ে যাবে?

কেন, ঠোঁটের ফাঁকে ধরে নিয়ে যাব।

না, তা হতে পারে না। তুমি হয়তো আমায় পথে ফেলে দেবে, তাহলে আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।

ভয় নেই, আমি তোমাকে বেশ শক্ত করে ধরব।

কাঁকড়া ভাবল, চালাক বক হয়তো মাছদের জলে ছেড়ে দেয়নি। দেখা যাক, আমাকে নিয়ে কি করে! যদি আমাকে সত্যি সত্যিই জলে ছেড়ে দেয়, তাহলে খুবই ভালো। আর যদি তা না করে, নাই করুক, আমি ওর গলা কেটে ফেলব।

এই কথা ভেবে সে বককে বলল, দেখ মামা, তুমি আমাকে বেশ শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আমরা হলাম কাঁকড়া, আমরা খুব শক্ত করে ধরতে পারি। আমায় যদি দাড়া দিয়ে তোমার গলা ধরতে দাও, তাহলে আমি নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যেতে পারি।

কাঁকড়ার ফন্দি বুঝতে না পেরে বক রাজি হয়ে গেল। তখন কামার যেমন

সাঁড়াশি দিয়ে ধরে, কাঁকড়াও নিজের দাড়া দিয়ে বকের গলা শক্ত করে ধরে বলল, এখন আমরা রওনা দিতে পারি।

বক প্রথমে তাকে সরোবরের জল দেখাল, তারপর তাকে নিয়ে সেই গাছের দিকে উড়ে চলল।

কাঁকড়া বলল, একি মামা, সরোবর রইল ঐ দিকে, আর তুমি আমায় নিয়ে চললে উল্টো দিকে?

বক বলল, বেটা কি সাধের মামা পেয়েছে রে! বেটা যেন আমার প্রাণের ভাগ্নে! আমি কি তোর বাপের কালের ক্রীতদাস যে তোকে গলায় ঝুলিয়ে বেড়াব? বরুণ গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখতে পাচ্ছিস না? মাছগুলোকে যেমন খেয়েছি, তোকেও খাব তেমনি করে।

এই কথা শুনে কাঁকড়া বলল, মাছগুলো বোকা, তাই তোমার পেটে গিয়েছে। আমায় কিন্তু কিছুতেই খেতে পারবে না। আমাকে খাওয়া তো দূরের কথা আজ তুমি নিজেই মরবে। বোকা কোথাকার, আমি যে তোমায় ঠকিয়েছি, তা তো তুমি বুঝতে পারনি। যদি মরতে হয় দুজনেই মরব। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দেব।

এই কথা বলে সে সাঁড়াশির মতো দাড়া দিয়ে বকের গলা চেপে ধরল। বক ব্যথায় কাতরে উঠল, তার চোখদুটি থেকে জল গড়াতে লাগল। সে প্রাণের ভয়ে বলল, প্রভু, আমি আপনাকে খাব না, দয়া করে প্রাণে মারবেন না।

কাঁকড়া বলল, বেশ কথা, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে সরোবরের তীরে চল। আমাকে জলে ছেড়ে দাও।

তখন বক সরোবরের দিকে গেল আর কাঁকড়াকে জলের ধারে কাদায় ছেড়ে দিল। কিন্তু কাঁকড়া জলে যাবার আগে, লোক যেমন কাটারি দিয়ে পদ্মের নল কাটে, সেইভাবে খুব সহজেই দাড়া দিয়ে বকের গলা কেটে ফেলল।

পশুকথাটি এখানেই শেষ। কিন্তু সংকলকের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র গল্প বলা নয়। তাই তিনি আরও কিছুটা যোগ করলেন। এই বাড়তি অংশ না দিলে বোধিসত্ত্বের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। জাতককার লিখছেন, বরুণ গাছের অধিদেবতা এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সাধু! সাধু! বলে উঠলেন এবং মধুরস্বরে নিচের গাথাটি বললেন,

প্রবঞ্চনা পরায়ণ সতত যে জন,
অবিচ্ছিন্ন সুখ তার না হয় কখন।
তার সাক্ষী দেখ, এই বক প্রবঞ্চক,
কর্কট দংশনে মরি লভিল নরক।

বক-জাতকের শেষে রয়েছে সমবধান: তখন জেতবনের চীবর-বর্ধক ছিল সেই বক, গ্রাম্যচীবর-বর্ধক ছিল সেই কাঁকড়া এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

লৌকিক ঐতিহ্যের পশুকথা ও এই বক-জাতকের রূপ-রীতি নিয়ে বিশ্লেষণ

করলে কয়েকটি জিনিস স্পষ্ট হবে। বক ও কাঁকড়ার মূল কাহিনীটি যে লৌকিক পশুকথা তা এর মোটিফ ও মেজাজ থেকেই উপলব্ধি করা যাবে। কিন্তু পশুকথায় যে সারল্য ও গতি থাকে এখানে তা ব্যাহত হয়েছে। সংকলক তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই পশুকথাটিকে বেছেছেন। সাধারণভাবে পশুকথাটির মর্মার্থ হল, যেমন কর্ম তেমনি ফল, কিংবা পাপের পরিণতি। কিন্তু এখানে প্রবঞ্চনার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। ভিক্ষুদের উপদেশ দিতে হবে,—কাউকে প্রবঞ্চনা করবে না, এ কাজ অধর্মীয়, উপদেশকে মনে গেঁথে রাখবার জন্যই উদাহরণের অবতারণা। তাই চীবর-বর্ধকের প্রবঞ্চনার নীতিহীন কাজটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বক-জাতক বলা হল। স্বাভাবিকভাবেই বকের প্রবঞ্চনার বিষয়টি প্রাধান্য পাবে। লোকসমাজ যে নীতিকথা এই কাহিনীর মধ্যে বলতে চেয়েছেন, জাতককার অন্য নীতিকথা আবিষ্কার করেছেন।

বোধিসত্ত্ব, আর্য, পৃথিবীর প্রথম কল্প, সাধু সাধু প্রভৃতি শব্দ লোকসমাজ কখনও ব্যবহার করেন না। কিন্তু লোকসমাজের গল্পটি জাতককারের হাতে পরিশীলিত হল। এর ফলে কাহিনীর গতিময়তা ও স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হলেও জাতকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ধর্মগুরু বোধিসত্ত্ব যখন এই ঘটনার সাক্ষী, তখন এটি বিশ্বাসযোগ্য এবং পালনীয়। তাই বোধিসত্ত্বের কোনো ভূমিকা না থাকলেও তাকে বৃক্ষদেবতারূপে দ্রষ্টার ভূমিকায় রাখা হল। গাথা অংশটিতেও প্রবঞ্চনার বিষয়টি মুখ্য হয়েছে। আবার পঞ্চতন্ত্রে যে শ্লোক বলা হয় তার উদ্দেশ্য অন্যরকম। এইভাবেই উচ্চতর সমাজের সংকলকেরা লৌকিক ঐতিহ্যের কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়ে লোককথা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকেন।

সংকলক কিভাবে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য দুটি পশুকথাকে একসঙ্গে মিলিয়ে দেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানরেন্দ্র-জাতক। এই ধরনের অনেক লোককথা আমরা ভারতীয় উপ-মহাদেশে দেখতে পাই। এই কাহিনীর প্রথমাংশে রয়েছে একটি পশুকথা, তার সঙ্গে শেষাংশে আর একটি পশুকথা যুক্ত হয়ে গিয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে আমরা এই আলাদা দুটি পশুকথাই পাচ্ছি, অবশ্য দু-একটি পাত্রপাত্রী অন্য পশু। যেহেতু বানরের বিচক্ষণতা দেখানোই এই গল্পের উদ্দেশ্য, তাই বোধিসত্ত্ব সেই জন্মে বানর হয়ে জন্মেছিলেন। দুটি আলাদা পশুকথা হলেও সংকলক অপূর্ব নৈপুণ্যে তাদের এক মালায় গেঁথেছেন। এই কাহিনীতে কোন্ কোন্ অংশ সংকলকের নিজের কল্পনার সৃষ্টি তা খুব সহজেই বোঝা যায়।

বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণবয়সে তিনি অশ্বশাবক প্রমাণ ও অসাধারণ বলবান হয়েছিলেন। তিনি একচর হয়ে কোনো নদীর তীরে বাস করতেন। ঐ নদীর মধ্যে এক দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপে ফলমূলের অনেক গাছ। বোধিসত্ত্ব যে পারে থাকতেন সেখান থেকে দ্বীপ পর্যন্ত ঠিক অর্ধেক পথে নদীর মধ্যে একটা পাহাড় ছিল। হাতির মতো

বলবান বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদীর ধার থেকে একলাফে সেই পাহাড়ের ওপরে যেতেন, আবার সেখান থেকে আর একলাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেখানে তিনি নানা ধরনের ফল খেয়ে সন্ধ্যার সময় ঠিক ঐভাবে নদী পার হয়ে নিজের বাসায় ফিরতেন।

ঐ নদীতে এক কুমির তার বৌকে নিয়ে বাস করত। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন এপার-ওপার হতে দেখে বৌয়ের সাধ হল সে বানরের কলিজা খাবে। বৌ তখন ছিল গর্ভবতী। সে কুমিরকে বলল, আর্যপুত্র, আমার সাধের জন্য এই বানরের কলিজা এনে দিন।

কুমির বলল, আচ্ছা, তোমার সাধ মেটাব। এই বানর আজ সন্ধ্যায় যখন ফিরবে তখনই একে ধরব। এই কথা ভেবে সে পাথরের ওপরে গেল।

বোধিসত্ত্ব নাকি প্রতিদিন নদীর জল কতটা উঠত আর পাহাড়টা কতটা জেগে থাকত, তা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতেন। আজ সমস্ত দিন দ্বীপে ফলমূল খেয়ে সন্ধ্যার সময় পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। নদীর জল বাড়েও নি, কমেও নি, তবু পাহাড়ের ওপরটা উঁচু মনে হচ্ছে। তার সন্দেহ হল, হয়তো তাকে ধরবার জন্য কুমির ওখানে লুকিয়ে রয়েছে।

তখন ব্যাপারটা কি জানবার জন্য পাথরের সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভাব করে 'ওহে পাহাড়, ওহে পাহাড়' বলে চিৎকার করে ডাকলেন।

পাহাড়ের কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি আবার বললেন, কিহে ভাই পাহাড়, আজ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কুমির ভাবল, তাইতো, এই পাহাড় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ তবে আমিই পাহাড়ের পরিবর্তে সাড়া দি। সে বলল, কে? বানরেন্দ্র নাকি?

বোধিসত্ত্ব বললেন, তুমি কে গো?

কুমির বলল, আমি কুমির।

ওখানে বসে আছ কেন?

তোমাকে ধরব আর তোমার কলিজা খাব।

বোধিসত্ত্ব দেখলেন দ্বীপ থেকে ফেরার অন্য কোনো পথ নেই। তাই কুমিরকে ঠকাতে হবে। তিনি বললেন, কুমির ভাই, আমি তোমায় ধরা দিচ্ছি। তুমি হাঁ কর, আমি যেমন লাফিয়ে পড়ব, অমনি তুমি আমায় ধরে ফেলবে।

কুমিররা যখন মুখ হাঁ করে তখন তাদের চোখদুটো বন্ধ হয়ে যায়। বোধিসত্ত্ব যে প্রবঞ্চনা করছেন, কুমিরের মনে কিন্তু সে সন্দেহ হয়নি। কাজেই সে তার মুখ হাঁ করল, তার চোখদুটি বন্ধ হয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব তা দেখে একলাফে তার মাথার ওপরে গেলেন আর একলাফে বিদ্যুতের বেগে নদীতীরে পৌঁছে গেলেন। কুমির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে বলল, বানরেন্দ্র, চারটি গুণ থাকলে সব শত্রুকে দমন করতে পারা যায়। তোমার দেখছি ঐ চারটি গুণই রয়েছে।

সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচারক্ষমতা—এই চারিগুণে সবে,
বিষম সংকটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।

লৌকিক পশুকথাটির রূপান্তর ঘটে গেল। লোকসমাজের গল্পে যে বোকা সে শেষ পর্যন্ত চরম বোকামির পরিচয় দেয়। কুমিরও তাই দিয়েছে। কিন্তু হঠাৎ তার মুখ দিয়ে যে জ্ঞানের কথা প্রকাশ করানো হল তা কোনোভাবেই পশুকথার মোটিফের সঙ্গে মেলে না। এটা সম্পূর্ণ আরোপিত বলেই কাহিনীর মেজাজ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পৃথিবীর কোনো লোককথায় এই ধরনের পরিণতি ঘটতে দেখা যায় না। সংকলক লৌকিক ঐতিহ্যকে গ্রহণ করলেন কিন্তু নিজের ভাবনাকে রূপ দিতে গিয়ে কাহিনীতে যে হাস্যকর রূপান্তর ঘটালেন তা অনুভব করেন নি। যে কুমির একটু আগে এমন ধরনের বোকামির পরিচয় দিল, পাহাড়ের পরিবর্তে কথা বলল, বানর নিজেই খাদ্য হবে একথা বিশ্বাস করল,—সে কখনও চারটি গুণের কথা বলার মতো জ্ঞানের উপদেশ দিতে পারে না।

জাতককার বলতে চেয়েছেন, দেবদত্ত শাস্তাকে বধ করতে চেয়েছিল। শুধু এ জন্মে নয়, অতীত জন্মেও দেবদত্ত বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সফল হতে পারেনি। সেই অতীত জন্মে দেবদত্ত ছিল এই কুমির। ধর্মীয় উপদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করতে নেই, একথাই ভক্তজনকে শেখানো হয়। ভক্ত মানুষের মেনে নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথও খোলা নেই। কিন্তু পশুকথাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা বোধিসত্ত্বের বিচার ক্ষমতার গুণটি দেখতে পাই। ধৃতির পরিচয়ও না হয় অল্প পেলাম। কিন্তু সত্য ও ত্যাগের গুণটি কিভাবে বানরের কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হল? বানর তো ত্যাগ করেই নি, বরং মিথ্যাচরণ করেছে। জীবনের তাগিদে তাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়েছে, পাহাড়কে সম্বোধন জানাতে হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ব্যবহারনীতি। লোককথায় এই স্বাভাবিকতাই ছিল। কুমিরের বোকামি দেখানো ও কৌশলে বানরের বেঁচে যাওয়া,—এই ছিল গল্পের উদ্দেশ্য। একটি বিশেষ ধর্মীয় দর্শন প্রচার করতে গিয়ে পশুকথাটির সজীবতা ও প্রাণময়তা খর্বিত হল। অথচ পঞ্চতন্ত্রে এই পশুকথাটি অনন্য সজীব। কেননা, সেখানে লোককথার মর্মকথাই বলতে চাওয়া হয়েছে।

কুমির ও বানরের এই কাহিনীর অন্য একটি রূপ জাতকে রয়েছে। সেই পশুকথাটি অনেকাংশে লৌকিক ঐতিহ্যের কাছাকাছি। লোকসমাজের পশুকথাটি প্রায় সরাসরি জাতকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই একই পশুকথা পঞ্চতন্ত্র, চরিয় পিটক, মহাবস্তু, ঈশপের নীতিকথা ও প্লেটোর বইতে রয়েছে। সকলেই লোকঐতিহ্য থেকে কাহিনীটি সংগ্রহ করেছেন, তবে পাত্রপাত্রী কিছুটা বদলেছে। জাতকের কাহিনীর নাম শিশুমার-জাতক। শিশুমার সাধারণত শুশুক, কিন্তু এখানে মনে হয় কুমির অর্থেই ব্যবহৃত

হয়েছে। কেননা শেষাংশে কুমিরের উল্লেখ রয়েছে। দেবদত্ত যে শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করেছিল, এখানে সেই একই প্রসঙ্গে কাহিনীটি বলা হয়েছে। কাহিনীর শেষে জ্ঞানের কথা গাথায় প্রকাশ করেছে কুমির নয়, স্বয়ং বানর-রূপী বোধিসত্ত্ব। তাই এই পশুকথাটি অনেক বেশি স্বাভাবিক ও লৌকিক।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বিশাল দেহে ছিল হাতির বল, তিনি ছিলেন যেমন পৌরুষবান তেমনি সৌভাগ্যশালী। তিনি গঙ্গার নিবর্তন-স্থানে এক বনের মধ্যে বাস করতেন। ঐ সময়ে গঙ্গায় এক শুংশুক ছিল। তার বৌ বোধিসত্ত্বের দেহ দেখে তার হৃদয়ের মাংস খেতে চাইল।

একদিন শুংশুককে বলল, আমার ইচ্ছে হচ্ছে, ঐ বানরের হৃদয়ের মাংস খাই।

শুংশুক বলল, বৌ, আমি থাকি জলে আর বানর থাকে ডাঙায়, আমি তাকে কেমন করে ধরব বলতো ?

বৌ বলল, যেমন করে পার ওকে ধর। হৃদয়ের মাংস না পেলে আমি মরেই যাব।

শুংশুক বলল, ঠিক আছে, কোনো চিন্তা নেই। একটা উপায়ে আমি তোমাকে ওর হৃদয়ের মাংস খাওয়াতে পারব।

বৌকে একথা বলে শুংশুক গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের কাছে গেল। তিনি তখন গঙ্গাজল খাওয়ার জন্য সেখানে এসেছিলেন।

শুংশুক বলল, বানররাজ, চিরকাল এই এক জায়গায় থেকে বিস্বাদ ফল খেয়ে খেয়ে শুধুশুধু কষ্ট পান কেন ? গঙ্গার ঐ পারে আম, জাম, বন-কাঁঠাল কত কি মধুর ফল পেকে রয়েছে। সেখানে গিয়ে ঐ সমস্ত ফল খেতে পেলে আপনারও ভালো লাগবে।

বানর বলল, কুমিররাজ, গঙ্গা কত চওড়া, এর জলও অগাধ। আমি ঐ গঙ্গা পার হব কেমন করে ?

যদি খেতে ইচ্ছে করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করে বললেন, বেশ, চলুন তবে, যাওয়া যাক।

কুমির বলল, আসুন, আমার পিঠে উঠে বসুন।

তখন বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠে চেপে বসলেন। কুমির কিছুদূর গিয়ে জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বললেন, সৌম্য, আমাকে জলে ডোবাচ্ছ কেন ? এ তোমার কেমন কাজ ?

কুমির বলল, তুমি ভেবেছ আমি তোমাকে ভালোবেসে তোমার ভালো করবার জন্য তোমায় পিঠে নিয়ে চলেছি। তা মোটেই নয়। আমার বৌয়ের সাধ হয়েছে, সে তোমার হৃদয়ের মাংস খাবে। তাকে সেই মাংস খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছি।

সৌম্য, কথাটা খুলে বলে ভালোই করেছ। আমাদের বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকত, তাহলে গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করবার সময় তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যেত।

তবে তোমরা হৃদয়টা রাখ কোথায় ?

অল্প দূরেই পাকা ডুমুর ফলে ভরা একটা ডুমুর গাছ ছিল। বোধিসত্ত্ব সেই দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, ঐ দেখ, আমাদের হৃদয়গুলো ঐ ডুমুর গাছে ঝুলছে।

কুমির বলল, দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তাহলে আমি তোমায় মারব না।

তবে আমায় ওখানে নিয়ে চল। গাছে আমার যে হৃদয়টা ঝুলছে, তা আমি তোমায় দিয়ে দেব।

ভখন কুমির বোধিসত্ত্বকে নিয়ে সেই গাছের কাছে গেল। বোধিসত্ত্ব কুমিরের পিঠ থেকে এক লাফে গাছে চড়ে বসলেন। গাছের ডালে বসে তিনি বললেন, বোকা শুশুক, তুমি বিশ্বাস করলে যে প্রাণীদের হৃদয় গাছের ডগায় ঝুলে থাকে! তুমি নিতান্তই বোকা। আমি যে তোমায় ঠকিয়েছি, এখন তা বুঝতে পারলে ? তোমার মধুর ফলগুলো তুমিই খাও। তোমার দেহটি বিশাল, কিন্তু একেবারেই বুদ্ধি নেই।

এই ভাব প্রকাশ করে বোধিসত্ত্ব নিচের গাথাটি বললেন ঃ

সাগরের পারে আছে মধুর ফলের বন,
আম-জাম-পনসাদি—নাহি তাহে প্রয়োজন।
উডুম্বর বৃক্ষ এই—এই ভালো মোর কাছে,
যার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
বিশাল দেহটা তব, বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি,
ঠকিয়াছ শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।

হাজার মুদ্রা নষ্ট হলে লোক যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়, শুশুক তেমনি হল। মনে ব্যথা পেয়ে সে নিজের বাসায় ফিরে গেল।

জাতকমালায় 'কচ্ছপ-জাতক' নামে একটি পশুকথা রয়েছে। ভারত, গ্রীস ও আফ্রিকায় এই পশুকথাটি খুবই জনপ্রিয়। জাতককার কিভাবে লৌকিক পশুকথাকে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে ও নীতিশিক্ষার জন্য ব্যবহার করেছেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল এই জাতকটি। পশুকথাটি যেখানে শেষ হয়েছে, জাতককার সেখান থেকে আর একটি কাহিনী গড়ে তুলেছেন যার উদ্দেশ্য হল পশুকথাটির মর্মার্থকে বিশ্লেষণ করা। কাহিনীর শেষাংশে বোধিসত্ত্বের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হল। তবু লোকঐতিহ্যের অপরূপ কাহিনীটি প্রায় অবিকৃতই রয়ে গিয়েছে। অকারণ বাচালতায় যে জীবন-সংশয় ঘটে যেতে পারে লৌকিক পশুকথাটির এই মর্মার্থ জাতকেও

রক্ষিত হয়েছে। জাতকে সংকলিত পশুকথাটির প্রথম ও শেষাংশ জাতককারের সংযোজন।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিনি রাজার ধর্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ রাজা খুব বাচাল ছিলেন। তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলে অন্য কেউ কিছু বলবার অবসর পেত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করবার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোনো এক সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করত। দুটো হাঁস খাবার খুঁজতে সেই সরোবরে যেত। তাদের সঙ্গে কচ্ছপের আলাপ হয়, তারপরে তাদের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

হাঁসদুটি একদিন কচ্ছপকে বলল, কচ্ছপ, আমরা থাকি হিমবন্ত প্রদেশের চিত্রকুট পাহাড়ের কাঞ্চনগুহায়। সে জায়গা বড় সুন্দর। তুমি কি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে?

কচ্ছপ বলল, আমি সেখানে কেমন করে যাব?

তুমি যদি মুখ বন্ধ করে থাকতে পার, কাকেও যদি কিছু না বলো, তাহলে আমরাই তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব।

মুখ বন্ধ করে থাকতে পারব না কেন? তোমরা আমাকে নিয়ে চল।

হাঁসদুটি বলল, বেশ তাই হবে।

তখন হাঁসেরা একটা লাঠি এনে কচ্ছপকে তার মাঝখানে শক্ত করে কামড়ে ধরে থাকতে বলল। লাঠির দুপাশে হাঁসদুটি তাদের ঠোঁট দিয়ে ধরল আর আকাশে উড়ল। হাঁসেরা কচ্ছপকে লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে গ্রামের ছেলেরা বলতে লাগল, দেখ, দেখ, দুটো হাঁস লাঠি দিয়ে একটা কচ্ছপকে নিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের ছেলেদের কথা শুনে কচ্ছপের বলতে ইচ্ছে করল, দুষ্টু ছেলেরা কোথাকার! আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে তোদের কি রে?

তার মনে যখন এই ভাব এল, তখন প্রচণ্ড বেগে হাঁসেরা আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। উড়তে উড়তে তারা বারাণসীর রাজার বাড়ির ওপর এসে পেঁছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলার চেষ্টা করল, অমনি লাঠি থেকে মুখ ফসকে গেল আর রাজপ্রাসাদের উঠোনের ওপর আছড়ে পড়ল। কচ্ছপ সেই প্রচণ্ড আঘাতে মরে গেল।

পশুকথাটি এখানেই শেষ। জাতকের এই কাহিনীতে হিমবন্ত প্রদেশ, বারাণসী রাজ, চিত্রকুট পর্বত প্রভৃতির উল্লেখ থাকলেও মূল কাহিনীটি অবিকৃতই রয়েছে। এর পর বারাণসীরাজকে শিক্ষা দেবার জন্যই জাতককার নতুন সংযোজন ঘটালেন।

রাজভবনে মহা কোলাহল হল। সকলেই চিৎকার করতে লাগল, উঠোনে একটা কচ্ছপ পড়ে দু-টুক্‌রো হয়ে গিয়েছে।

এই কথা শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে করে নিয়ে উঠোনে গিয়ে কচ্ছপটিকে দেখলেন। বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতবর, এই কচ্ছপটা পড়ে গেল কেমন করে?

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, রাজাকে উপদেশ দেবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করে রয়েছি। এখন দেখছি, উপযুক্ত সুযোগ এসেছে। এই কচ্ছপের সঙ্গে হাঁসদের বন্ধুত্ব হয়েছিল সন্দেহ নেই। তারা একে হিমবন্ত প্রদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য লাঠি কামড়ে ধরতে বলেছিল আর সম্ভবত সেই অবস্থায় একে নিয়ে আকাশে উড়েছিল। তারপর কিছু বলবার ইচ্ছায় কচ্ছপ মুখ খুলেছিল, কথা বলতে গিয়ে লাঠি থেকে মুখ ফস্‌কে আকাশ থেকে পড়ে যায়। তার কচ্ছপ-লীলা এইভাবে সাঙ্গ হয়।

এই কথা চিন্তা করে তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, যারা অতি মুখর, যারা জিবকে সংযত করতে জানে না, তাদের এই রকম দুর্দশাই ঘটে থাকে।

তখন বোধিসত্ত্ব এই গাথা বললেন ঃ

নির্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ,
কিন্তু নিজ বাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হতে শিখুক মানব।
সময় না বুঝে যেই কথা বলে, মূর্খ সেই,
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্বজন,
বাচালতা-দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন।

রাজা বুঝলেন বোধিসত্ত্ব তাকে লক্ষ্য করেই একথা বলছেন। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করে একথা বলছেন?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, মহারাজ, আপনিই হোন বা অন্য কেউ হোন, অপরিমিতভাষীদের এই রকমের দুর্গতিই ঘটে থাকে।

বোধিসত্ত্ব এইভাবে সমস্ত কথা খুলে বললে রাজা তখন থেকে জিবকে সংযত করে মিতভাষী হলেন।

ভারতীয় উপ-মহাদেশে এই পশুকথাটির যতগুলো রূপ সংগৃহীত হয়েছে তাতে দেখা যায়, কচ্ছপ আকাশ থেকে নিচে পড়ে মারা যায়। কিন্তু আফ্রিকার জাম্‌বিয়া দেশের থোংগা, নাইজেরিয়ার ইকোই, অ্যাংগোলার আম্‌বুনডু প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠীর পশুকথায় অন্য তাৎপর্য ফুটে উঠেছে। 'কচ্ছপের

পিঠে ফাটা ফাটা দাগ কেন'—এই প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজেছে এই পশুকথার মধ্যে দিয়ে। প্রচণ্ড বেগে কচ্ছপ আকাশ থেকে পড়ল, পিঠটা গিয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে, পিঠের খোল গেল চৌচির হয়ে ফেটে। সেদিন থেকেই কচ্ছপের পিঠে ঐরকম ফাটা ফাটা দাগ। এদের গল্পেও কচ্ছপ মারা গিয়েছে। বাচালতার জন্য তার মৃত্যু হলেও একটি 'কেন'র জবাব দিতেই আফ্রিকার আদিবাসীরা এই পশুকথা সৃষ্টি করেছেন।

জাতকমালার মধ্যে আমরা লৌকিক পশুকথার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই এইসব জাতকে: শৃগাল-জাতক শূকর-জাতক দর্দর-জাতক কচ্ছপ-জাতক (অন্য একটি কাহিনী) সিংহ ক্রোষ্টুক-জাতক সিংহচর্ম-জাতক কুমির-জাতক শুক-জাতক উলূক-জাতক ব্যাঘ্র-জাতক জম্বু-খাদক-জাতক শকুন-জাতক তিতির-জাতক কপোত-জাতক মৎস্য-জাতক মিতচিন্তি-জাতক কাক-জাতক চক্রবাক-জাতক অশ্ত-জাতক উড়ুম্বর-জাতক নৃত্য-জাতক সম্মোদমান-জাতক বিড়াল-জাতক অগ্নিক-জাতক সুবর্ণহংস-জাতক মূণিক-জাতক জবশকুন-জাতক শশ-জাতক কুটীদূষক-জাতক কোকালিক-জাতক জম্বুক-জাতক মৃগালোপ-জাতক কুরুট-জাতক সুবর্ণকর্কট-জাতক মহাকপি-জাতক দ্বিপি-জাতক কালবাহু-জাতক দর্ভপুষ্প-জাতক মহাশুক জাতক কৌশিক-জাতক ইত্যাদি।

লৌকিক পশুকথা কত ব্যাপকভাবে জাতকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে তা এই তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। জাতককারের সংযোজন বাদ দিয়ে শুধুমাত্র লোকসমাজের সৃষ্ট পশুকথা বিবৃত করছি। সবগুলি পশুকথাই অতিপরিচিত।

জম্বুখাদক-জাতক। এক জামগাছে বসে একটা কাক জাম খাচ্ছিল। এমন সময় সেই গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছিল এক শেয়াল। মিষ্টি জাম খেতে তারও খুব ইচ্ছে হল। ওপরে তাকিয়ে সে কাককে দেখতে পেল। শেয়াল ভাবল, আমি যদি এই কাকের প্রশংসা করি তাহলে পাকা জাম খেতে পারব।

শেয়াল বলল, কে তুমি গাছের ডালে বসে জাম খাচ্ছ? তোমাকে দেখছি ময়ূরের মতো সুন্দর দেখতে। যেমন সুন্দর তোমার দেহ, তেমনি মিষ্টি তোমার ডাক। কত পাখি তো জীবনে দেখলাম, কিন্তু তোমার রূপের কাছে সবাই হেরে যাবে।

এই প্রশংসা শুনে কাক বলল, ভালো বংশে যে জন্মেছে, সে-ই কেবল ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে। তুমি সুন্দর, বাঘের মতো রূপ তোমার। এস বন্ধু, পেট ভরে জাম খাও। আমি ওপর থেকে পাকা জাম ফেলছি, তুমি নিচে বসে প্রাণভরে খাও।

এই কথা বলে কাক ডাল ঝাঁকাতে লাগল, পাকা সুমিষ্ট জাম নিচে পড়তে লাগল। দুজনেই দুজনের মিথ্যে প্রশংসা করছে আর জাম খাচ্ছে।

ঈশপের নীতিকথায় এই একই পশুকথা পাওয়া যায়। জাতকে এই একই ধরনের আর একটি পশুকথা রয়েছে।

অন্ত-জাতক। কোনো এক সময়ে এক গ্রামে এক বুড়ো গোরু ছিল। একদিন সে মরে গেল। গাঁয়ের লোকেরা গোরুটাকে টেনে এনে ভেরেণ্ডাবনে ফেলে দিয়ে চলে গেল। এমন সময় সেখানে এল এক শেয়াল। মহা আনন্দে সে গোরুর মাংস খেতে লাগল। সেই সময় একটা কাক উড়ে এসে ভেরেণ্ডা গাছে বসল। সে ভাবল, আমি যদি মিথ্যে মিথ্যে এই শেয়ালের প্রশংসা করি, তবে নিশ্চয়ই গোরুর মাংস খেতে পাব।

এই কথা ভেবে কাক বলল, তোমার দেখছি সিংহেব মতো বিক্রম, তুমি নিশ্চয়ই পশুরাজ। তোমার প্রসাদ পাবার জন্য আমি এসেছি, আমি তোমার দাস। সামান্য মাংস দিয়ে তুমি কি আমার আশা পূর্ণ করবে?

তখন শেয়াল প্রশংসায় গলে গিয়ে বলল, ভালো বংশে যে জন্মেছে, সে-ই কেবল ভালো বংশের লোকদের প্রশংসা করতে জানে। ময়ূরের মতো গলা তোমার, কাক, যত ইচ্ছে তুমি মাংস খাও।

কাক শেয়ালের সঙ্গে মনের সুখে সেই মরা গোরুর মাংস খেতে লাগল।

উড়ুম্বর-জাতক। এক পাহাড়ী গুহায় থাকত এক লালমুখো বানর। যতই বৃষ্টি হোক না কেন সেই গুহায় কিন্তু বৃষ্টি ঢুকত না। একবার সাত সাত দিন ধরে খালি বৃষ্টি হতে লাগল। সেইসব বৃষ্টি-ভেজা দিনে বানর গুহাতেই নিশ্চিন্তে বসে রইল। খুব খিদে পেয়েছে, কিন্তু বাইরে যেতে মন চাইছে না, গাছেও ফল নেই।

এমন সময় জলে চুপ্‌চুপে ভিজে সেখানে এল এক কালোমুখো বানর। লালমুখোকে গহার মধ্যে সুখে থাকতে দেখে কালোমুখো ভাবল, কোনো উপায়ে একে যদি গুহা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি, তবে বৃষ্টিতে আর কষ্ট পেতে হবে না।

এই ভেবে কালোমুখো তার পেটটা খুব ফুলিয়ে নিল। তাকে দেখে মনে হল, সে বুঝি অনেককিছু খেয়েছে, তাই পেটটা এত ফুলে রয়েছে। এবার সে গুহার মুখে এসে বলল, বট-কদ্‌বেল-ডুমুর ফল যে কত পেকে রয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর তুমি কিনা খিদের জ্বালায় মরছ? এত বোকা তুমি? চল ভাই, আমার সঙ্গে চল। দুহাতে ফল ছিঁড়বে আর খাবে। কত খাবে? পেট পুরে ফল খাবে চল।

লালমুখোর এমনিতেই খুব খিদে পেয়েছে। কালোমুখোর পেটের দিকে তাকিয়ে তার লোভ আরও বেড়ে গেল। সে বৃষ্টির মধ্যেই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক ঘোরাঘুরি করল, কিন্তু কোনো গাছেই ফল পেল না। কোথাও কিছু না পেয়ে সে আবার তার গুহায় ফিরে এল। এসে দেখল, কালোমুখো বানর গুহার ভেতরে বসে রয়েছে। তখন লালমুখো কালোমুখোকে

ঠকাবার জন্য বলল, গাছ-পাকা ফল খেয়ে আজ যা সুখ পেলাম, তা আর তোমাকে কি বলব ভাই। এমনটি কখনও খাইনি।

এই কথা শুনে কালোমুখো বানর বলল, বানরই পারে বানরকে ঠকাতে। কিন্তু তুমি তো সেদিনের ছেলে, ঠকাবে আমাকে? আমি হলাম পুরনো ঘুঘু তোমার কথায় ভুলব আমি? আমি তো জানি, এখন কোনো বনের কোনো গাছেই ফল নেই। তুমি আমায় কি ঠকাবে? এখন বিরক্ত কর না, যেখানে খুশি সেখানে চলে যাও। এখানে ঠাঁই হবে না।

তখন লালমুখো বানর কালো মুখ করে মনের দুঃখে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে সেখান থেকে চলে গেল।

উলূক-জাতক। অনেক কাল আগে পাখিরা ভাবল, সবারই রাজা আছে, শুধু রাজা নেই আমাদের। আমাদেরও একজন রাজা থাকা চাই। এই ভেবে তারা পাখিদের এক সভা ডাকল। সেই সভায় সব পাখি এল। কাকে রাজা করা যায়? অনেক চিন্তা করে তারা পেঁচাকে তাদের রাজা করা ঠিক করল। সব ঠিক করে তারা বলল, আমাদের মধ্যে একজন তিনবার পেঁচার নাম বলবে। তোমরা সায় দেবে।

সেই সভায় ছিল এক কাক। প্রথম দুবার পেঁচার নাম বলাতে সে চুপ করে শুনল। তিনবারের বার নাম ডাকার আগেই কাক বলল, একটু অপেক্ষা কর, রাজা হবার সময়েই পেঁচার যদি মুখের চেহারা এমন হয়, তাহালে রাজা হবার পরে ইনি যখন রেগে যাবেন তখন না জানি এর মুখ আরও কত ভয়ংকর হবে। তখন যে আমরা কে কোথায় ছিটকে পড়ব তার ঠিক নেই। তাই আমার মতে পেঁচাকে রাজা করা ঠিক হচ্ছে না।

'আমার মত নেই, আমার মত নেই'—একথা বারবার বলতে বলতে কাক আকাশে উড়ে গেল। পেঁচাও কাকের পেছনে ধাওয়া করল। সেইদিন থেকে কাক আর পেঁচা চিরশত্রু হয়ে গেল।

পঞ্চতন্ত্র ও কথাসরিৎসাগরে এই পশুকথা রয়েছে। ঈশপেও রয়েছে এই কাহিনী, সেখানে ময়ূর ও দাঁড়কাকের চিরশত্রুতা দেখানো হয়েছে।

সিংহচর্ম-জাতক। অনেক কাল আগে এক বণিক ছিল। তার ছিল একটা গাধা। বণিক যেখানে যেত সেখানে বোঝা নামিয়ে গাধাটাকে সিংহের একটা চামড়া পরিয়ে দিত। তারপর তাকে লোকের ধান যবের ক্ষেতে ছেড়ে দিত। চাষীরা ভাবত, এটা একটা সিংহ। তাই তার কাছে যেতে সাহস পেত না।

এইরকমভাবে দিন যায়। একদিন সকালে বণিক গাধাকে ক্ষেতে ছেড়ে দিয়েছে। গাধা মনের সুখে ফসল খাচ্ছে। চাষীরা ভয় পেয়ে ক্ষেত ছেড়ে গাঁয়ে চলে গেল, সেখানে সবাইকে এই খবর দিল। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি নিয়ে শাঁখ বাজিয়ে ক্ষেতের দিকে ছুটে এল। ক্ষেতের কাছে এসে খুব চিৎকার করতে

লাগল। গাধা ভয় পেয়ে প্রাণের ভয়ে ডেকে উঠল। তখন তারা বুঝল, এটা সিংহ নয়, সিংহের চামড়া গায়ে এক গাধা। গাঁয়ের লোকেরা লাঠি দিয়ে বেদম মারতে লাগল সেই গাধাকে। তারপর তার দেহ থেকে সিংহের চামড়াটা নিয়ে গাঁয়ে ফিরে গেল।

একটু পরে বণিক এল সেখানে। গাধার দুর্দশা দেখে সে সব বুঝতে পারল। একটু পরেই গাধা মরে গেল। বণিক তাকে ফেলে রেখে চলে গেল।

পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে এই পশুকথা। সেখানে গাধার মালিক একজন ধোপা। লোকসমাজে পশুকথাটি খুব জনপ্রিয়। তবে কোথাও রয়েছে বাঘের চামড়ার কথা আবার কোথাও রয়েছে সিংহের চামড়ার কথা।

সুবর্ণহংস-জাতক। অনেক অনেককাল আগে এক হাঁস ছিল। সে আগের জন্মে ছিল এক গৃহস্থ। তার ছিল বৌ আর দুই মেয়ে। লোকটি মারা যাবার পরে বৌ আর মেয়েদের খুব কষ্টে দিন চলত। পাড়া-পড়শীদের বাড়ি কাজ করে তারা কোনোরকমে বেঁচে ছিল।

একদিন হাঁস চিন্তা করল, আমার আপনজন কি কষ্টেই না দিন কাটাচ্ছে! তারা পরের বাড়ি কাজ করে। আমার পালকগুলো তো পেটা সোনার। আমি ওদের এক-একটা করে পালক দেব, সেটা বিক্রি করে ওরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

এই কথা ভেবে হাঁস তাদের কুঁড়েঘরে উড়ে গিয়ে ঘরের মাঝখানের খুঁটিতে বসল।

হাঁসকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এলে?

হাঁস বলল, আমি তোমাদের বাবা, মৃত্যুর পরে সোনার হাঁস হয়ে জন্মেছি। তোমাদের দেখতে এসেছি। এখন থেকে তোমাদের আর পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতে হবে না। আমি এখন থেকে তোমাদের এক একটা করে সোনার পালক দেব, তাই বিক্রি করে তোমরা সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবে।

এই কথা বলে তাদের একটা সোনার পালক দিয়ে হাঁস আবার উড়ে চলে গেল। তারপর থেকে হাঁস মাঝে-মধ্যে তাদের কুঁড়েঘরে উড়ে আসত, একটা করে সোনার পালক দিত, আবার ফিরে যেত। সেই পালক বিক্রি করে মোরের অনেক টাকা হত, তাই দিয়ে তারা তিনজনে পরম সুখে বাস করত।

একদিন বৌ মেয়েদের বলল, হাঁস একটা সামান্য পাখি, কখন কি মতি গতি হয় বলা যায় না। তোদের বাবা কখন যে আসা বন্ধ করে দেবে তা কেউ বলতে পারেনা। তাই বলি, এবার যখন হাঁস আসবে, তখন আমরা তার সব পালক ছিঁড়ে রাখব।

কিন্তু বাবার গায়ে খুব ব্যথা লাগবে ভেবে মেয়েরা রাজি হল না। বৌ কিন্তু মনে মনে সব ঠিক করে রাখল। বাচ্চাদের কথা কান দিতে নেই।

আবার একদিন হাঁস কুঁড়েঘরে এল। বৌ বলল, তুমি আমার কাছে এসে বসো। হাঁস বৌয়ের কথায় তার কাছে গেল। হঠাৎ বৌ দুই হাতে জাপটে ধরল হাঁসকে। পটাপট্ তার পালকগুলো দেহ থেকে ছিঁড়ে নিল। পালক পড়ে আছে মেঝেতে, একটাও সোনার পালক নয়, সবই হাঁসের সাধারণ পালকের মতো। বৌ তখন হাঁসকে ধরে একটা মাটির জালার মধ্যে রেখে দিল। প্রতিদিন তাকে খেতে দিত। কিছুদিন পরে হাঁসের গায়ে আবার পালক বের হল। কিন্তু কোনো পালকই সোনার নয়, হাঁসের সাদা পালকের মতো। পালক গজালে হাঁস উড়ে বনে চলে গেল, আর কোনোদিন সে কুঁড়েঘরে ফেরেনি।

ঈশপের নীতিকথায় আছে, হাঁস সোনার ডিম দিত। ফরাসী লোককথা-সংগ্রাহক লা ফঁতেন-এর পশুকথায় অবশ্য সোনার পালকের কথাই আছে। ওড়িশার পান্‌কা আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও সোনার ডিমের উল্লেখ রয়েছে। তবে জাতকের কাহিনীতে হাঁসের পূর্বজন্মের যে কথা রয়েছে অন্য কোথাও তার উল্লেখ নেই।

এইভাবে লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে অনেক পশুকথা জাতককার গ্রহণ করেছেন। আবার এমন কিছু পশুকথাকে জাতককার প্রয়োজনে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যার মূল রূপটি প্রায় হারিয়েই গিয়েছে। তবু বিশ্লেষণ করলে অন্তত ইঙ্গিতটি অনুধাবন করা যায়।

জাতকে রূপকথা

জাতকে অনেক রূপকথা আছে। কিছু রূপকথা যে লোকসমাজ থেকে সংগ্রহ করা তা বোঝা যায়। তবে পশুকথাকে যেমন ব্যাপকভাবে নীত-উপদেশের জন্য ব্যবহার করা যায়, রূপকথাকে অত ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যায় না। কেননা, রূপকথার মধ্যে অন্য রসের প্রাধান্যই বেশি। আনন্দদায়ক গল্পরসটি সেখানে গুরুত্ব পায়। জাতকে যেসব লৌকিক রূপকথা সংযোজিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যও নীতিশিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় উপদেশ-দান। দশরথ-জাতক রূপকথা আলোচনায় উল্লেখ করেছি, কেন কিভাবে অন্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কাহিনীর সঙ্গে জাতকের কাহিনীর এত মিল। পার্থক্য যেখানে রয়েছে, সেখানে মনে হয়, অন্য এলাকার লোকসমাজ থেকে কাহিনীটি সংগৃহীত। একই লোককথার যেমন বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়, তেমনি এইসব গ্রন্থেও বিভিন্ন রূপ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংগ্রাহক যে রূপটির সঙ্গে পরিচিত সেই রূপই গ্রহণ করেছেন।

সঞ্জীব-জাতক। অনেক কাল আগে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তার ছিল অনেক শিষ্য। তিনি তাদের শিক্ষাদীক্ষার ভার নিয়েছিলেন। সেই শিষ্যদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সঞ্জীব। গুরু তাকে একটা মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। এই মন্ত্রের জোরে মৃত প্রাণীকেও বাঁচিয়ে তোলা যেত। কিন্তু জীবিতকে আবার মৃত করার মন্ত্র সে জানত না।

একদিন সঞ্জীব অন্য কয়েকজন শিষ্যের সঙ্গে বনের পথে চলেছে। বন থেকে কাঠ নিয়ে আসতে হবে। পথে তারা দেখল একটা বাঘ মরে পড়ে রয়েছে। সঞ্জীব বলল, এই মরা বাঘকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি।

সঙ্গীরা বলল, তা কখনও হয় নাকি? মৃতদেহ কি কখনও প্রাণ ফিরে পেতে পারে!

তোমরা দাঁড়িয়ে দেখ না, আমি এই বাঘকে বাঁচিয়ে তুলছি।

পার তো বাঁচাও দেখি? এই কথা বলে সঙ্গীরা একটা গাছে উঠে বসল। সেখান থেকে কি ঘটে তা দেখতে লাগল।

সঞ্জীব মন্ত্র পড়ল, একটা মাটির খাপ্‌রা তুলে নিয়ে বাঘের দেহে আঘাত করল, বাঘ চোখ মেলল, লাফিয়ে উঠল,—তারপরে প্রচণ্ড গর্জন করে সঞ্জীবের দিকে ধেয়ে এল। লাফিয়ে তার গলা কামড়ে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্জীব মারা গেল। বাঘও সঙ্গেসঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল আর মরে গেল। দুটো মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে রইল।

শিষ্যেরা কাঠ নিয়ে ফিরে এল। সব কথা গুরুকে জানাল। গুরু বললেন, দেখ, সঞ্জীব শয়তানের উপকার করতে গিয়ে, অনুচিত জায়গায় মন্ত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে প্রাণ হারাল। তোমরা কেউ যেন এমন ভুল কর না।

পঞ্চতন্ত্রে ব্রাহ্মণ ও চারপুত্রের যে রূপকথা রয়েছে তার সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। তিন ছেলে শাস্ত্রজ্ঞ, একজন মূর্খ। তিন ছেলে তিন ধরনের মন্ত্র জানত। মৃত সিংহের হাড় একজন একত্রিত করল, অন্যজন তাতে রক্ত-মাংস-চামড়া জুড়ল আর তৃতীয়জন প্রাণ দিল। মূর্খ ছেলে গাছে চড়ে বসে ছিল। তিনজন শাস্ত্রজ্ঞ মারা পড়ল, মূর্খ বেঁচে গেল।

কূট বণিক-জাতক। একজন বণিক ছিল। তার নাম পণ্ডিত। সে অন্য একজন বণিকের সঙ্গে মিলে ব্যবসা শুরু করল। সেই বণিকের নাম ছিল অতিপণ্ডিত। ব্যবসা করে তাদের খুব লাভ হল, তারা নিজেদের দেশে ফিরে এল।

লাভের ভাগাভাগির সময় অতিপণ্ডিত বলল, আমি লাভের দুই অংশ নেব, আর তুমি নেবে এক অংশ।

পণ্ডিত বলল, তুমি দুই অংশ পাবে কেন?

অতিপণ্ডিত বলল, তুমি পণ্ডিত, আমি অতিপণ্ডিত। যে পণ্ডিত সে এক ভাগ আর যে অতিপণ্ডিত সে দুই ভাগ পাওয়ার যোগ্য।

পণ্ডিত বলল, সে কি কথা ? পণ্যের মূল্য, গাড়ি-বলদের খরচ, সবই তো আমরা সমান সমান দিয়েছি। তবে তুমি কেন লাভের দুই অংশ পাবে ?

আমি অতিপণ্ডিত তাই।

এইভাবে কথা কাটাকাটি হতে হতে তাদের মধ্যে রীতিমতো ঝগড়া বেধে গেল। তখন অতিপণ্ডিত ভাবল, আচ্ছা, ঝগড়ার মীমাংসার একটা উপায় মাথায় এসেছে। সে তার বাবাকে এক গাছের কোটরের মধ্যে লুকিয়ে রেখে বলল, আমরা দুজনে এসে যখন জিজ্ঞেস করব, তখন আপনি বলবেন যে, অতিপণ্ডিত দুই অংশ পাবে।

তারপর সে পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বলল, ভাই, আমাদের কার কি প্রাপ্য, তা জানেন গাছের দেবতা। চল, তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।

দুইজনে গেল সেই গাছের তলায়। অতিপণ্ডিত বলল, হে গাছের দেবতা, আপনি আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিন।

তখন তার বাবা গলার স্বর অন্য রকম করে বলল, কি নিয়ে তোমাদের ঝগড়া আগে তাই শুনি।

অতিপণ্ডিত বলল, দেবতা, এই বন্ধু পণ্ডিত, আর আমি অতিপণ্ডিত। আমরা একসঙ্গে ব্যবসা করেছিলাম। তাতে যে লাভ হয়েছে তার কত অংশ কে পাবে আপনি বিচার করে বলুন।

গাছের কোটর থেকে উত্তর এল, পণ্ডিত পাবে এক ভাগ আর অতিপণ্ডিত পাবে দুই ভাগ।

পণ্ডিত উত্তর শুনে ভাবল, এই গাছে দেবতা আছে কিনা তা জানা দরকার। এই ভেবে সে কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে কোটরের মধ্যে ফেলে দিল। তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। শুকনো পাতায় আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। অতিপণ্ডিতের বাবা আধপোড়া হয়ে গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এল। এর পর পণ্ডিত ও অতিপণ্ডিত লাভের অংশ সমানভাবে ভাগ করে নিল।

পঞ্চতন্ত্রে ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি রূপকথার সঙ্গে জাতকের এই কাহিনীর মিল রয়েছে।

চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক। অনেক অনেক কাল আগে এক বণিক ছিল। সে ছিল বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। সে চুল্লশ্রেষ্ঠী উপাধি পেয়েছিল। বণিক একদিন রাজার কাছে যাচ্ছিল, পথে সে একটা মরা ইঁদুর দেখতে পেয়ে বলল, যদি কোনো বুদ্ধিমান লোক এই মরা ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যায়, তবে সে ব্যবসা করে খুব ধনী হতে পারবে।

ঐই সময়ে একজন গরিব মানুষ ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বণিকের কথা শুনে সে ভাবল, দেখি না মরা ইঁদুর নিয়ে ভাগ্য ফিরে কিনা। সে মরা ইঁদুরটা তুলে নিল। কাছেই থাকত এক দোকানদার। সে পোষা বেড়ালের জন্য খাবার খুঁজছিল। এক পয়সা দিয়ে সে ইঁদুরটা কিনে নিল।

গরিব মানুষটি সেই এক পয়সা দিয়ে গুড় কিনল। এক কলসী জল নিয়ে পথের ধারে বসে রইল। সেই পথে ফুল কুড়িয়ে মালাকারেরা যেত। ক্লান্ত হয়ে তারা সেখানে বসল, গরিব মানুষটির কাছ থেকে একটু একটু গুড় নিয়ে জল খেল। তেষ্টা মিটিয়ে তারা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কিছু কিছু ফুল দিল। ফুল বিক্রি করে সে যে পয়সা পেল তা দিয়ে আরও বেশি গুড় কিনে ফুলের বাজারে গেল। মালাকারদের গুড় খাওয়াল। মালাকারেরা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে কতকগুলো ফুলের গাছ দিল। এইভাবে ফুল ও ফুলগাছ বিক্রি করে অল্পদিনের মধ্যেই তার বেশ কিছু পুঁজি হল।

একদিন খুব বৃষ্টি হল। রাজার বাগানে অনেক শুকনো ও কাঁচা ডালপালা ভেঙে পড়ল। বেচারী মালী ভাবছে, এত আবর্জনা সরাই কেমন করে? এমন সময় সেই গরিব মানুষটি সেখানে এসে বলল, আমার ওপর যদি ছেড়ে দাও, তবে একাই আমি বাগান পরিষ্কার করে দেব। কোনো পয়সা-কড়ি নেব না।

মালী তক্ষুনি রাজি হয়ে গেল। গরিব মানুষটি কাছের একটা মাঠে গেল, সেখানে ছেলেরা খেলা করছিল। মানুষটি প্রত্যেকটি ছেলেকে একটু একটু গুড় দিল। বলল, ভাই, তোমরা আমার সঙ্গে এস, রাজার বাগান পরিষ্কার করতে হবে। ছেলেরা গুড় খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল, তারা ভাঙা ডালপালা তুলে এনে রাস্তার ওপর গাদা করে রাখল।

সেদিন রাজার কুমোরের কাঠের খুব অভাব হয়েছিল। সে হাঁড়ি কলসী পোড়াবার জন্য কাঠ কিনতে গিয়ে ভাঙা ডালের পাহাড় দেখতে পেল। গরিব মানুষটিকে কিছু টাকা ও কয়েকটা হাঁড়ি দিয়ে সে ডালগুলো কিনে নিল।

তার হাতে আরও টাকা-কড়ি জমল। সেই এলাকায় অনেক অনেক ঘাসুড়ে ছিল। তারা প্রতিদিন মাঠে ঘাস আনতে যেত। মানুষটি মাঠের ধারে বড় বড় জালায় জল ভরে রাখল। ঘাসুড়েরা ঘাস কাটতে কাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তেষ্টা মেটাতে তার কাছ থেকে জল চেয়ে খেত। ঘাসুড়েরা সন্তুষ্ট হয়ে বলল,তুমি আমাদের এত উপকার করছ, তুমি বল আমরা তোমার জন্য কি করতে পারি।

গরিব মানুষটি বলল, তার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? যখন দরকার পড়বে আমিই জানাব।

এই সময়ে তার সঙ্গে দুজন বণিকের খুব বন্ধুত্ব হল। একজন জলপথে ও অন্যজন স্থলপথে বাণিজ্য করত। একদিন স্থলপথের বণিক বলল, ভাই, কাল এই নগরে একজন অশ্ব-বিক্রেতা পাঁচশ' অশ্ব নিয়ে আসবে। এই কথা শুনে সে ঘাসুড়েদের বলল, ভাই, কাল তোমরা প্রত্যেকে আমায় এক আঁটি করে ঘাস দেবে আর আমার ঘাস বিক্রি করা শেষ না হলে তোমাদের ঘাস বিক্রি করবে না। তারা রাজি হল।

পরের দিন অশ্ব-বিক্রেতা কোথাও ঘাস না পেয়ে তার কাছ থেকে অনেক টাকা-কড়ি দিয়ে পাঁচশ' আঁটি ঘাস কিনল।

এর কয়েকদিন পরে সে জলপথের বণিকের কাছ থেকে জানতে পারল, বন্দরে একটা বড় জাহাজ মাল নিয়ে এসেছে। সে দেরি না করে একদিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করল। গাড়ি নিয়ে বন্দরে গেল। সেখানে সে জাহাজের সমস্ত মালের দর ঠিক করে নিজেই বায়না করল। পরে তাঁবু খাটিয়ে সেখানেই থেকে গেল। অনুচরদের বলল, কোনো বণিক যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাহলে তাকে যেন একে একে তিনজন অনুচরের সঙ্গে ভেতরে আনা হয়।

এদিকে বন্দরে বড় জাহাজ এসেছে শুনে নগরের একশ' বণিক জাহাজের মাল কিনবার জন্য বন্দরে এল। কিন্তু যখন শুনল একজন মহাজন একাই সমস্ত মাল বায়না করেছে, তখন খোঁজখবর নিয়ে তারা সেই মানুষটির কাছে এল। তাঁবুর আশেপাশে নানা অনুচরের ছড়াছড়ি দেখে তারা ভাবল, এই মহাজন অতুল ধনসম্পদের অধিকারী। তারা এক এক করে তার সঙ্গে দেখা করল আর মালের এক এক অংশ কিনবার জন্য এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে রাজি হল। তার নিজের যে অংশ ছিল, তা কিনবার জন্যও তারা আরও এক লক্ষ মুদ্রা লাভ দিল। এইভাবে দুই লক্ষ মুদ্রা লাভ করে সেই মানুষটি নগরে ফিরে এল।

গরিব মানুষটি বুঝল, সেই পথের বণিকের শোনা কথায় কাজ করে আজ সে এত ধনবান হতে পারল। বণিকের কাছে সে চির-কৃতজ্ঞ। তাই সে বণিকের কাছে গিয়ে এক লক্ষ মুদ্রা উপহার দিল।

বণিক বলল, তুমি এত অর্থ কোথায় পেলে?

তখন মানুষটি সব খুলে বলল, মরা ইঁদুর বিক্রি করার পর থেকে মাত্র চারমাসের মধ্যে সে এত ধনী হয়েছে। তা শুনে বণিক ভাবল, এই বুদ্ধিমান মানুষটি যাতে কোনো খারাপ হাতে গিয়ে না পড়ে তা দেখতে হবে।

বণিক নিজের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিল। বণিকের অন্য কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না। মানুষটি বণিকের সমস্ত সম্পত্তিও পেল।

গরিব মানুষের ভাগ্য ফেরার অসংখ্য রূপকথা রয়েছে লোকসমাজে। সেইসব রূপকথার সঙ্গে এই জাতকের সাদৃশ্য রয়েছে। আর সোমদেবের কথাসরিৎসাগরেও এইরকমের অবিকল একটি কাহিনী রয়েছে।

কাষ্ঠহারি-জাতক। অনেক অনেককাল আগে এক রাজা বনে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি মেয়ে গান গাইতে গাইতে কাঠ কুড়োচ্ছে। তাকে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এমন রূপ! তার রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা সেখানেই তাকে গান্ধর্ব-মতে বিয়ে করলেন। তাদের দৈহিক মিলন ঘটল। মেয়েটি গর্ভবতী হল। মেয়েটির গর্ভে নিজের সন্তান রয়েছে, তাই

তার হাতে নিজের নাম লেখা একটা আংটি দিয়ে বললেন, যদি তোমার মেয়ে হয়, তবে এই আংটি বিক্রি করে তার ভরণ-পোষণ চালাবে। আর যদি ছেলে হয়, তবে এই আংটি নিয়ে আমার কাছে যাবে।

কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হল। বনের অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে বেড়ে উঠতে লাগল সে। তার বাবা নেই বলে অন্য ছেলেরা তাকে ক্ষেপাত।

একদিন ছেলে এসে বলল, মা, আমার বাবা কে।

মা বলল, বাছা, তুমি রাজার ছেলে।

আমি যে রাজার ছেলে তার প্রমাণ কি মা ?

মা বলল, তার আংটি আমার কাছে আছে। তোমার বাবা বলেছিল যদি ছেলে হয় তবে এই আংটি নিয়ে আমার কাছে যাবে।

ছেলে বলল, তবে তুমি আমার বাবার কাছে নিয়ে চল না কেন ?

তখন মা ছেলে রাজার বাড়ি গেল। রাজাকে প্রণাম করে বলল, মহারাজ, এই আপনার ছেলে।

সভার মধ্যে লজ্জা পেতে হবে বলে রাজার সব কথা মনে থাকলেও তিনি না জানার ভান করে বললেন, সে কি কথা ? এ আমার ছেলে হতে যাবে কেন ?

রানী তখন রাজার দেওয়া আংটি দেখাল। রাজা এবারেও বিস্ময়ের ভান করে বললেন, এ আংটি আমার নয়।

তখন রানী নিরুপায় হয়ে বললেন, ধর্ম ছাড়া আমার আর কোনো সাক্ষী নেই। আমি ধর্মের দোহাই দিয়ে বলছি, এ যদি সত্যিই আপনার ছেলে হয়, তবে যেন এ মধ্য আকাশে স্থির হয়ে থাকে। আর যদি আপনার ছেলে না হয়, তবে মাটিতে পড়ে এ মারা যাবে।

এই কথা বলেই রানী পা ধরে ছেলেকে উঁচুতে ছুড়ে দিলেন। মাঝখানে ছেলে স্থির হয়ে রইল। তখন হাত বাড়িয়ে রাজা ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। ছেলে হল রাজপুত্র আর রানী হলেন রাজমহিষী।

মহাভারতের আদিপর্বের অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় থেকে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় পর্যন্ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-ভরত বৃত্তান্ত রয়েছে। জাতকের কাহিনীর অনুরূপ। দুষ্মন্ত গিয়েছিলেন মৃগয়ায়, তিনি কণ্বমুনির আশ্রমে সর্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী মধুরহাসিনী রূপযৌবনবতী লোকললামভূতা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী শকুন্তলাকে দেখেন। রাজা প্রেমাবিষ্ট হন। গান্ধর্ব-মতে বিয়ের প্রস্তাব দেন। শকুন্তলার সন্তানকে যুবরাজ ও রাজার অবর্তমানে অধিরাজ করবেন এই আশ্বাস পেয়ে শকুন্তলা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হলেন।

তখন দুষ্মন্ত গান্ধর্ব-মতে সেই মরালগামিনী শকুন্তলাকে বিয়ে করে তার সঙ্গে ক্রীড়াকৌতুক করতে লাগলেন। তাকে কিছুদিনের মধ্যেই রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুষ্মন্ত ফিরে গেলেন। মহাভারতের কাহিনীতে আংটির কোনো উল্লেখ নেই।

শকুন্তলা ভরতকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে গেলেন। কিন্তু দুষ্মন্ত বললেন, তুমি যা বললে তা আমার কিছুই মনে পড়ছে না। তোমাকে আমি চিনি না, তুমি যেখানে খুশি চলে যাও।

এমন সময় দৈববাণী হল, এই পুত্র তোমার, একে গ্রহণ কর। শকুন্তলাকে অপমান কর না। শকুন্তলা যা বলেছে সব সত্যি।

তখন দুষ্মন্ত কপটতা ত্যাগ করে বললেন, এই ছেলে যে আমার তা আমি জানি। কিন্তু যদি সহসা একে গ্রহণ করতাম তাহলে লোকে আমাকে দোষী করত। তাই মিথ্যে মিথ্যে শকুন্তলার সঙ্গে বিবাদ করছিলাম। এই বলে রাজা পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন।

আংটির বিষয়টি ছাড়া জাতকের গল্পের সঙ্গে খুব সাদৃশ্য রয়েছে। দুই রাজাই বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করেছেন, দৈবের কৃপায় সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লোককথার যে নানা রূপ নানান জায়গায় পাওয়া যায় এখানেও তার নিদর্শন রয়েছে। দুই সংকলক দুটি এলাকা থেকে তাদের কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, অবশ্য উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য।

শিবি-জাতক। শিবিরাজার আত্মোৎসর্গের কাহিনী ভারতে অত্যন্ত সুপরিচিত। বিভিন্ন লোকসমাজে নানা রূপে এই কাহিনীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বৌদ্ধ ও হিন্দু সম্প্রদায় উভয়েরই অত্যন্ত প্রিয় রূপকথা। মহাভারতের বনপর্বের ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ও একত্রিংশদধিকতম অধ্যায়ে উশীনর উপাখ্যান ও অনুশাসনপর্বের দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়ে সর্বজীবে দয়া—শিবি-কপোত-শ্যেনবৃত্তান্তে একই কাহিনী রয়েছে। কথাসরিৎসাগরেও শিবিরাজার বৃত্তান্ত আছে।

জাতকের কাহিনী রয়েছে: শিবিরাজ স্থির করেছেন যে আজ কোনো যাচক উপস্থিত হয়ে প্রার্থনা করলে তিনি নিজের চোখ উৎপাটন করে তাকে দান করবেন। যাচক বলেছিলেন, আমি অন্ধ আর আপনার রয়েছে দুটি চোখ। আপনি আমাকে আপনার একটি চোখ দান করুন। রাজা সম্মত হলেন। সীবক বাম হাতে রাজার চোখ ধরলেন আর ডান হাতে অস্ত্র নিয়ে স্নায়ুতন্ত্র কেটে রাজার হাতে চোখটি দিলেন। অন্ধ সেই চোখ নিজের কোটরে বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। শিবি দ্বিতীয় চোখটিও অন্ধকে দান করলেন। অবশ্য শেষপর্যন্ত তিনি দুটি চোখই ফিরে পেয়েছেন, নইলে রূপকথার ইচ্ছাপূরণ সম্পূর্ণ হয় না।

মহাভারতে কিন্তু আরও মহৎ আত্মোৎসর্গের বিবরণ রয়েছে। জাতকে রাজা নিজেই দানের বিষয়টি চিন্তা করেছেন আর মহাভারতে বাসব ও বহ্নি দেবতা উশীনরকে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেন ও হুতাশন কপোতরূপে উশীনরের যজ্ঞভূমিতে এসেছেন। রাজা দেহের সব মাংস কেটে দিলেও কপোতের সমান ওজন হল না। তখন তিনি নিজেই তুলাদণ্ডে উঠে

বসলেন। ইন্দ্র ও হুতাশন নিজেদের মূর্তি ধরে রাজাকে আশীর্বাদ করলেন। রূপকথায় যা যা ঘটে তাই হল, রাজা পূর্বদেহ ফিরে পেলেন।

অনুশাসনপর্বে কিন্তু দেবতাদের অন্য মূর্তিতে এসে পরীক্ষা করার বিষয়টি নেই। এখানে রয়েছে : আগে এক প্রিয়দর্শন কপোতকে শ্যেন পাখি শিকারের জন্য তাড়া করেছিল। শিবিরাজার কোলে সে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপরে একইভাবে কাহিনী এগিয়ে চলল। কাহিনীর শেষে আছে, তিনি তুলাদণ্ডে আরোহণ করবামাত্র দেবরাজ ত্রিলোকবাসীদের সঙ্গে সমবেত হয়ে শিবিরাজার কাছে এলেন। দেবগণ ভেরী ও দুন্দুভি ধ্বনি করে তার মস্তকে বারবার অমৃত ও পুষ্প বৃষ্টি করতে লাগলেন। গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ লোকপিতামহ ব্রহ্মার মতো তার আনন্দের জন্য নৃত্যগীত করতে লাগল।

উশীনর ও শিবির কাহিনী একই গ্রন্থে থাকা সত্ত্বেও কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেল। উশীনর যজ্ঞ করছিলেন, যজ্ঞে তিনি বাসবকে অতিক্রম করেছিলেন। তাই বোধহয় পরীক্ষা করবার প্রয়োজন পড়ল। আর শিবির গল্পে ভয় পেয়ে কপোত আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে শ্যেন ও কপোত দেবতা নয়। একই গ্রন্থে একই গল্প দুভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও কি দুজন সংগ্রাহক একই রূপকথার দুটি রূপকে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন? একেবারে অসম্ভব নাও হতে পারে। আবার জাতকের কাহিনীর মর্মকথা এক হলেও রূপটি ভিন্ন। লৌকিক ঐতিহ্য নানা রূপে উচ্চতর সাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়ে রয়েছে। দুটি ভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত হয়ে না থাকলে কিংবা একই জনের সংগ্রহ হলে এই পরিবর্তন সম্ভব হত না।

পঞ্চতন্ত্র

পৃথিবীর লোককথার সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলন হল পঞ্চতন্ত্র। ঈশপের নীতিকথার সঙ্গে এর তুলনা করা হয়। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের সংকলন ও সম্পাদনায় যে নিষ্ঠা, বৈদগ্ধ্য ও সৃষ্টিশীল মনের পরিচয় রয়েছে তা ঈশপের নেই। ঈশপের নীতিকথা শুধুমাত্র লোককথার সংগ্রহ আর সেই কারণেই অনেক বেশি লৌকিক। পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি সম্পূর্ণভাবে লৌকিক হলেও তার সম্পাদনার চমৎকারিত্ব সকলকে মুগ্ধ করে। লৌকিক ঐতিহ্যকে প্রায় অবিকৃত রেখে সম্পাদনার এমন বুনুনি অন্য কোথাও দেখা যায় না। ভারতবর্ষীয় পঞ্চতন্ত্র বিশ্বের লোককথা-সংগ্রহের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়। নিরক্ষর গ্রামীণ লোকসমাজ যে এক অসাধারণ বিস্ময়কর স্রষ্টা তার অনন্য নিদর্শন সংকলিত সম্পাদিত ও সংস্কৃতে অনূদিত এই

পঞ্চতন্ত্র। প্রতিকূল প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করতে করতে তাদের এগোতে হয় বলেই শ্রমনির্ভর এক আশ্চর্য জীবন-অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করেন। এই ধরনের সামাজিক অভিজ্ঞতা অন্য কোনো সমাজে অর্জন করা সম্ভব নয়। লোকচরিত্রের এমন অপরূপ প্রকাশও প্রায় দুর্লভ। আর এসবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেড় হাজার বছর ধরে প্রচারিত হয়ে এসেছে ভারতীয় পঞ্চতন্ত্র।

পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলি আদিতে ছিল লোকসমাজের সম্পদ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোককথা-সংগ্রাহক পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা অসীম পরিশ্রম ও অবর্ণনীয় ধৈর্যে এগুলি সম্পাদনা করে লিখিত রূপ দেন। লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ না হলে বিশ্বের লোকসমাজে এগুলি এমনভাবে আদৃত হত না কিংবা পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয়ও সম্ভব ছিল না। পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয় কিভাবে সম্ভব হল?

এক সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য-আরব দুনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। প্রথম আদান-প্রদান শুরু হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে। তারপরে স্বাভাবিক নিয়মেই অর্থনৈতিক যোগাযোগের পথ বেয়ে কিছু জ্ঞানতাপস সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। একে অন্যের সাংস্কৃতিক ও ভাবগত সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই প্রক্রিয়া প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

পারস্যের এক বাদশাহ এই রকম একজন জ্ঞানতাপসের মুখে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী শুনে মুগ্ধ হন। বাদশাহ ছিলেন রসিক মানুষ ও বিদ্যানুরাগী। তিনি পল্লভী ভাষায় এই পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ করতে আদেশ দেন। আধুনিক পারসীয় ভাষায় এই গ্রন্থের নাম আনোয়ার-উ-সুহাইলি এবং ইয়ার-ই-দানিশ। পারসীয় এই অনূদিত রূপ থেকেই পরে সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয় সিরিয়াক ও আরবী ভাষায়। সিরীয় গ্রন্থটির নাম কলিলগ ও দিমনগ। পঞ্চতন্ত্রের করটক ও দমনক কাহিনী থেকেই এই নামকরণ করা হয়েছে। আরবী অনুবাদের নাম কলিলা ওয়া দিমনা, সিরীয় ভাষার নামকরণ এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। ইংলণ্ডে এই গ্রন্থ বিদ্‌পাই-এর নীতিকথা নামে প্রচারিত হয়েছিল।

সিরীয় পারসীয় ও আরবী ভাষার পথ বেয়ে কনস্‌স্তান্তিনোপল-এর মধ্যে দিয়ে পঞ্চতন্ত্র সমগ্র ইউরোপ ভূখণ্ডে নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রচারিত হয়। হিব্রু গ্রীক ইতালীয় লাতিন ফরাসী জর্মন স্লাভ স্প্যানিশ ও ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত হয় এই ভারতীয় নীতিকথা। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবিস্তারের কালে উনবিংশ শতাব্দীর পর থেকে আফ্রিকা লাতিন আমেরিকা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও পঞ্চতন্ত্র বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। তবে এগুলির অধিকাংশই পঞ্চতন্ত্রের আংশিক অনূদিত রূপ। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর পঞ্চাশটি ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের অন্তত দুশোটি বিভিন্ন পাঠ রয়েছে।

লোকসমাজ সহজে বাইরের কোনো কিছুকে গ্রহণ করেন না। ঐতিহ্যের

প্রতি এক আশ্চর্য মমতায় নিজের সংস্কৃতির চারদিকে এক প্রায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তোলেন। যে বস্তু শুধুমাত্র তাদের হৃদয়-মননে সাড়া জাগায়, তাকেই তারা আপন বলে গ্রহণ করেন, নিজের সংস্কৃতিতে আত্মস্থ করে নেন। পঞ্চতন্ত্র গ্রামীণ লোকসমাজের নিজস্ব সম্পদ ছিল বলেই দূরদূরান্তের ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এত সহজে তাকে নিজের সম্পদ হিসেবে স্বীকার করে নিলেন। যেমন নিয়েছিলেন ঈশপকে। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে বর্ণিত অভিজ্ঞতা যে তাদেরই অভিজ্ঞতা। এই বঞ্চনা-সংগ্রাম-জীবনবোধ-মানবিকতা-কঠোরতা-ঈর্ষা-হীনতা-উদারতা সবই তাদের সামাজিক অভিজ্ঞতা-লব্ধ সম্পদ। ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ হলেও চিন্তা-চেতনা-অভিজ্ঞতায় তারা একই উত্তরাধিকারকে বহন করে চলেছেন। এ থেকে উপলব্ধি করা যায়, লোকসংস্কৃতির মধ্যে বোধহয় আন্তর্জাতিক মানসিকতা সবচেয়ে ব্যাপক।

বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে ভারতবর্ষ-চীন অনেক কাছাকাছি আসে। মাঝখানে তিব্বত। সপ্তম শতাব্দীতে পঞ্চতন্ত্র চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে চীন ও তিব্বতে প্রচারিত হয়। এই পথ বেয়ে পঞ্চতন্ত্র মোঙ্গোলিয়ায় পাড়ি দেয়। এই মোঙ্গোলরা দুশো বছর ধরে ইউরোপের শাসনক্ষমতায় ছিল, তাদের মাধ্যমেও হয়তো পঞ্চতন্ত্র ইউরোপে প্রচারিত হয়ে থাকতে পারে।

পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয়ের তিনটি পথ সম্পর্কে অনেক পণ্ডিতজন প্রায় একমত। (ক) দশম শতাব্দী পর্যন্ত প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্য থেকেই পঞ্চতন্ত্র প্রচারিত হয়। (খ) দশম শতাব্দীর পর থেকে ইসলামী প্রভাবে লিখিত ঐতিহ্য থেকে বাইজানটিয়াম ইতালি ও স্পেনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। (গ) বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে তিব্বত-চীনের পথ বেয়ে মোঙ্গোলিয়া ও সেখান থেকে ইউরোপে প্রচারিত হয়। থিওডর বেনফে এই তিনটি পথের কথা প্রথম বলেন। অন্য পথেও হয়তো পঞ্চতন্ত্র প্রচারিত হয়েছিল কিন্তু এই তিনটি পথও যে তাদের অন্যতম সে বিষয়ে সন্দেহ নেই!

প্রবাদ ও লোককথাই একমাত্র মাধ্যম যার আন্তর্জাতিক চরিত্র রয়েছে। দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে যা চিরায়ত আবেদনে সমৃদ্ধ।

পুরনো গ্রন্থের সঠিক রচনা-কাল নির্ণয় করা সহজ নয়, বিশেষ করে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের। কেননা, ভারতবর্ষে ইতিহাস-বোধ তেমন জাগ্রত ছিল না কোনো কালেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই আমাদের মধ্যে এই বোধের জন্ম হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের তো কথাই নেই, মধ্যযুগের সাহিত্যেও এই বোধের অভাব দেখা যায়। যারা সাল-তারিখের উল্লেখ করেছেন, তারাও হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন। ইউরোপীয় প্রভাবের আগে সাল-তারিখ সংরক্ষণের মানসিকতা গড়ে ওঠেনি বলেই কাব্য-সাহিত্যের রচনা-কাল নিয়ে এত তর্ক-বিতর্ক। প্রাচীন ভারতবর্ষে উচ্চতর শিক্ষিত সমাজে আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য এর অন্যতম কারণ। ব্রহ্ম সত্য

আর এই জাগতিক সব কিছুই মিথ্যা ছলনা-মাত্র, এই বোধ থেকেই সমর সম্পর্কে এক ধরনের উদাসীনতা দেখা দেয়। আর একটি প্রধান বাধা হল পুঁথির নকল। প্রচারের জন্য মূল পুঁথি থেকে অন্য অনেক পুঁথি লিখিত হত। আদি পুঁথি কোথায় হারিয়ে গেল। আবার নতুন পুঁথিতে সংযোজিত হতে লাগল নতুন গল্প-উপাখ্যান। কিন্তু সব পুঁথিতেই আদি পুঁথিকারের নাম রয়ে গেল। একটি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষ আশ্চর্য ব্যতিক্রম। অন্যের রচনা আত্মসাৎ করে নিজের নামে প্রচার করার অসংখ্য উদাহরণ পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু এই কুম্ভীলক বৃত্তির নজির প্রাচীন ভারতবর্ষে নেই। নিজের রচনা কোনো মহৎ রচনাকারের সৃষ্টির মধ্যে বিলীন করে দেওয়াতেই এরা বেশি আনন্দ পেয়েছেন। এরা যশোপ্রার্থী নন। রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে প্রাচীন অসংখ্য ভারতীয় কাব্য-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্র লোককথা সংগ্রহে এর নিদর্শন রয়েছে। তাই প্রাচীন পুঁথি দিনে দিনে কলেবরে বড় হয়েছে। এর ফলে একই গ্রন্থে চিন্তা-ভাষা-প্রকাশগত এত ভিন্নতা দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রও তার ব্যতিক্রম নয়।

এই কারণেই পঞ্চতন্ত্রের রচনা-কাল নিয়েও এত বিতর্ক রয়েছে। হারটেল মনে করেন, পঞ্চতন্ত্র সর্বপ্রথম কাশ্মীরে ২০০ খ্রীস্ট-পূর্বাব্দে সংকলিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, কাহিনীগুলো আরও পুরনো, লোকসমাজে অনেক কাল আগে থেকেই এসব কাহিনী প্রচলিত ছিল। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের প্রতি মুগ্ধতার জন্যই হারটেল কিছুটা কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন। একথা সত্যি, লোকসমাজে কাহিনীগুলো প্রচারিত ছিল যার ফলে জাতকমালায় অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের রচনা-কাল অত পুরনো নয়। রেমণ্ড ডেলয় জেসন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সংকলিত। লিলিয়ান হারল্যাণ্ডস হরনস্টেইন বলেছেন, পঞ্চতন্ত্র ২০০—৫০০ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত হয়েছিল। পেনজার টনিও সংকলনের সময় ধরেছেন খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

অর্থাৎ ২০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পঞ্চতন্ত্র সংকলিত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। সকলেই একটি বিষয়ে একমত, এটি লোককথার সংকলিত গ্রন্থ। কাল-নির্ণয়েই মতভেদ। আসলে, লোকসমাজের এইসব মৌখিক ঐতিহ্যের মধ্যে এমন কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা ঘটনার উল্লেখ সাধারণত থাকে না যার ওপরে ভিত্তি করে সঠিক কাল-নির্ণয় সম্ভব। বিষ্ণুশর্মা নামে একজন লোকসমাজের মধ্যে বহুকাল ধরে প্রচলিত লোককথা সংগ্রহ সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন,—এই বিষয়টিতে কোনো দ্বিমত নেই। ভারতবর্ষে পাওয়া সমস্ত পুঁথিতেই বিষ্ণুশর্মার নাম রয়েছে।

পঞ্চতন্ত্রের আদি পুঁথি ঠিক কবে সংকলিত হয়েছিল তা বলা না গেলেও একটি সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবেই করা যায়। পঞ্চতন্ত্র কোনোভাবেই ৫৭৯

খ্রীস্টাব্দের পরে রচিত নয়। কেননা, পারস্যের যে বাদশাহ পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলো শুনে মুগ্ধ হয়ে অনুবাদের আদেশ দেন, সেই বাদশাহ মারা যান ঐ বছরে। প্রাচীন ভারতবর্ষে পঞ্চতন্ত্র নিশ্চয়ই তার আগেই যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল নইলে পারস্যের জ্ঞানতাপস তার সন্ধান পেতেন না। তাই মনে হয়, এই সালের বহু আগেই পঞ্চতন্ত্র সংকলিত হয়ে থাকবে।

পঞ্চতন্ত্রের লেখক হিসেবে বিষ্ণুশর্মার নাম সুবিদিত। পঞ্চতন্ত্রের কথামুখম্-এ রয়েছে,

সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চাভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্॥

সুতরাং পুঁথিতে পাওয়া গ্রন্থকারের নাম সুস্পষ্ট। কিন্তু এই নামটি সত্যিই পঞ্চতন্ত্রের সংকলকের কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক গ্রন্থেরই রচয়িতার নামে সন্দেহ জাগে। অনেকে বেদব্যাস নামের মধ্যেও এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অনেক পুঁথিকার নিজের গুরুর নামে কিংবা নিজের সম্প্রদায়গত নামে পুঁথি লিখেছেন। পুঁথি প্রচারই তাদের উদ্দেশ্য ছিল, নিজের নাম নয়। এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক বোধ থেকে এই মানসিকতার জন্ম। তাই বিষ্ণুশর্মা এই নামেও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু আজ বোধহয় আর সে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রের যে প্রামাণ্য পাঠ আজ স্বীকৃত তাতে ৮৪টি লোককথা রয়েছে। পঞ্চতন্ত্র সংকলন করবার সময় বিষ্ণুশর্মা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে লোককথা সংগ্রহ করেছিলেন। তার কালে ভারতবর্ষে অসংখ্য লোককথা ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু নীতিশিক্ষার মহান দায়িত্বের কথা মনে রেখে, লোকশিক্ষার উপযোগী করে পুঁথিকে সাজিয়ে তুলতে তিনি নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাহিনী নির্বাচন করেছেন। সম্পাদক হিসেবে এই পুঁথিকার যে কত বড় প্রতিভাধর ছিলেন তা পঞ্চতন্ত্র গভীরভাবে পড়লেই উপলব্ধি করা যাবে। একটি মানুষ অসীম ধৈর্যে, মননশীল নির্বাচনে ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমে কিভাবে লোকশিক্ষার এমন আশ্চর্য সংকলন গ্রন্থ সৃষ্টি করতে পারেন তা পঞ্চতন্ত্র না পড়লে বিশ্বাস করা যাবে না। লোকসমাজের ঐতিহ্য থেকে সম্পদ আহরণ করে তিনি তিলোত্তমা সৃষ্টি করেছেন। পঞ্চতন্ত্রের লোককথা যেমন একদিকে লোকসমাজের তেমনি অন্যদিকে সম্পাদক বিষ্ণুশর্মার। লৌকিক ঐতিহ্য ও বিষ্ণুশর্মার বৈদগ্ধ্যপূর্ণ আন্তরিকতায় পঞ্চতন্ত্র বিশ্বের চিরায়ত সাহিত্যের অনন্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। বিশ্বে তার দিগ্বিজয়-যাত্রার পেছনে এই সৃষ্টির চমৎকারিত্ব ক্রিয়াশীল ছিল।

প্রাচীন অন্যান্য ভাষায় পঞ্চতন্ত্রের যেসব অনূদিত গ্রন্থ রয়েছে সেখানে লোককথার সংখ্যা অনেক বেশি। অনুবাদে লোককথার রূপরীতিতে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি ঘটেছে সংখ্যার ক্ষেত্রেও। তাহলে

কি পঞ্চতন্ত্রে আগে আরও বেশি কাহিনী ছিল? আবার পঞ্চতন্ত্রের অনেক পুরনো সংস্কৃত পুঁথিতে ৮৪ কিংবা ৭৯টি কাহিনী রয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়াও আজ অসম্ভব। ইতিহাসের কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য যতদিন না পাওয়া যাচ্ছে ততদিন সমস্যার সমাধান হবে না।

বিষ্ণুশর্মা কেন পঞ্চতন্ত্র লিখলেন সে বিষয়ে একটি কাহিনী আছে গ্রন্থের কথামুখম-এ। এই কাহিনীটিও শুনিয়েছেন স্বয়ং বিষ্ণুশর্মা। বড় বিস্ময় লাগে, যে আশি বছরের বৃদ্ধ গুরুদেব জাগতিক বৈভব প্রত্যাখ্যান করছেন তিনি এমনভাবে নিজের প্রশংসা করছেন, পাণ্ডিত্যের অভিমান প্রকাশ করছেন। অন্য কেউ যেভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন না, তিনি সেই বিস্ময়কর পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন। 'কথামুখম'-এর এই কাহিনীও কি প্রক্ষিপ্ত?

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব বরুণ কার্তিক ইন্দ্র যম কুবের লক্ষ্মী সরস্বতী সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা এবং মনু বৃহস্পতি শুক্র পরাশর প্রভৃতিকে প্রণাম জানিয়ে বিষ্ণুশর্মা লিখেছেন,—

দাক্ষিণাত্যের এক জনপদে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেখানকার রাজার নাম অমরশক্তি। তার তিন ছেলে। বসুশক্তি উগ্রশক্তি ও অনেকশক্তি। তারা তিনজনেই মহামূর্খ, লেখাপড়ায় একেবারে মন নেই, বই দেখলে সাত হাত দূরে পালায়। রাজা চিন্তিত।

শেষকালে রাজা অমাত্যদের বললেন, আপনারা সবাই জানেন আমার তিন ছেলে মহামূর্খ, অপগণ্ড, তারা লেখাপড়া করতে চায় না। আমার এত বড় রাজ্য, কিন্তু মনে সুখ নেই। সন্তান জন্মেনি কিংবা জন্মাবার পরে মরে গেল—মূর্খ ছেলের চেয়ে তাও ভালো। প্রথম দুজনের জ্বালা অল্প, কিন্তু তৃতীয় জন যে সারা জীবন জ্বালাতন করবে। যে স্ত্রীর সন্তান জন্মায় না তাও মেনে নেওয়া যায়, গর্ভেই যে সন্তান মারা যায় তাও সহ্য করা যায়। কন্যা সন্তান হলেও আপত্তি নেই। প্রচুর বিত্ত ও রূপ থাকলেও বোকা সন্তানকে কেউ কামনা করে না। যে গোরুর বাচ্চা হয় না, যে গোরু দুধ দেয় না, তাকে নিয়ে আমি কি করব? যে ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি নেই সে ছেলে থেকেই বা কি লাভ? তাই বলছি, ছেলে তিনটির যাতে মতিগতি ফেরে আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। আমার রাজ্যে পাঁচশো পণ্ডিত রয়েছেন যাদের আমিই ভরণপোষণ চালাই। তাই আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার ব্যবস্থা আপনারা করুন।

তখন একজন বললেন, মহারাজ, শুধু ব্যাকরণ শিখতেই বারো বছর সময় লাগে। তারপর পড়তে হবে ধর্মশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র কামশাস্ত্র। এইভাবে ধর্ম-অর্থ-কাম শাস্ত্র আয়ত্ত করতে পারলেই সত্যিকার জ্ঞান জন্মায়।

অমাত্য সুমতি বললেন, এ জীবন ক্ষণস্থায়ী কিন্তু শব্দশাস্ত্র আয়ত্ত করতে অনেক সময় লাগে। তাই ওদের জ্ঞান জন্মাবার জন্য কোনো ছোট

বইয়ের কথা চিন্তা করতে হবে। খোসা ফেলে যেমন শাঁস খেতে হয়, হাঁস যেমন জল ফেলে দুধটুকু শুধু খায়, তেমনি এইরকম কোনো কৌশল জেনে নিয়ে ওদের পড়াতে হবে। তাই বলছি, এই রাজ্যে বিষ্ণুশর্মা নামে যে ব্রাহ্মণ রয়েছে তার হাতে আপনি তিন ছেলের ভার দিন। সব শাস্ত্র তিনি জানেন, তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। তিনি নিশ্চয়ই আপনার ছেলেদের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মানুষ করে তুলতে পারবেন।

রাজা বিষ্ণুশর্মাকে ডাকলেন। বললেন, আমার তিন ছেলে খুব তাড়াতাড়ি যাতে অর্থশাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে, দয়া করে তার ব্যবস্থা করুন। আমি আপনাকে একশ'টি রাজদান দানপত্র করে দেব।

বিষ্ণুশর্মা তখন বললেন, আমি বিদ্যা বিক্রি করি না। একশ' রাজদানের বিনিময়েও বিদ্যা বিক্রি করব না। কিন্তু আপনার এই তিন ছেলেকে যদি ছয় মাসের মধ্যে নীতিশাস্ত্রে পণ্ডিত করে তুলতে না পারি, তবে বৃথাই আমার নাম। আমার বয়স হয়েছে আশি বছর, সমস্ত ইন্দ্রিয়-সুখ থেকে সরে এসেছি, অর্থ দিয়ে আমি কি করব মহারাজ? শুধুমাত্র আপনার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য আমি সরস্বতীকে নিয়ে পরীক্ষা করব। আজকের দিনটি লিখে রাখুন। ছয় মাসের মধ্যে তাদের যদি পণ্ডিত করে তুলতে না পারি তবে ঈশ্বর যেন আমার স্বর্গের পথ রুদ্ধ করে দেন।

বিষ্ণুশর্মার এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা শুনে রাজা ও তার অমাত্যরা আনন্দিত হলেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিতও হলেন। রাজা তিন ছেলেকে সঁপে দিলেন গুরুদেবের হাতে। তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

বিষ্ণুশর্মা তিন অপগণ্ড ছেলেকে গ্রহণ করলেন এবং পাঁচটি তন্ত্র রচনা করে তাদের পড়াতে লাগলেন। তারাও এই পাঁচটি তন্ত্র পড়ে ছয় মাসের মধ্যেই অসাধারণ পণ্ডিত হয়ে উঠল। তখন থেকেই ভূতলে পঞ্চতন্ত্র নামে নীতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থটি প্রচারিত হল 'বালাববোধনার্থং।'

বেশি কিছু বলতে চাই না, শুধু বলছি ঃ

অধীতে য ইদং নিত্যং নীতিশাস্ত্রং শৃণোতি চ।

ন পরাভবমাপ্নোতি শক্রাদপি কদাচন॥

নীতিশাস্ত্রের এই গ্রন্থ যে নিত্য পড়বে ও শুনবে, ইন্দ্রের কাছেও সে কখনও পরাভব স্বীকার করবে না।

পঞ্চতন্ত্রের এই কথামুখটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, বিষ্ণুশর্মা নিজের সম্পর্কে কি বলতে চেয়েছেন। আত্মবিশ্বাস এক জিনিস আর পাণ্ডিত্যের দম্ভ-প্রকাশ অন্য জিনিস। বিষ্ণুশর্মা স্থিরনিশ্চিত যে, তিনি নতুন পদ্ধতিতে ছেলেদের মানুষ করে তুলতে পারবেন। বিদ্যার ক্ষেত্রে এটি একটি চ্যালেঞ্জ। সে যোগ্যতা-দক্ষতা তার যে রয়েছে তার প্রমাণ এই সম্পাদিত গ্রন্থটি। কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করেছেন, যিনি বিদ্যা-

বিক্রয়ে অসম্মত, যিনি বৈভব প্রত্যাখ্যান করেছেন, তিনি কিভাবে দেবী সরস্বতীকে পরীক্ষা করবার মনোভাব প্রকাশ করেন? তিনি কিভাবে বলতে পারেন, তার গ্রন্থ ইন্দ্রের কাছে পরাভব থেকে বাঁচবার পথ দেখাবে? বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না। নিজের গ্রন্থের উৎকর্ষের কথা তো বলবেন অন্যেরা, নিজে মুখে সে কথা প্রচার করলে তা হাস্যকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিষ্ণুশর্মার মতো নির্লোভ জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিত মানুষের মুখে বড়ই বেমানান ও অসংলগ্ন বলে মনে হয়।

কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তবু কথামুখের ভাষ্যটি পড়ে মনে হয়, এটি কোনোভাবেই বিষ্ণুশর্মার উক্তি নয়। তার কোনো শিষ্য কিংবা পরবর্তীকালের কোনো পুথিকার পঞ্চতন্ত্রের গৌরব ও বিষ্ণুশর্মার অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য এই কাহিনী যুক্ত করেছেন। রাজা-অমাত্য-তিন ছেলের কাহিনীটি শুধুই যেমন একটি কল্পকাহিনী, তেমনি এই অংশটিও প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। এরকম বহু কাহিনীই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে পরবর্তীকালে।

কথামুখের এই গল্পটি কল্পকাহিনী হলেও এর মধ্যে একটি সত্য লুকিয়ে রয়েছে। লোকসমাজের অভিজ্ঞতায় আলোকিত লোককথার মাধ্যমে যত সহজে সুন্দরভাবে প্রাণময় করে শিক্ষাদান সম্ভব, তা অন্য কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আশি বছরের কথা রয়েছে, কেননা বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া পণ্ডিত এই সত্যটি উপলব্ধি করেছেন। লোককথার এই লোকশিক্ষার আশ্চর্য ক্ষমতা রয়েছে বলেই বাল্মীকি রামায়ণ কাব্য রচনার সময় বেছে নেন লোকসমাজের রামকথাকে, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ ভীষ্ম দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে বোঝাবার জন্য শোনান লোককথা, ক্রীতদাস ঈশপ ব্যক্তিগত জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা-ক্ষোভ-অপমান-প্রতিবাদের কথা প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত করতে আশ্রয় নেন কৃষকের লোককথার, গৌতম বুদ্ধ-কনফুসিয়াস-লাও সে-মুশা-যিশুখ্রীস্ট-পার্শ্বনাথ-জরোথুস্ট্রের মতো ধর্মগুরু ও নীতিশিক্ষক ক্লান্তিহীনভাবে অসংখ্য লোককথা শোনান। লোককথার যে আশ্চর্য সঞ্জীবনী ও সম্মোহনী শক্তি রয়েছে তা এরা উপলব্ধি করেছিলেন। পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতাও এই বোধ থেকেই রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্মনীতি-ব্যবহারনীতি প্রভৃতি জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে তুলতে লোককথাকেই বেছে নিয়েছেন। বেদ-উপনিষদ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে অনেক নীতিবাক্য রয়েছে, রয়েছে কিছু কাহিনীও। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রকার সেসবের ওপর আদৌ নির্ভর করেন নি, সেইসব নীতিকথাকে নিজের গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তও করেন নি। লোকসমাজের সম্পদকেই তিনি আগাগোড়া ব্যবহার করেছেন। সামাজিক অভিজ্ঞতা ও লোকমানস সম্পর্কে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গভীর ও ব্যাপক ছিল বলেই তিনি লোককথার আশ্রয় নিয়েছেন।

পঞ্চতন্ত্রের নীতিকথাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখব, লোকসমাজের অভিজ্ঞতা ও মানসিকতা তাদের নিজস্ব সামাজিক অনুভূতি থেকে জন্ম নিয়েছে। এই অনুভূতির কথা অন্য কোনো সমাজের বিদগ্ধ জন কোনোভাবেই প্রকাশ করতে পারেন না। যে নির্মম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই বোধ জাগে তা একান্তই লোকসমাজের। লোককথাগুলো শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ নয়, এর মধ্যে লোকসমাজের বেদনাময় সংগ্রামশীল রূঢ় বাস্তবের ঐতিহাসিক রূপটি লুকোনো রয়েছে। দারিদ্র্য-বঞ্চনা-উৎপীড়ন-অপূর্ণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জীবন-যুদ্ধের জ্বালা লোকসমাজের সর্বক্ষণের সঙ্গী। লোককথাগুলো এসবেরই সাহিত্যিক বহিঃপ্রকাশ, রূপকের আড়ালে জীবনের কথা।

পঞ্চতন্ত্রের অসাধারণত্বে থিওডর বেনফে এমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি এমন সব উক্তি করেছেন যা অনেকের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে। পরবর্তী গবেষণায় তার অনেক তত্ত্ব হয়তো বাতিল হয়ে গিয়েছে কিন্তু পঞ্চতন্ত্র সম্পর্কে তার মুগ্ধতারও অনেক বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। তার মাইগ্রেশন তত্ত্বটি হয়তো সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু অন্য অনেক ধারণাই আজও সত্য বলে স্বীকৃত। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত পঞ্চতন্ত্রের ভূমিকায় বেনফে লিখেছেন, As far as the sources and the dissemination of the stories contained in the Panchatantra are concerned, it is clear that in general most of the animal fables originated in the Occident and are in greater or less degree transformations of the so-called Aeshop fables……the Indic fable treated the animals without regard to their special nature, as if they were merely men masked in animal form. My investigations in the field of fables, Marchen, and tales of the Orient and Occident have brought me to the conviction that few fables, but a great number of Marchen and other folktales have spread outword from India almost over the entire world.……It is the Marchen we have spoken of which create the inexhaustible, ever-bubbling fountain at which all the people, high and low, but especially those who have no other springs of spiritual enjoyment, continually refresh themselves anew.

একসময় বলা হত পঞ্চতন্ত্র হল 'চিফ্ সোরস্ অব দ্য ওয়ার্লডস্ ফেব্‌ল্ লিটারেচার'। হয়তো অতিশয়োক্তি রয়েছে, কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু রয়েছে যাতে একদিন একথা উচ্চারিত হতে পেরেছিল। পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে সেই 'এমন কিছু' কি রয়েছে?

নীতিশিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুশর্মা কিছু লোককথাকে বেছে নিলেন। তারপরে অপরূপ বৈদগ্ধ্যে এক অনন্য সম্পাদিত গ্রন্থ সৃষ্টি করলেন। এমন অসাধারণ সম্পাদনা দুর্লভ। বিচ্ছিন্ন লোককথাগুলোকে তিনি একটি মালায় গেঁথে তুললেন, একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করলেন। এই সম্পাদনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

বিষ্ণুশর্মার গ্রন্থ পাঁচটি তন্ত্রের সমাহার। মিত্রভেদম্, মিত্রপ্রাপ্তিকম্, কাকোলূকীয়ম্, লব্ধপ্রণাশম্ ও অপরীক্ষিত-কারকং। ৮৪ টি লোককথাকে তিনি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করলেন। এই তন্ত্রভাগের মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তা ও গভীর মননের পরিচয় রয়েছে, যা কোনোভাবেই লোকসমাজের সরল মননজাত হতে পারে না। এই ভাগগুলি পঞ্চতন্ত্রকে বিশিষ্ট করে তুলল।

লোকসমাজ লোককথা বলেন। বিশেষ বিশেষ অনুভূতি প্রকাশের জন্য এসবের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিমানুষ এর স্রষ্টা হলেও সমগ্র সমাজের সম্পদ বলে এগুলো গণ্য হয়। এগুলো তাই সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি। আলাদা আলাদাভাবে লোককথা গড়ে ওঠে। একের সঙ্গে অন্যের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

কিন্তু বিষ্ণুশর্মা এক নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু দেশে লোককথা সংগ্রহে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুশর্মাই বোধকরি এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

একটি লোককথা শুরু হল। মাঝখানে অনেকগুলো কাহিনী মালার মতো গাঁথা রইল। তারপরে একেবারে শেষে গিয়ে প্রথম লোককথাটির সমাধান ঘটবে। মাঝে-মধ্যে অবশ্য প্রথম কাহিনীটির কিছু কিছু অংশের উল্লেখ থাকে। এর ফলে প্রথম লোককথাটি পড়তে শুরু করলে মাঝের সবগুলো পড়ে ফেলতে হবে শেষের অংশটি জানবার জন্য। এক অদ্ভুত আগ্রহ টেনে নিয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। এমনিতেই লোককথা শুনবার একটা আলাদা আকর্ষণ থাকে যা লোকসমাজের রসিক মনের সৃষ্টি। তার ওপরে বাড়তি আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন বিষ্ণুশর্মা। যারা এগুলি পড়েছেন তারাই উপলব্ধি করবেন এই আকর্ষণ কত দুর্দমনীয়। আধুনিক কালের কিছু চিত্রকাহিনীতে এই প্রাচীন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি বিষ্ণুশর্মার চিন্তাজাত।

পঞ্চতন্ত্রে এইরকম পাঁচটি গল্পমালা রয়েছে। পদ্ধতিটি বড়ই আকর্ষণীয়। মিত্রভেদ তন্ত্রটি আলোচনা করছি।

দাক্ষিণাত্যে এক জনপদে মহিলারোপ্য নামে এক নগর ছিল। সেই নগরে থাকতেন এক বণিক। তার নাম বর্ধমান।

ধর্মপথে ব্যবসা করে তিনি খুব ধনী হয়েছিলেন। একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে তিনি চিন্তা করলেন, অর্থের দ্বারা সব কিছুই হয়, তাই অন্য সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আরো অর্থ উপার্জনে মন দেওয়াই ভালো। যার অর্থ আছে, তার থাকে অনেক বন্ধু, আত্মীয়। যে অর্থবান সেই সত্যিকার পুরুষ ও সর্বজ্ঞ। এমন কোনো শিল্পকলা নেই, এমন কোনো বিদ্যা নেই যা তার অজানা। যার অর্থ আছে পরও তার আপনজন হয়, যে অর্থহীন তার স্বজনই বা কি দুর্জনই বা কি! অর্থের পাহাড় জমলে সবকিছুই করা যাবে। অর্থের জোরে মানী না হয়েও সে মান পায়, অর্থের কতই না যাদুশক্তি! অর্থের আশায় মানুষ শ্মশানেও পড়ে থাকে, নিঃস্ব ধনহীন পিতাকে লোকে ত্যাগ করে। অর্থ থাকলে বৃদ্ধও যুবক হয়ে ওঠে, অর্থহীন মানুষ যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে যায়।

সেই অর্থ পেতে হলে ছটি পথ রয়েছে। ভিক্ষা রাজসেবা কৃষিকাজ বিদ্যার্জন মহাজনী ও ব্যবসাবাণিজ্য। এর মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য করে যে অর্থ উপার্জন করা যায় তাই সবচেয়ে সম্মানজনক। কেননা, নীচলোকে ভিক্ষা করে, রাজা ন্যায্য প্রাপ্য দেন না, কৃষিতে খুব কষ্ট, বিদ্যাশিক্ষা কষ্টকর, একে কড়া নিয়ম মেনে চলতে হয় আবার গুরুর কাছেও নত হয়ে থাকতে হয়, মহাজনী কারবারে সুদের জন্য অন্যের কাছে অনেক অর্থ রাখতে হয়—সে অর্থ মারা যেতে পারে,—তাই ব্যবসার চেয়ে ভালো অন্য কিছু পৃথিবীতে আছে বলে আমার মনে হয় না। আর ব্যবসার মধ্যে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে রাখাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট, অন্য উপায়গুলো অনিশ্চিত। যাতে প্রভূত অর্থোপার্জন হয় সেই ব্যবসা সাতরকমের। গন্ধদ্রব্যের ব্যবসা, বন্ধকী কারবার, যৌথ ব্যবসা, দোকান করা, জিনিসের দাম বাড়িয়ে বলা, ওজন ঠকানো আর অন্য স্থান থেকে জিনিস নিয়ে আসা।

অনেক ভেবেচিন্তে বণিক ঠিক করলেন, তিনি মথুরায় যাবেন। যে পণ্যের চাহিদা আছে তা কিনে আনবেন। এই ভেবে গুরুজনদের আশিস নিয়ে শুভদিনে ভালো গাড়িতে চড়ে রওনা দিলেন। তার বাড়িতেই জন্মেছিল দুটি সুলক্ষণযুক্ত ষাঁড়। তাদের নাম সঞ্জীবক ও নন্দনক। দুজনের কাঁধে জোয়াল চাপিয়ে বণিক রওনা দিলেন।

কাহিনীর এই অংশ পর্যন্ত লৌকিক উপাদান নেই। লোককথায় জীবন-দর্শন থাকে কিন্তু তা এমন তাত্ত্বিকভাবে কখনই প্রকাশিত হয় না। ব্যবসা-সংক্রান্ত এত সূক্ষ্ম বিভাজন লৌকিক জীবনে সম্ভব নয়। ব্যবহারনীতি শেখাতে বিষ্ণুশর্মা

নিজেই এই তত্ত্বকথা সৃষ্টি করেছেন। কাহিনীর পরের অংশে কিছুটা লোক-উপাদান রয়েছে।

বণিক চলেছেন গোরুর গাড়িতে। হঠাৎ যমুনার জলাভূমিতে গভীর কাদায় পা মচকে পড়ে গেল সঞ্জীবক। আর উঠতে পারে না সে। বর্ধমানের খুব কষ্ট হল। বড় আদরের গোরু। তিনি তিনদিন সেখানেই থেকে গেলেন।

তখন সঙ্গী অন্য বণিকরা বললেন, এ বনে বাঘ-সিংহ আছে, আরও কত বিপদ-আপদ আছে কে জানে। একটা ষাঁড়ের জন্য আপনি সবাইকেই বড় বিপদে ফেললেন। কথায় বলে, যে বুদ্ধিমান সে সামান্য কিছুর জন্য অনেক কিছু হারায় না, তাকেই পণ্ডিত বলে যে একটু ছেড়ে অনেক কিছু ধরে রাখে।

বণিক ভাবলেন, কথাটা ওরা ঠিকই বলেছে। তখন তিনি কয়েকজন ভৃত্যকে সেখানে রেখে বণিকদের সঙ্গে এগিয়ে চললেন।

এদিকে ভৃত্যেরা ভাবল, বনে কত আপদ-বিপদ ঘটতে পারে, তাই সঞ্জীবককে ফেলে তারাও রওনা দিল।

শেষকালে দলের কাছে পৌঁছে বণিককে বলল, গোরু মরে গিয়েছে। আপনার আদরের প্রাণী, তাই তাকে দাহ করে দিয়েছি।

একথা শুনে বণিক আনন্দিত হলেন, তার আদরের গোরুর ভালো সৎকার হয়েছে।

এর পরের অংশ থেকেই শুরু হল আসল লোককথা। এই অংশ থেকেই লৌকিক উপাদান লক্ষ্য করা যাবে। লোককথার মেজাজটি ধরা পড়েছে এখানে।

সঞ্জীবক কিন্তু মরেনি। যমুনার ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে সেরে উঠল। আস্তে আস্তে নদীর তীরে এল। সেখানে কচি কচি ঘাস খেয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই শিবের ষাঁড়ের মতো তেজী হয়ে উঠল। তখন সে রোজ তার শিং দিয়ে উইঢিপির চূড়ো ভেঙে দিয়ে বিকট গর্জন করত।

সেই বনে ছিল এক সিংহ। তার নাম পিঙ্গলক। তার আশেপাশে থাকত অনেক জন্তু-জানোয়ার। একদিন তাদের জলতেষ্টা পেয়েছে। দল নিয়ে সিংহ চলল যমুনায়। এমন সময় শুনতে পেল সঞ্জীবকের বিকট গর্জন। ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সিংহ। কিন্তু সে পশুরাজ, ভেতরে কাঁপতে থাকলেও চোখ-মুখে প্রকাশ করল না। বটগাছের তলায় সবাইকে নিয়ে বসে রইল। শত্রু এলে আক্রমণের জন্য তৈরি থাকল।

সিংহের আশেপাশে ঘুর-ঘুর করত দুই শেয়াল। তারা মন্ত্রীপুত্র। কিন্তু তখন চাকরি নেই। তাদের নাম করটক ও দমনক। তারা দুজনে ফন্দি আঁটল। দমনক বলল, ভাই, তাকিয়ে দেখ আমাদের প্রভু জল খেতে যমুনায় নেমেছিল, খুব তেষ্টা পেয়েছিল, কিন্তু জল না খেয়েই ফিরে এসে বটগাছের তলায় ব্যূহরচনা করে বসে রয়েছে। কি হল বোঝা যাচ্ছে না তো?

করটক বলল, ভাই, কি দরকার ওসব ঝামেলায় গিয়ে ? মাথা ঘামিয়ে লাভ কি ? কথায় বলে, অকারণে কোনো কিছুতে নাক গলাবে না। নইলে খোঁটা-খুলে-যাওয়া বানরের মতো মরতে হবে।

অব্যাপারেষু ব্যাপারং যো নরঃ কর্তুমিচ্ছতি।
স এব নিধনং যাতি কীলোৎপাটীব বানরঃ ॥

দমনক বলল, সেটা কিরকম ?

বণিক-সঞ্জীবক-নন্দনক-পিঙ্গলক-দমনক-করটক কাহিনীর এক অংশ এখানেই শেষ হল। দমনক বানরের গল্প শুনতে চাইল। করটক শুরু করল খোঁটা-খুলে-যাওয়া বানরের বিপদের গল্প। এই পশুকথার রেশ ধরে শেয়াল ও দামামা, তাঁতি ও ছুতোর, বক ও কাঁকড়া, খরগোশ ও সিংহ, উকুন ও ছার-পোকা, নীলবর্ণ শেয়াল, কাক উট ও সিংহ, সাগর ও তিতির পাখি, হাঁস ও কচ্ছপ, অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমতি, চড়ুই কাঠঠোকরা মাছি ব্যাঙ ও হাতি, সিংহ শেয়াল ও উট, ধর্মবুদ্ধি ও পাপবুদ্ধি, জীর্ণধন ও শ্রেষ্ঠী, বক ও নেউল প্রভৃতি বাইশটি লোককথা শোনানো হল। এই সব লোককথার মাঝে মাঝে দমনক-পিঙ্গলকের কাহিনীও এগিয়েছে। তারপরে মিত্রলাভ অংশের শেষে এসে প্রথম গল্পের সমাধান ঘটল।

মাঝে মাঝে প্রথম গল্পের যে উল্লেখ রয়েছে তা না জানলে শেষাংশ বোঝা যাবে না। অর্থাৎ পাঠক যে একটি তন্ত্রর প্রথম ও শেষাংশ পড়েই কাহিনীটি জেনে নেবে তার কোনো উপায় রাখেননি সম্পাদক বিষ্ণুশর্মা। পুরো তন্ত্র পড়েই কাহিনী জানতে হবে। কাহিনীর যাদুকরী শক্তি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সম্পাদকের মুন্সিয়ানা। বাইশটি কাহিনীর মধ্যে থেকে পিঙ্গলক-দমনকের কাহিনী উদ্ধার করলে লোককথাটি হবে এইরকম :

দমনক বলল, সেটা কিরকম ?

করটক বলল, আমরা গন্যিমান্যি লোক নই, পরের ব্যাপারে নাক না গলানোই ভালো।

দমনক বলল, অমন কথা বলবে না। যে লোক রাজার কাছাকাছি থাকে, সেই রাজার প্রিয়পাত্র হয়। রাজা খুশি হলে অনেক কিছু পাওয়া যায়।

করটক বলল, তা এখন তুমি কি করতে চাও ?

দমনক বলল, আমাদের প্রভু পিঙ্গলক আজ ভয় পেয়েছে। তার সঙ্গের পশুরাও ভয় পেয়েছে। আমরা প্রভুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, ভয়ের কারণ কি।

করটক বলল, তা ভাই তুমি জানলে কেমন করে যে প্রভু ভয় পেয়েছে ?

এ জানা আর এমন কি শক্ত ? ওদের ভাবসাব দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি ওরা খুব ভয় পেয়েছে।

আচ্ছা, প্রভুর কাছে গিয়ে তুমি কি বলবে শুনি ?

ভয় নেই, আমি উলটো-পালটা কিছুই বলব না। প্রভুর মন-মেজাজ বুঝে চলব।

করটক তখন বলল, তোমার পথে তুমি যাও, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি ওদিকে মোটেই যাব না।

দমনক একাই চলল পিঙ্গলকের দিকে। দমনককে আসতে দেখে পিঙ্গলক পাহারাদারকে বলল, লাঠি সরিয়ে নাও, আমাদের বহুকালের পুরনো বন্ধু মন্ত্রীর ছেলে দমনক আসছে। ও খুব খাঁটি কথা বলে, ওকে ঢুকতে দাও।

দমনক এগিয়ে সিংহকে প্রণাম করল। সিংহ তাকে বসতে বলল। তারপরে বলল, ভালো আছো? কতকাল তোমায় দেখিনি।

দমনক বলল, আমার মতো লোককে আর কি প্রয়োজন পশুরাজ? তবে সময় হয়েছে, এখন রাজার সবাইকেই দরকার। আমরা হলাম পশুরাজের ভৃত্য, বিপদে-আপদে পশুরাজের পাশেই থাকি। বলাটা ঠিক না, তবু বলছি, মহারাজ এটা ঠিক করলেন না।

সিংহ বলল, কি বলতে চাও বলো তো তুমি? ভয় নেই, যা বলার তা বলতে পার।

সবার সামনে কি সব কথা বলতে আছে? পশুরাজের কানে একা একা কথাটা বলতে চাই।

সেই কথা শুনে বাঘ চিতা নেকড়ে আর অন্য সব পশু দূরে সরে গেল। দমনক আস্তে আস্তে বলল, জল খেতে গিয়ে ফিরে এলেন কেন?

বোকার মতো হেসে সিংহ বলল, না, তেমন কিছু না, এমনি ফিরে এলাম।

যদি বলতে না চান, তাহলে শুনতে চাই না।

সিংহ ভাবল, একে বলাই ভালো। মুখে বলল, আচ্ছা, দূর থেকে তুমি কি কোনো বিকট আওয়াজ শুনতে পেয়েছ? এখনও শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি, পশুরাজ। আগেও শুনেছি।

সিংহ বলল, এ বনে আমি আর থাকতে চাই না।

কেন?

কেননা এই বনে একটা অদ্ভুত জন্তু এসেছে। ঐ জন্তুই এই বিকট গর্জন করছে। যে এমনভাবে গর্জন করতে পারে, তার দেহের জোর কেমন হবে ভেবে দেখ।

শুধু গর্জন শুনেই এত ভয় পেয়ে গেলেন? এটা কিন্তু ঠিক কথা মনে হচ্ছে না। ধৈর্য ধরুন পশুরাজ, শুধু গর্জন শুনেই ভয় পাবেন না।

সিংহ বলল, বেশ, ভয় পাব না।

দমনক তখন বলল, সাহস করে আপনি এখানেই বসে থাকুন। আমি গিয়ে জেনে আসি, গর্জনটা কিসের। তারপরে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

বেশ, যেয়ে দেখে এসো, আমি এখানেই রইলাম।

এদিকে শেয়াল সেই ষাঁড়ের কাছাকাছি গিয়ে দেখল, একটা ষাঁড় অমন করে চিৎকার করছে। তার হাসি পেল। ফন্দি আঁটল, এর সঙ্গে সিংহের ভাব করে দেবে, তারপরে বাধাবে ঝগড়া। এই ভেবে শেয়াল সিংহের কাছে ফিরে গেল। বলল, যে গর্জন করছে, তাকে আপনার ভৃত্য বানিয়ে দিতে পারি।

সিংহ বলল, তাই নাকি? তাহলে তোমায় মন্ত্রী করে দিলাম।

সিংহের কথা শুনেই শেয়াল দৌড়ল ষাঁড়ের কাছে। তাকে ভয় দেখিয়ে, সিংহের রাগের কথা মিথ্যে মিথ্যে বলে ডেকে নিয়ে চলল সিংহের কাছে। ষাঁড় ভাবল, এবার তার প্রাণ যাবে, পশুরাজ রেগেছে। কাঁপতে কাঁপতে ষাঁড় বলল, ভাই, তোমাকে দেখে তো খুব ভালো লোক বলেই মনে হচ্ছে। তা তুমি দেখ, সিংহ যেন আমার কোনো ক্ষতি না করে।

শেয়াল ষাঁড়কে মাঝপথে দাঁড় করিয়ে রেখে আবার সিংহের কাছে গেল। বলল, প্রভু, ঐ জন্তুটা কিন্তু আজেবাজে এলেবেলে নয়, একেবারে শিবের ষাঁড়। শিব ওকে যমুনার তীরে কচি কচি ঘাস খেয়ে বেড়াতে বলেছেন।

সিংহ বলল, তাই বলি, দেবতার অনুগ্রহ ছাড়া কি সামান্য একটা ষাঁড় এই রকম গর্জন করতে পারে? নির্ভয়ে বনে ঘুরে বেড়াতে পারে? তা সে কি বলল?

শেয়াল বলল, প্রভু, আমি বললাম চণ্ডিকার বাহন পিঙ্গলক থাকে এখানে, এটা তার রাজ্য। আপনি আমাদের অতিথি। চলুন, সিংহের সাথে একসঙ্গে ভাইয়ের মতো থাকবেন। সে-ও খুশি হয়ে রাজি হল। এখন আপনার মত চাই।

খুব ভালো কথা। আমার মনের মতো কথাই বলেছ। সত্যি, তোমার খুব বুদ্ধি। তুমি মন্ত্রী হওয়ারই যোগ্য। আমি তাকে অভয় দিচ্ছি। সে-ও যেন আমায় অভয় দেয়। যাও, তাকে তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে এসো।

শেয়ালকে তখন আর দেখে কে! সে রওনা দিল। ভাবল, প্রভু মুখ তুলে চেয়েছেন, আর ভাবনা নেই। আমি ধন্য।

ষাঁড়কে শেয়াল বলল, প্রভুর কাছ থেকে তোমার জন্য অভয় চেয়ে নিয়েছি। তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে শর্ত মেনে চলতে হবে। আমি মন্ত্রী হয়ে তোমার পরামর্শ নিয়ে রাজ্য চালাব। আমায় কিন্তু কখনও হেলাফেলা করবে না। মনে থাকবে তো?

এই কথা বলে শেয়াল ষাঁড়কে নিয়ে সিংহের কাছে গেল। দুজনে পরম বন্ধু হয়ে গেল। সিংহ এই দমনক ও করটকের ওপর রাজ্যের ভার দিয়ে দিল। আর সে ষাঁড়ের কাছে গল্প শুনত। কয়েক দিনের মধ্যেই সিংহ বেশ পণ্ডিত হয়ে উঠল। দুজনে একসঙ্গে থাকে, অন্য সব পশু দূরে দূরে থাকে, কাছে

যাওয়ার আদেশ নেই। এমন কি দমনক করটকও সেখানে যেতে পারে না। সিংহ কেমন পোষা জন্তুর মতো হয়ে গেল। বিক্রম নেই, শিকার নেই,—তাই খিদের জ্বালায় সব পশু সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

দুই শেয়াল পরামর্শ করতে লাগল। করটক দমনককে দোষ দিতে লাগল, তার জন্যেই এরকম হল। এখন দমনক এমন ফন্দি আঁটল যাতে সিংহ ও ষাঁড়ের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। বুদ্ধি করে বন্ধুত্ব ভেঙে দিতে হবে।

সুযোগ খুঁজছে শেয়াল। একদিন দেখল, সিংহ একা রয়েছে। তার কাছে গিয়ে বলল, প্রভু, আমাকে তো আপনার কোনো দরকার নেই, তাই আসি না। কিন্তু আপনার বিপদ আসছে বুঝে না এসে থাকতে পারলাম না। আতঙ্কে বুক ফেটে যাচ্ছে। ষাঁড় আপনার অনিষ্ট করতে চায়। আমায় বিশ্বাস করে একদিন ডেকে বলল, আমি ঠিক করেছি সিংহকে মেরে ফেলব, তারপর সব পশুর রাজা হব। আর আমাকে করবে মন্ত্রী।

সিংহ প্রথমে একথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু শেয়াল নানাভাবে সিংহকে তাতিয়ে তুলল। ষাঁড়কে মেরে ফেলতে নানা পরামর্শ দিল।

তারপর ষাঁড়ের কাছে গিয়েও বলল, সিংহ তোমাকে মেরে ফেলতে চায়। তাড়াতাড়ি তাই জানাতে এসেছি। ভীষণ রেগে গিয়েছে সিংহ।

শেষ পর্যন্ত দুজনের মধ্যে এমন শত্রুতা গড়ে উঠল যে, একদিন ষাঁড় সিংহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নেমে গেল, একটুক্ষণ যুদ্ধ করে সে সিংহের থাবার আঘাতে মরে গেল। সিংহ শোক ভুলে শেয়ালকে মন্ত্রী করে রাজত্ব করতে লাগল।

এই পশুকথাটি যেভাবে এখানে বলা হল বিষ্ণুশর্মা কিন্তু সেভাবে বলেন নি। মিত্রভেদের প্রথমে গল্পটি শুরু হয়ে অন্যান্য গল্পের মাঝেমাঝে এগিয়েছে, একেবারে শেষে গিয়ে সমাধান হয়েছে। এই রীতি লোকসমাজে প্রচলিত নেই, সম্পাদনার সময় এই রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

সম্পাদক অসংখ্য সুভাষিতের ব্যবহার করেছেন। সবগুলিই কাব্যে গ্রথিত। লোককথায় দু-চার ছত্রের ছড়া যে থাকে না তা নয়, কিন্তু সাধারণত লোককথায় এই পদ্ধতির বিশেষ উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। বাংলা লোককথায় কিছু ছড়ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। নাইজিরিয়ার আদিবাসীদের মধ্যেও এই প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু এর ব্যাপক প্রয়োগ লোককথায় নেই। অন্যদিকে পঞ্চতন্ত্রের প্রতিটি কাহিনীতেই একাধিক সুভাষিত রয়েছে। এটি বিষ্ণুশর্মার আর একটি বৈশিষ্ট্য।

এই সুভাষিতগুলির মধ্যে একদিকে রয়েছে রাজনীতি কুটনীতি লোকনীতি ও জীবনে চলার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সারমর্ম আর অন্যদিকে কিছু সুভাষিততে রয়েছে উচ্চাঙ্গ দর্শনের প্রকাশ। এই দর্শন কিন্তু জীবনবিমুখতার প্রকাশ নয়, সেই দর্শন যা জীবনকে আরও অভিজ্ঞ ও আনন্দময় করে তোলে। জীবনে চলার পথে এই জটিল সংসারে মানুষকে কত বিপদ-আপদ, প্রতিকূলতার

সামনে পড়তে হয়, মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে, সম্মুখের পথ যেন মনে হয় আঁধারে ঢাকা, মুক্তির পথ নেই,—এইরকম মানসিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংকট থেকে বাঁচবার জন্যই যেন সুভাষিতের প্রয়োগ। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল আলোর নিশানা। পঞ্চতন্ত্রের পাত্রপাত্রী হয়তো কোনো জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, কোন পথে এগোলে নিজের কল্যাণ হবে বুঝতে পারছে না,—তখন একটি সুভাষিত তাকে সমাধানের পথ দেখাচ্ছে। তাই সুভাষিত জানলে অনেক সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান করা যায় ...। পঞ্চতন্ত্রকার বিশ্বাস করতেন। তিনি এই জানাকে সামাজিক গুণ হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছেন। সুভাষিত সম্পর্কে যে সামাজিক মানুষ অজ্ঞ তাকে ভর্ৎসনাও করেছেন।

সুভাষিতময়দ্রব্যসংগ্রহং ন করোতিঃ যঃ।
স তু প্রস্তাবযজ্ঞেষু কাং প্রদাস্যতি দক্ষিণাম্॥
সকৃদুক্তং ন গৃহ্লাতি স্বয়ং বা ন করোতি যঃ।
যস্য সম্পুটিকা নাস্তি কুতস্তস্য সুভাষিতম্॥

এই সুভাষিত কখনও বলা হয়েছে খুব হালকাভাবে, শুনে হাসি পায়। আবার কখনও বলা হয়েছে গভীর দার্শনিক ভঙ্গিতে।

লোককথার মধ্যে কিংবদন্তি ও লোকপুরাণ অংশে কিছু কিছু ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম থাকে। কিন্তু পশুকথা-রূপকথায় সাধারণত কোনো নাম থাকে না। এক যে ছিল রাজা, কোনো এক বনে থাকত এক সিংহ,—এইরকমভাবেই পশুকথা-রূপকথা বলা হয়। লোকসমাজ থেকে যে হাজার হাজার পশুকথা-রূপকথা সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে কোথাও এই নাম ব্যবহৃত হয়নি। পঞ্চতন্ত্রে রয়েছে অধিকাংশই পশুকথা, অল্প রূপকথা, তবু প্রায় প্রতিটি আখ্যানেই ব্যক্তিনাম ও স্থাননাম রয়েছে। পশুকথা-রূপকথাগুলি লোকসমাজ থেকে সংগৃহীত হলেও এগুলিকে সম্পাদনা করার সময় বিষ্ণুশর্মা নাম ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সমস্ত নামই পাত্রপাত্রীর গুণবাচক। অবশ্য প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্য-সাহিত্যে এই গুণবাচক নামেরই আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, গুড়াকেশ, কৃষ্ণ, ভীম, ভীষ্ম, দুঃশাসন, সুগ্রীব প্রভৃতি। পঞ্চতন্ত্রেও এই গুণবাচক নামের ছড়াছড়ি। অনেক সময় এমন নাম ব্যবহৃত হয়েছে যা কোনোভাবেই কারও নাম হতে পারে না। পিতা কখনও তার সন্তানের নাম পাপবুদ্ধি রাখতে পারেন না। নামগুলো উচ্চারণ করলেই বোঝা যাবে নামগুলি রাখার পিছনে সম্পাদকের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ নামের মধ্যেই তার চারিত্রিক স্বভাব বা গুণের পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে। যেমন, অমরশক্তি, উগ্রশক্তি, অনেকশক্তি, সঞ্জীবক, ধর্মবুদ্ধি, চণ্ডরব, মদোৎকট, কম্বুগ্রীব, অনাগতবিধাতা, পত্যুৎপন্নমতি, যদ্‌ভবিষ্য, বজ্রদংষ্ট্র, চতুরক, সূচিমুখ, লঘুপতনক, হিরণ্যক, তীক্ষ্ণবিষাণ, প্রলোভক, অরিমর্দন,

চতুর্দন্ত, অতিদর্প, খরনখর, রক্তমুখ, করালমুখ, করালকেশর, ধূসরক, কামাতুর, মন্দমতি প্রভৃতি।

পঞ্চতন্ত্র সম্পাদনা করবার সময়ে বিষ্ণুশর্মা তৎকালীন সমাজ-ভাবনার দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। নারীর ব্যভিচার সম্পর্কে পঞ্চতন্ত্রে কয়েকটি কাহিনী আছে। লোককথার লোকপুরাণ অংশে নারী-পুরুষের ব্যভিচার সম্পর্কে অনেক কাহিনী রয়েছে, বিশেষ করে ভারতবর্ষ গ্রীস রোম মিশর ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ে। কিন্তু লোককথার অন্য অংশে নারীর এই বিকৃতি সম্পর্কে তেমন কোনো উল্লেখ দেখতে পাই না। সেখানে সৎ মায়ের নিষ্ঠুরতা কিংবা ছোট রানী বা অন্য একজন রানীর নির্মম হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বেশি কিছু নয়। এই গ্রন্থের প্রথম অংশে মিশরের রূপকথাটিতে নারীর ব্যভিচারের কথা রয়েছে। কিন্তু এগুলো ব্যতিক্রম।

বিষ্ণুশর্মা মনুসংহিতা ও কিছু স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাবে নারী সম্পর্কে কদর্য ইঙ্গিত দিয়েছেন, অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। নারী তো একা ব্যভিচারিণী হতে পারে না, তার জন্য আর একজন ব্যভিচারী পুরুষ দরকার। কিন্তু বিষ্ণুশর্মা সেই পুরুষের বিকৃতি সম্পর্কে কোনো উক্তি করেন নি। সেকালের সমাজের মানসিকতাই তাই ছিল। নইলে ভীষ্মের মতো প্রাজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কেমন করে মহাভারতের স্ত্রীপর্বে নারী সম্পর্কে অমন অপমানকর উক্তি করলেন? বিষ্ণুশর্মা নারীর ব্যভিচারের গল্প বললেন, সেটাও মেনে নেওয়া যায়। কেননা, একজন বিশেষ নারী ব্যভিচারিণী হতেই পারে, তিনি তারই কাহিনী শুনিয়েছেন। কিন্তু সেই গল্পের মাঝখানে তিনি সুভাষিত অংশে সমগ্র নারীজাতির বিরুদ্ধেই সাধারণভাবে এই উক্তি করে বসলেন। লোককথার ঐতিহ্য থেকে তিনি সরে এলেন। এই মানসিকতা সম্পূর্ণভাবে সম্পাদকের।

দন্তিল ও গোরম্ভ নামে মিত্রভেদের তৃতীয় গল্পে বিষ্ণুশর্মা বলেছেন, আগুনে যতই কাঠ দাও, আগুন আরও আরও কাঠ চায়, হাজার নদী মিশে যাক সাগরে তবু সাগরের তৃপ্তি নেই,—তেমনি নান্তকঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা, সমস্ত প্রাণীকে খেয়েও যেমন অন্তক অর্থাৎ যম চির-অতৃপ্ত থাকে, যতই পুরুষ-সংসর্গ ঘটুক না কেন নারীর তৃপ্তি নেই। নারী সতী হয় বাধ্য হয়ে, সুযোগ পেলেই সে হবে অসতী। সুযোগের অভাবে, প্রার্থীর অভাবে এবং নিভৃত স্থানের অভাবেই নারী সতী সেজে থাকে। কোনো নারী কোনো পুরুষকেই ভালোবাসে না। স্বামীর কাছাকাছি থাকলেও মনে মনে ধ্যান করে অন্য পুরুষের। সামান্য তোয়াজ করলেই নারী প্রেমে পড়ে। নারীর কোনো সীমাজ্ঞান নেই। আত্মীয়-পরিজনের ভয়েই নারী সংযত থাকতে বাধ্য হয়। তারা যে কোনো পুরুষের সঙ্গেই ব্যভিচার করতে পারে, কুৎসিত রূপবান বৃদ্ধ অর্থাৎ পুরুষ হলেই হল। প্রেমিক পুরুষকে নিয়ে মজা করতে নারীরা খুব পারঙ্গম, তাদের নিয়ে খেলা করতে তাদের খুব আনন্দ।

লোকসমাজ তাদের মৌখিক সাহিত্যের মধ্যে কোনোভাবেই নারী সম্পর্কে এ ধরনের মানসিকতার প্রকাশ ঘটান নি। মনু-ভীষ্মের উক্তির প্রতিধ্বনি যেন।

সন্ন্যাসী, ধূর্ত, শেয়াল ও দুজন দুষ্টার কাহিনীতে আবার বলা হয়েছে, সব নারী সব যাদু জানে। দরকারমতো এরা পুরুষকে হাত করে। নারীর প্রতি বেশি আসক্ত হতে নেই, নারীর বুদ্ধি নিতে নেই। কেননা, মধু তিষ্ঠতি বাচি যোষিতাং হৃদয়ে হালহলং মহদ্বিষম্। ছলনা বোকামি অতিলোভ অসাধুতা নির্মমতা মিথ্যাচার দুঃসাহস প্রভৃতি দোষ নারীর স্বভাবের মধ্যেই থাকে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী গল্পে এক পুংশ্চলী স্ত্রীর কথা আছে। দেবীর মন্দিরে পুজো দিয়ে সে প্রার্থনা করেছিল, তার স্বামী যেন অন্ধ হয়ে যায়, কি করলে অন্ধ হবে তার পদ্ধতিও জানতে চেয়েছিল। স্বামী অন্ধ হয়ে গেলে সে অন্য পুরুষের সঙ্গে নিশ্চিন্তে মিলিত হতে পারবে। নারীর নির্মম স্বভাবের অমানবিক দিকটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

বোকা ছুতোর গল্পে অবশ্য বিষ্ণুশর্মা পরাশর-ব্যাস-বেদ-কুরুবংশ-পাণ্ডব প্রভৃতির উল্লেখ করে বেশ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে নারীর ব্যভিচারের আরও বীভৎস উলঙ্গ প্রকাশ দেখিয়েছেন বিষ্ণুশর্মা। একজন কাম আসক্তা নারী লজ্জাহীনতার শেষ স্তরে না নামলে এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। অবশ্য কাহিনীটি বলা হয়েছে খুব লঘু চালে, পাঠক বেশ কৌতুক উপভোগ করেন।

এক ছিল ছুতোর। তার বৌয়ের স্বভাব-চরিত্র মোটেই ভালো ছিল না। নানা লোকে নানা কথা বলত। ছুতোর ভাবল, বৌকে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু পরীক্ষা করবে কেমন করে?

এইখানে বিষ্ণুশর্মা কিছু দার্শনিক কথা বলেছেন, সুভাষিত লিখেছেন। তিনি বলেছেন, নদী বংশ সাধুপুরুষ ও মেয়েদের পাপাচরণ পরীক্ষা করতে নেই। পাণ্ডবদের জন্মরহস্য জানতে চাওয়া উচিত নয়, কেননা তারা ক্ষেত্রজ। শুধু কি তারা?

বসোর্বীর্যোৎপন্নামভজত মুনির্মৎস্যতনয়াং
তথা জাতো ব্যাসঃ শতগুণনিবাসঃ কিমপরম্।
স্বয়ং বেদান ব্যস্যাঞ্ছমিতকুরুবংশপ্রসবিতা
স এবাভুচ্ছুদ্ধীমানহহ বিষমাঃ কর্মগতয়ঃ॥

এর পরেই সমগ্র নারীজাতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, আগুন যদি শীতল হত, চাঁদ যদি উত্তপ্ত হত, দুর্জন মানুষ যদি হিতৈষী হত, তবেই নারীরা হত সতী। সবগুলি বিশেষণই অসম্ভব। নারীর সতীত্বও অসম্ভব!

যদি স্যাৎ পাবকঃ শীতঃ প্রোক্ষো বা শশলাঞ্ছনঃ।
স্ত্রীণাং তদা সতীত্বং স্যাদ্ যদি সাদুর্জনো হিতঃ॥

আবার ছুতোরের কাহিনী শুরু হল।

ছুতোর ঠিক করল, সে বৌকে পরীক্ষাই করবে। এই না ভেবে সে বৌকে বলল, সকালে আমি অনেক দূরের গাঁয়ে যাব। সেখানে আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে। বেশি করে খাবার দিও, লাগবে।

এই কথা শুনে বৌ মনে মনে খুব খুশি হল। ভালো করে খাবার বানিয়ে দিল। ভোরবেলা উঠে ছুতোর বাড়ি থেকে রওনা দিল। একটু পরেই বৌ তার প্রেমিকের বাড়ি গিয়ে বলল, ও দূর গাঁয়ে চলে গিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে রাত্তিরে আমার বাড়িতে আসবে।

ছুতোর সারাদিন এদিক-ওদিক ঘুরে সন্ধ্যেবেলা অন্য দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকে ঘরে খাটের তলায় লুকিয়ে থাকল।

রাত্তিরে প্রেমিক এসে খাটের ওপরে বসল। খাটের নিচে ছুতোর রাগে ফুলতে লাগল। ভাবল, দুজনে যখন খাটের ওপরে একসঙ্গে ঘুমোবে তখন দুজনকেই কেটে ফেলব।

বৌ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। খাটে উঠতে যাবে, এমন সময় ছুতোরের গায়ে তার পা লেগে গেল। বুঝতে পারল, ছুতোর নিচে লুকিয়ে রয়েছে।

খাটে বসে বৌ বলল, আমাকে ছোঁবেন না, কেননা আমি সতী নারী, আমি পতিব্রতা। যদি কিছু করেন তবে শাপ দিয়ে ভস্ম করে দেব।

তাহলে আমায় ডেকে আনলে কেন?

বৌ বলল, আজ সকালে চণ্ডীমন্দিরে গিয়েছিলাম। মা চণ্ডী বললেন, ছুতোর বৌ, তুই আমার ভক্ত, কিন্তু কিছু করার নেই মা, ছয় মাসের মধ্যেই তুই বিধবা হবি। তোর বিধিলিপি।

আমি বললাম, তুমি আমায় এই বিপদ থেকে বাঁচাও। তুমি সব পার। একটা উপায় বল, যাতে আমার স্বামীর একশ' বছর আয়ু হয়। তখন মা চণ্ডী বললেন, একটা উপায় আছে। যদি আজকে পর-পুরুষের সঙ্গে একসঙ্গে বিছানায় থাক, তবে স্বামীর বিপদ কাটবে, সেই বিপদ গিয়ে পড়বে পর-পুরুষের ওপরে। তাই আমি আপনাকে আমার ঘরে ডেকে এনেছি। তাই যা করতে মন চায় করুন। দেবীর কথা মিথ্যে হবে না।

এই কথা না শুনে ছুতোর আনন্দে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এল। বলল, আঃ, তুমি সত্যিকারের সতী। আমার জন্য তুমি এত করছ? আর আমি কিনা নানা লোকের কথায় তোমায় সন্দেহ করেছিলাম? আর ভাই তুমি তো মহান মানুষ, অনেক পুণ্য করেছিলাম তাই তুমি আমার ঘরে আজকে এসেছ। তোমার দয়ায় আমি একশ' বছর পরমায়ু পেলাম।

ছুতোর আনন্দে নাচতে লাগল।

এই কয়টি লোককথা ঠিক পঞ্চতন্ত্রের মেজাজের সঙ্গে মেলে না।

আনুমানিক দ্বাদশ শতকের শুকসপ্ততির কাহিনী হলে সামঞ্জস্য থাকত। আর শুকসপ্ততির দুটি কাহিনীর সঙ্গে এর আশ্চর্য মিলও রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের যে উদ্দেশ্য তার সঙ্গেও এই ধরনের গল্পের বিশেষ কোনো মিল নেই। মনে হয় যেন আরোপিত। প্রমাণ করবার উপায় নেই, কিন্তু সন্দেহ জাগে এই গল্পগুলি কি পঞ্চতন্ত্রের আদি সংকলকের? না পরবর্তীকালের কোনো কথক এগুলি পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে লোকশিক্ষারও তেমন কোনো উপাদান নেই। অথচ পঞ্চতন্ত্রে লোকশিক্ষার বিষয়টিকে বারবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

লোকসমাজের মৌখিক সম্পদকে সংকলন করে সম্পাদনা করবার সময় এই ধরনের কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছেন বিষ্ণুশর্মা, কিন্তু তবুও পঞ্চতন্ত্র মূলত লোককথার এক অনন্য উজ্জ্বল সংগ্রহগ্রন্থ।

উইলিয়াম নরম্যান ব্রাউন ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে 'জার্নাল অব আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি' পত্রিকায় 'দ্য পঞ্চতন্ত্র ইন মডার্ন ইণ্ডিয়ান ফোকলোর' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রহগুলির সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে ব্রাউন দেখান, পঞ্চতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য লোককথা কিভাবে ছড়িয়ে রয়েছে ভারতীয় লোকসমাজে। যাদের কাছ থেকে এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল তারা নিরক্ষর গ্রামবাসী, অনেকেই গ্রামের চৌহদ্দির বাইরে যান নি, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানেন না, বৃহত্তর জনজীবনের ঢেউ তাদের প্রভাবিত করেনি। এইসব গ্রামীণ মানুষের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লোকও রয়েছেন যারা ছিলেন আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে। সংস্কৃত পুঁথি পঞ্চতন্ত্র তাদের নাগালের বাইরে ছিল, কথকের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়ারও কোনো সুযোগ ছিল না। এই সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়, পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলি প্রাচীন কাল থেকেই লোকসমাজে প্রচারিত ছিল,—বিষ্ণুশর্মা সেগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। মৌখিক ঐতিহ্যের পথ বেয়ে আজও নিরক্ষর বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ মানুষের মধ্যে এইসব গল্প শুনতে পাওয়া যাবে। সংহত জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সহজে ভুলে যান না।

পঞ্চতন্ত্রে পশুকথা

পঞ্চতন্ত্রের ৮৪টি লোককথার অর্ধেক হল পশুকথা। সংকলক নীতিশিক্ষার জন্যই গল্পগুলো বেছেছিলেন। আর পশুকথাই হল নীতিশিক্ষার সবচেয়ে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী মাধ্যম। শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক

অভিজ্ঞতা ছিল বিষ্ণুশর্মার, তাই তিনি এই সঠিক সংকলন করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চতন্ত্রের মিত্রভেদ-এ ১৭টি, মিত্রপ্রাপ্তি-তে ৪টি, কাকোলূকীয়-তে ১০টি, লব্ধপ্রণাশ-এ ৮টি এবং অপরীক্ষিত-কারক-এ ৩টি পশুকথা রয়েছে। এই ৪২টি পশুকথা রূপ-রীতি-পাত্রপাত্রীতে নিটোল পশুকথা। অন্যান্য লোককথায়ও অসংখ্য পশুচরিত্র এসেছে, কিন্তু সেখানে মানুষ ও পশুচরিত্র মিলিতভাবে রয়েছে। পশুকথার মেজাজ সেখানেও লক্ষ্য করা যাবে।

পঞ্চতন্ত্রের পশুকথার একটি বিশেষত্ব রয়েছে, ঈশপের পশুকথার সঙ্গে এই বিষয়ে পঞ্চতন্ত্রের মৌলিক তফাৎ ঘটে গিয়েছে। সংকলক হিসেবে এখানে বিষ্ণুশর্মা আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। অবশ্য, একথাও মনে রাখতে হবে, ভারতীয় উপ-মহাদেশের পশুকথায় এই বিশেষ গুণটি সার্বিকভাবেই লক্ষ্য করা যায়।

ঈশপের পশুরা নিতান্তই পশু, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তারা পশুর মতোই স্বাভাবিক আচরণ করে। এদের কথা ও আচরণের মধ্যে পশুপাখির চরিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পঞ্চতন্ত্রের সমস্ত পশুপাখি মানুষের চরিত্রের প্রতীক ও রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হর্নস্টেইন সংক্ষেপে সুন্দরভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন, The animals have all the characteristics of men—even studying the Vedas and indulging in religious disputes. Their conduct and experiences are used to point morals, both private and political.

পঞ্চতন্ত্রে কয়েকটি পশুকথার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মিত্রভেদ-এর 'বানরের দল ও সূচীমুখ' পশুকথা এবং লব্ধপ্রণাশ-এর 'বানর ও চড়ুই বৌ'; মিত্রভেদ-এর 'সিংহ উট ও কাক' পশুকথা এবং 'সিংহ শেয়াল ও উট'; মিত্রভেদ-এর 'অনাগতবিধাতা' পশুকথা এবং অপরীক্ষিত-কারক-এর 'শতবুদ্ধি' প্রায় একই ধরনের কাহিনী,—নীতিকথা ও কাহিনীবিন্যাসে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

পঞ্চতন্ত্রের 'কথামুখম্'-এর পরেই শুরু হয়েছে মিত্রভেদ তন্ত্র। মিত্রভেদ-এর ভূমিকার কাহিনীটি বণিক-সঞ্জীবক-পিঙ্গলক-করটক-দমনকের কাহিনী। কিন্তু তন্ত্রটির প্রথম শ্লোকটি পশুকে ঘিরে, কাহিনীটি সঞ্জীবক-পিঙ্গলককে ঘিরে।

বর্ধমানো মহান্ স্নেহঃ সিংহগোবৃষয়োর্বনে।
পিশুনেনাতিলুব্ধেন জম্বুকেন বিনাশিতঃ॥

ভূমিকার পরে যে প্রথম কাহিনীটি শুরু হল সেটিও পশুকথা, খোঁটা-খুলে-যাওয়া বানরের গল্প।

পঞ্চতন্ত্রের শেষ তন্ত্র অপরীক্ষিত-কারকও শেষ হয়েছে কাঁকড়া-সাপ পশুকে দিয়ে। পঞ্চতন্ত্রের শেষ শ্লোকটিও পশুকে নিয়ে,

অপি কাপুরুষো মার্গে দ্বিতীয়ঃ ক্ষেমকারকঃ।
কর্কটেন দ্বিতীয়েন জীবিতং পরিরক্ষিতম্॥

পঞ্চতন্ত্রের অনেক পশুকথায় গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। অহিংসার জয়, অহিংসা নিয়ে বাড়াবাড়ি, স্বদেশানুরক্তি, কুপমণ্ডুকতা প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে পশুকথার মাধ্যমে।

বিদেশ সম্পর্কে তিক্ত অভিজ্ঞতা ও স্বদেশভূমির প্রতি আকর্ষণের হেতু সম্পর্কে একটি সুন্দর পশুকথা রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে। পশুকথাটির অনুভূতি আজও সমানভাবে সত্য। চিরকালীন আবেদন থাকে বলেই লোককথা আন্তর্জাতিক ও সার্বজনীন মানসিকতার প্রতিভূ হয়ে ঐতিহ্যের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে।

এক যে ছিল কুকুর। সে যেখানে থাকত, সেই এলাকায় একবার দেখা দিল ভীষণ দুর্ভিক্ষ। খাবার নেই, খিদের জ্বালায় সবাই শুকিয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন ধরে চলল সেই দুর্ভিক্ষ। আর তো পারা যায় না! এমন সময় কুকুর শুনল, ঐ অনেক দূরের দেশে কোনো অভাব নেই, প্রচুর খাবার সেখানে। এমনিতেই গলা শুকিয়ে রয়েছে কুকুরের, পেট গিয়েছে ঢুকে। আর সেই দূর দেশের কথা শুনে তার খিদে গেল আরও বেড়ে। কুকুর রওনা দিল দূর দেশের পথে।

মস্ত শহর। অনেক বাড়ি, অনেক লোকজন। না, যা শুনেছে তা মিথ্যে নয়,—প্রচুর খাবার। কুকুর ঠাঁই পেল এক বাড়িতে। তাদের ফেলে-দেওয়া খাবার খেয়ে দিব্যি দিনরাত কাটছে তার। অল্প দিনের মধ্যেই কুকুর বেশ মোটাসোটা হয়ে উঠল।

কিন্তু একটা বিপদ। বাড়ির বাইরে গেলেই অন্য কুকুর তাকে তাড়া করত, বাগে পেলে কামড়ে দিত, কখনও কখনও বেকায়দায় পড়ে গিয়ে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। অথচ বাড়ির মধ্যেই কি সবসময় থাকা যায়? বন্দী জীবন কি আর ভালো লাগে?

এমনি করে কিছুদিন কাটল। শেষকালে কুকুর ভাবল, অনেক হয়েছে, আর নয়। আমার স্বদেশই ভালো। দুর্ভিক্ষ হোক, কষ্ট হোক,—তবু নিশ্চিন্তে তো থাকতে পারব। এত আতঙ্ক আর ভালো লাগে না। সেখানে আর যাই হোক কেউ রক্ত ঝরায় না। আমি দেশেই ফিরে যাব।

দেশে ফিরে এল সেই কুকুর। বিদেশ থেকে ফিরেছে কুকুর,—আত্মীয়রা আপনজনকে জিজ্ঞেস করল, বিদেশের গল্প বলো। দেশটা কেমন? মানুষজন কি করে? তাদের খাওয়া-দাওয়া কেমন? আচার-ব্যবহার কেমন? নতুন দেশ, খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

কুকুর আস্তে আস্তে বলল, সে দেশের কথা আর কি বলব !

সুভক্ষ্যাণি বিচিত্রাণি শিথিলাশ্চৈব যোষিতঃ।
একো দোষো বিদেশস্য স্বজাতির্যদ্ বিরুধ্যতে ॥

বিদেশে স্বজাতিই হল শত্রু,—ঈর্ষাই কি এর কারণ ? এ অভিজ্ঞতা পঞ্চম শতাব্দীর, এ অভিজ্ঞতা বিংশ শতাব্দীর।

পঞ্চতন্ত্রের লোককথাগুলির অন্তর্নিহিত ভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, অধিকাংশ গল্পেই ফুটে উঠেছে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের হাহাকার-বেদনা-তিক্ততা-ব্যর্থতা-কান্না-প্রতিকূল জীবনসংগ্রাম-প্রতিহিংসা-প্রতিরোধ ও অসহায়তা। এসব অভিজ্ঞতা তো লোকসমাজ ছাড়া অন্য কোনো সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়! নীলবর্ণ শৃগাল, তিনটি মাছের কাহিনী, সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, সিংহচর্মাবৃত গাধা, বিশ্বস্ত বেজি, দুমুখো পাখি, সহস্রবুদ্ধির বিপদ, বোকা হাতি, শেয়ালছানার বড়াই, সমুদ্র-শাসন প্রভৃতি নীতিকথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যই প্রমাণ করবে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলির প্রকৃত উৎসস্থান কোথায় ?

পিলপের নীতিকথা

পিলপে নামটির মধ্যে রহস্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন, বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রই বিদেশে পিলপের নামে প্রচারিত হয়েছে। এ নাম সংস্কৃত ভাষায় নেই। বিদ্যাপতি—বিদপাই—পিলপে এইরকম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। হতে পারে, কিন্তু এর পেছনে কিছুটা কষ্টকল্পনা রয়েছে। নামের রহস্য আজও উদ্‌ঘাটিত হয়নি।

অথচ পিলপের নামে যে নীতিকথা আরব-দুনিয়া ও ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল, তার অনেক কাহিনী রয়েছে পঞ্চতন্ত্রে। আবার এমন এমন অনেক কাহিনী রয়েছে যা পঞ্চতন্ত্রে নেই। পঞ্চতন্ত্রে কাহিনীগুলো যেমন একটি মালায় গাঁথা রয়েছে, পিলপের নীতিকথায়ও সেইভাবে আছে, যদিও কথামুখটির সঙ্গে কোনো মিল নেই। সেখানে রয়েছে অন্য একটি স্বতন্ত্র কাহিনী।

প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনো কাব্য-পুরাণ জনপ্রিয় হলে তার অনুসরণে একই ধরনের অনেক কাব্য-পুরাণ লিখিত হত। এর অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের জনপ্রিয়তার কারণে যেমন হিতোপদেশ রচিত হয়েছিল। মনে হয়, পঞ্চতন্ত্রের আদর্শে পিলপের নীতিকথা লিখিত হয়। তবে এর

প্রচার বেশি হয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরে। আর অন্য ভাষীদের উচ্চারণে সংস্কৃত নামটি বিকৃত হয়ে পিলপে হয়ে যায়। এত বেশি পরিমাণে বিকৃত হয় যে আজ আর আসল নাম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটাও অনুমান। কিন্তু কিছু লোককথা অন্য কোনো লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই পিলপের নীতিকথা সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে হচ্ছে।

পিলপের নীতিকথাকে ঘিরে একটি 'ঐতিহাসিক' কাহিনী রয়েছে। পারস্যের বাদশাহ ছিলেন নাসিরবান। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। পিলপের নীতিকথার নাম তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। বাদশাহের ইচ্ছে হল, তিনিও সেগুলি পড়বেন। এক সভাসদকে পাঠালেন ভারতবর্ষে। তিনি এই নীতিকথার পুথি সংগ্রহ করে নিয়ে যাবেন পারস্যে। কিন্তু সভাসদ ভারতবর্ষে এসে দেখলেন, পুথি নিয়ে যাওয়া বড় সহজ নয়। ভারতীয় পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত রক্ষণশীল ও ঈর্ষাপরায়ণ। তাদের ঐতিহ্য অন্য দেশে চলে যাবে কিংবা অন্য ভাষায় অনুদিত হবে এটা তারা সহজে ঘটতে দিতে চান না। কিন্তু সভাসদ এসেছেন সুদূর পারস্য থেকে, বাদশাহের আদেশ বহন করতে। তিনিও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। সভাসদ এমন একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন যার কাছে অনেক মানুষই নত হতে বাধ্য, রক্ষণশীলতাও সেখানে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। তিনি প্রভূত অর্থ-সম্পদ উৎকোচ দিলেন। কাজ হল। অন্য কেউ জানল না, একজনকে বশ করে গোপনে তিনি সেই পুথি নিয়ে পাড়ি দিলেন পারস্যে। এর পরেই মধ্যপ্রাচ্যের বহু ভাষায় সেই নীতিকথা অনুবাদিত হল আর সেখান থেকে গেল ইউরোপে।

এই কাহিনীর মধ্যে কিছুটা নাটকীয়তা থাকলেও পঞ্চতন্ত্রের বিশ্বজয়ের সঙ্গে এই কাহিনীর মিল রয়েছে। ইউরোপের পণ্ডিতেরা একসময় বলতেন, বাইবেল ছাড়া আর কোনো গ্রন্থ নাকি পিলপের নীতিকথার মতো প্রচারিত হয়নি। এতেই সন্দেহ হয়, পিলপের নীতিকথা নামে যা প্রচারিত হয়েছিল আসলে তা পঞ্চতন্ত্র।

আবার সন্দেহও জাগে এর কথামুখের কাহিনীতে। এক রাজা স্বপ্নে দেখলেন, ঐ বিশেষ স্থানে গুপ্তধন লুকনো রয়েছে। সেই গুপ্তধনের মধ্যে তিনি পেলেন মণি-মুক্তোখচিত একটি কৌটো। তার মধ্যে রয়েছে এক টুক্‌রো রেশমী কাপড়, তার ওপরে লেখা কিছু বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানগর্ভ প্রবাদবাক্য। এই প্রবাদবাক্যগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার নাম পিলপে। প্রবাদগুলি ব্যাখ্যা করবার জন্যই পিলপেকে কাহিনীর মালা গাঁথতে হল। অসংখ্য কাহিনী বলে চললেন পিলপে। এই কথামুখের সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কোনো মিল নেই। তবে পিলপের নীতিকথা যে পঞ্চতন্ত্রের সময়সীমায় রচিত হয়েছিল তার প্রমাণ মিলেছে পারস্যের বাদশাহের প্রাসঙ্গিক নাম-ব্যবহারে

পিলপের নীতিকথার একটি মৌলিক শিক্ষা হল: ভালোবাসাই শক্তির উৎস। এই নীতিকথাগুলি খুব সংক্ষিপ্ত, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো বাক্য নেই, কাহিনী-বিন্যাসে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়নি, সব পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা আচার-আচরণ সাদামাঠা। কিন্তু নীতিশিক্ষার বিষয়টি কোনোভাবেই উপেক্ষা করা হয়নি। এমন কোনো লোককথা নেই যা স্পষ্টভাবে লোকশিক্ষা দেয় না। গ্রন্থটির উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ। সব গল্পই লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত, সম্পাদক শুধু কাহিনীর মালাটি গেঁথেছেন।

পিলপের নীতিকথার কয়েকটি উজ্জ্বল দীপ্ত দৃষ্টান্ত পাঠককে বিস্মিত করে। সরাসরি গল্প বলবার ভঙ্গি পিলপের বৈশিষ্ট্য। কোনো ভণিতা নেই। লোকসমাজের ভঙ্গিটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে।

বাজপাখি ও মুরগী। একদিন এক বাজপাখি এক মুরগীকে বলল, তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ, উপকার স্বীকার কর না। তোমাদের কত ভালো ভালো খাবার দেওয়া হয়, থাকতে দেওয়া হয় কত সুন্দর ঘরে। শেয়াল যাতে রাতের আঁধারে তোমাদের মেরে ফেলতে না পারে তার জন্য প্রভু তোমাদের ঘরকে মজবুত করে গড়েছে। আর প্রভু যখন তোমাদের ধরতে যায়, আদর করতে চায় তখন তোমরা ডাক ছেড়ে ছুটে পালাও। আর দেখ, তোমাদের মতো এত সুযোগ আমি পাই না। তবুও মানুষ যখন আমাকে ধরে, আদর করে, তখন আমি পালাই না, আদর নি। বনে-জঙ্গলে-মাঠে শিকারের সময় আমি তাই ওদের সাহায্য করি। তোমরা এমন কর কেন?

গলা নিচু করে মুরগী বলল, তুমি ভাই যা বললে তা খুব সত্যি। হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলেছ। কিন্তু বন্ধু, মনে করে দেখতো, তুমি কোনোদিন আগুনের মধ্যে ঝলসানো বাজপাখি দেখেছ কিনা। আমরা যে নিত্যিদিন অনেক অনেক মুরগীকে আগুনে ঝলসাতে দেখেছি।

এই লোককথাটি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক আদিবাসী গোষ্ঠী, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে।

দয়ালু রাজা। এক রাজা ছিলেন। তিনি ছিলেন খুব নিষ্ঠুর। একদিন ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তিনি দেখলেন, বনের একটা শেয়াল তাড়া করেছে একটা মুরগীকে। ঠিক সেই সময়ে একটা কুকুর তাড়া করল সেই শেয়ালকে, কামড়ে ধরল শেয়ালের পেছনের পা। শেয়াল কোনোরকমে বেঁচে গেল, কিন্তু খুঁড়িয়ে চলতে লাগল। তার গর্তে ঢুকে গেল। কুকুর অন্য পথে হাঁটা দিল। এমন সময় একটা লোক কুকুরকে দেখতে পেয়ে পাথর ছুড়ল, পাথর লাগল কুকুরের মাথায়, মাথা গেল ফেটে। এমন সময় সেখান দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল একটা ঘোড়া, মানুষটার সঙ্গে ধাক্কা লাগল, মাড়িয়ে দিল মানুষটার পা। একটু পরেই ঘোড়ার পা

পড়ল একটা পাথরের ওপরে, পিছলে গেল পেছনের পা, ঘোড়ার পা গেল ভেঙে।

রাজা বলে উঠলেন, হায়! এসব ঘটল যেন আমায় শিক্ষা দিতে। বুঝতে পারলাম, তাদের কপালেই বিপদ ঘটে যারা অন্যের ক্ষতি করে।

সেইদিন থেকে রাজা খুব দয়ালু হয়ে গেলেন, মানুষের ওপর আর অত্যাচার করতেন না। সব মানুষকে ভালোবাসতেন।

বাঘের মুখে কালো কালো দাগ কেন। এক বনে গাছের নিচে বসে ছিল এক খরগোশ। পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এক বাঘ। তাকে বসে থাকতে দেখে বাঘ বলল, এখানে বসে বসে কি করছ?

খরগোশ বলল, দাদুর ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছি, বসে রয়েছি কেউ যাতে চুরি করে পালাতে না পারে।

বাঘ বলল, কোথায় সেটা?

ঐ ওপরে, খরগোশ চোখ তুলে পাশের একটা গাছের ডাল দেখিয়ে দিল। সেখানে ঝুলে রয়েছে লম্বা-মতন কালো একটা কি যেন।

খরগোশ বাঘের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার যদি ইচ্ছে করে তবে ঘণ্টাটা বাজাতে পার। কি সুন্দর যে শব্দ হয়! কিন্তু ঘণ্টা বাজাবার আগে আমাকে দূরে সরে যেতে হবে। বাবাঃ, যা শব্দ হয় না! কানে তালা লেগে যায়, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে।

বাঘের খুব ইচ্ছে হল, ঘণ্টাটা একবার বাজিয়ে দেখে। বাঘ উঠছে গাছে। খরগোশ লাফিয়ে লাফিয়ে অনেক দূরে চলে গেল। বাঘ পেছন ফিরে দেখল, খরগোশকে আর দেখা যাচ্ছে না। বাঘ ঘণ্টার কাছে গিয়ে সামনের ডানদিকের থাবা তুলল। গায়ের জোরে থাবা বসাল সেই ঘণ্টায়। ঘণ্টা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। ওটা তো আর ঘণ্টা ছিল না। ছিল একটা মৌচাক। শত শত মৌমাছি বাঘকে ঘিরে ধরল, কামড়াতে লাগল, মুখেই বেশি হুল ফোটালো। বাঘ ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে প্রায় পড়েই গেল গাছের নিচে।

বাঘের মুখে মৌমাছির কামড়ে কালো কালো দাগ হয়ে গেল। সেইদিন থেকেই সব বাঘের মুখে অমন কালো কালো দাগ।

ভারতের টোডা, মারিয়া, ভিল ও ধোবা আদিবাসীদের খুব প্রিয় পশুকথা।

ভারতীয় লোকসমাজে পরীকথার সন্ধান খুব বেশি পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায় ইউরোপে। পিলপের নীতিকথায় একটি পরীকথা রয়েছে।

গাছে গাছে থাকত পরীরা। কিন্তু রোদে-বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট। তাই তারা ঠিক করল, তারা গাছে বাসা বানাবে। কয়েকটি পরী গেল গভীর বনে, শক্ত-মজবুত গাছ দেখে সেখানেই গাছের ডালে বাসা তৈরি করল।

কয়েকটি পরী বলল, গভীর বনে যেতে যাব কেন ? গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠে ঐ যে একটা গাছ রয়েছে, ওখানেই বাসা বাঁধব। গাঁয়ের লোক খেতে-পরতেও দেবে।

এক রাতে শুরু হল ভীষণ ঝড়। হাওয়ার দাপটে সব যেন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। গাঁয়ের পাশে ফাঁকা মাঠের মধ্যে গাছ গেল উপড়ে, পরীদের বাসা গেল ভেঙে, তারা হল গৃহহীন।

ঘন বনের মধ্যে ঝড় তেমন সুবিধে করতে পারল না, গাছে-গাছে হাওয়া বাধা পেল। বনের পরীদের বাসা গেল বেঁচে। তারা গৃহহীন হল না।

তারা বলল, সবার উচিত বনভুমির মতো একসঙ্গে মিলেমিশে থাকা, একা থাকলেই বিপদ। তোমরা ছিলে একটা গাছের বাসায়, একা গাছ বিপদ রুখতে পারল না, উপড়ে গেল। একা থাকতে নেই, তাতে শক্তি কমে। সবাই একসঙ্গে থাকলে শক্তি বাড়ে।

পিলপের নীতিকথার মূল শিক্ষা হল, ভালোবাসাই শক্তির উৎস, বন্ধুত্ব শক্তি বাড়ায়। একটি সুন্দর পশুকথায় এই ভাবনা রূপ পেয়েছে।

অনেক কাল আগে এক বনে ছিল চার বন্ধু। ছাগল, কচ্ছপ, ইঁদুর ও কাক। একদিন সকালে তিন বন্ধু বেশ চিন্তায় পড়ল। রোজ সকালে তারা একটা পাহাড়ী ছোট্ট নদীতে এসে দেখা করত। গল্পগুজব করত। কিন্তু আজ তো ছাগল আসেনি। কাক উড়ে গেল তক্ষুনি। একটু পরে দূর থেকে উড়ে এসে বলল, বন্ধু ব্যাধের ফাঁদে আটকে পড়ে রয়েছে।

ইঁদুর বলল, ফাঁদের দড়ি আমি কেটে দেব।

কাক বলল, আমি তোমায় সেখানে নিয়ে যাব। চল।

ফাঁদের কাছে নেমেই ইঁদুর ধারাল দাঁত দিয়ে শক্ত দড়ি কাটতে লাগল। শেষ দড়িটা কাটতে বাকি রয়েছে, এমন সময়ে সেখানে গুটিগুটি এসে পৌঁছল কচ্ছপ।

ছাগল আঁৎকে উঠে বলল, বন্ধু, তুমি আবার কেন আসতে গেলে ? এক্ষুনি হয়তো ব্যাধ চলে আসবে। তুমি পালাবে কেমন করে ?

কচ্ছপ বলল, আমার জন্য ভাবছ কেন ? বিপদ ঘটতে পারে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে বন্ধুর অসময়ে তার পাশে আসব না ? কি যে তুমি বল ?

এই কথা বলতে বলতেই ব্যাধ সেখানে এসে গেল। ছাগল তিরিং করে লাফিয়ে দৌড় দিল, কাক উড়ে গেল, ইঁদুর গেল গর্তে ঢুকে। আর কচ্ছপ একটু এগিয়েছে, ব্যাধ তাকে ধরে ফেলল। তাকে থলের মধ্যে ভরে রাখল। ছাগল পালিয়ে যেতে ব্যাধ খুব রেগে গেল, কিন্তু যা পেয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট হল। আজকের দিনটা তো আর অনাহারে থাকতে হবে না।

তিন বন্ধু আবার একসঙ্গে হল। সবার মনেই খুব দুঃখ। তবু ছাগল বলল, কেঁদে তো কোনো লাভ হবে না। বন্ধুকে তো আব ছাড়ানো যাকে

না? একটা উপায় বের করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে, হয়তো বন্ধুকে বাঁচাতে পারব।

সবাই সেই বুদ্ধির কথা শুনল, মত দিল।

একটু পরেই ব্যাধ দেখতে পেল, বেশ কিছুটা দূরে দিয়ে একটা ছাগল খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে। সে জোরে হাঁটতে পারছে না। ব্যাধ মুখ-বাঁধা থলেটা সেখানে নামিয়ে রেখে ছাগলের দিকে দৌড়ে চলল। ভাবল, খোঁড়া ছাগলকে ধরা এমন কিছু শক্ত হবে না।

ছাগল ব্যাধকে বেশ কাছাকাছি আসতে দিল। এমন ভাব করে রয়েছে যেন ব্যাধকে দেখতেই পায়নি।

ছাগলও চলেছে। ব্যাধও দূরে থেকে তাকে তাড়া করল। ছাগল কষ্ট করে চলেছে। ব্যাধ ভাবল, দু-একবার শুধুশুধু তাড়া করি। ধরবার দরকার নেই। ও খোঁড়া, এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন সহজেই চেপে ধরব। ধৈর্য ধরি।

এমনি করে মিছিমিছি তাড়া করে ব্যাধ অনেক দূর গেল। থলে যেখানে রেখেছিল, সেখান থেকে এখন অনেক দূরে চলে এসেছে ব্যাধ।

এর মধ্যে ইঁদুর থলের মুখ কেটে ফেলেছে। কচ্ছপ বেরিয়ে পড়েছে। গুটিগুটি হাঁটা দিয়েছে। ঢুকে পড়ল এক ঘন ঝোপের আড়ালে।

ছাগল বুঝল, এতক্ষণে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে, বিপদ কেটেছে। আর বেশি ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই পাহাড়ের দিকে দৌড় দিল। দূরে দৌড়ে চলেছে ছাগল।

ব্যাধ অবাক হয়ে দেখল, খোঁড়া ছাগল ভালো হয়ে গিয়েছে, সে দৌড়চ্ছে প্রাণপণে। ভালো হল কেমন করে? আর তো ওকে ধরা যাবে না?

রেগে গিয়ে ফিরে চলল ব্যাধ। কপাল খারাপ, হতচ্ছাড়া কচ্ছপকে নিয়েই আজ বাড়ি ফিরতে হবে। কি আর করা যায়!

থলের কাছে এসে দেখল, থলের মুখ খোলা। ভেতরে কচ্ছপ নেই। ব্যাধ ভাবল, কেমন করে কচ্ছপ পালাল? ঠিক অপদেবতার কারসাজি। আর এখানে থাকব না। পালাই।

তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল ব্যাধ। আর কোনোদিন সেই জায়গায় ফাঁদ পাততে যায়নি।

এই ধরনের অসংখ্য পশুকথা ছড়িয়ে আছে ভারতে, আফ্রিকায়, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে এবং মধ্য আমেরিকায়। পাত্রপাত্রী আলাদা হলেও মোটিফ এক, কাহিনী বিন্যাস একই ধরনের।

সমাজমন বিশ্লেষণে, নীতিশিক্ষার আন্তরিক প্রকাশে এবং কথকতার অনন্য ভঙ্গিতে পিলপের সংগৃহীত লোককথাগুলি লোকঐতিহ্যের ভাণ্ডারে এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে রয়েছে।

বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রকে অবলম্বন ও মূল উৎস ধরে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে কয়টি গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে হিতোপদেশ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। হিতোপদেশের সংকলক বিষয়টি তার গ্রন্থের মিত্রলাভ অংশে প্রস্তাবিকার নবম শ্লোকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। গ্রন্থটি যে চারটি অংশে বিভক্ত তারও উল্লেখ রয়েছে।

মিত্রলাভঃ সুহৃদ্ভেদো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব চ।
পঞ্চতন্ত্রাৎ তথান্যস্মাদ্‌গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে॥

পঞ্চতন্ত্র ও অন্য একটি গ্রন্থ থেকে আহরণ করে এই গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, এই অন্য গ্রন্থটি হল 'কামন্দকীয় নীতিসার'। অবশ্য অনুমান হলেও কিছু যুক্তি রয়েছে। কেননা, নীতিসারের কিছু কাহিনী হিতোপদেশে পাওয়া যাচ্ছে। আবার এও হতে পারে, দুজনেই লৌকিক ঐতিহ্য থেকে লোককথা সংগ্রহ করেছেন।

হিতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ। ভারতবর্ষের এক ধরনেব ঐতিহ্যের অনুসরণ করেই নারায়ণ অকপটে তার পূর্বসূরী দুই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। তিনি পৃষ্ঠপোষকেরও নাম উল্লেখ করেছেন, তিনি হলেন ধবলচন্দ্র। ধবলচন্দ্রের ঐতিহাসিকত্ব আজও প্রমাণিত হয়নি, যদি ঐতিহাসিক ব্যক্তিটির সময়কাল নির্ধারণ করা যেত, তবে হিতোপদেশের সঠিক উদ্ভব-কাল পাওয়া যেত।

শুধু বলা যায়, হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রের পরবর্তী সময়ে সংকলিত। এই গ্রন্থের প্রাচীনতম যে পুথিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার তারিখ ১৩৩৭ খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু এই পুথি তো মূল পুথির নকল কিংবা নকলের নকল হতে পারে। এ থেকে কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়।

ভারততত্ত্ববিদ উইন্টারনিজ বলেছেন, নারায়ণ নবম শতকের পরে ও চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোনো সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, তিনি চতুর্থ-পঞ্চম শতকের মানুষ। প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থকারদের কালনির্ণয়ে সেই এক জটিলতা।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বারবার দেখা গিয়েছে, একটি পুথি জনপ্রিয় হলে তাকে অনুসরণ করে সেই ধরনের কাব্য-পুরাণ লিখিত হতে থাকে। তাই মনে হয়, পঞ্চতন্ত্রের কিছু পরেই তার জনপ্রিয়তায় প্রভাবিত হয়ে নারায়ণ

হিতোপদেশ লিখেছিলেন, যেমন পঞ্চতন্ত্রের পরে ও হিতোপদেশের আগে লেখা হয়েছিল 'কামন্দকীয় নীতিসার।'

একসময় মনে করা হত, বিষ্ণুশর্মাই হিতোপদেশের রচয়িতা। পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ একই মানুষের রচনা একথা ভাবতে বিস্ময় লাগে। কেননা, যিনি পঞ্চতন্ত্র লিখলেন, তিনিই আবার হুবহু আর একটি গ্রন্থ কেন লিখতে যাবেন? পঞ্চতন্ত্রের অর্ধেকেরও বেশি কাহিনী রয়েছে হিতোপদেশে। বিশেষ করে, প্রস্তাবিকায় সুস্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, পঞ্চতন্ত্র এবং অন্য একটি গ্রন্থ আমার এই গ্রন্থের উৎস। তবু দীর্ঘকাল বিষ্ণুশর্মার নামটি এই গ্রন্থের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিল। পিটারসন প্রথম এই ভুল ভেঙে দিলেন। তিনি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন, হিতোপদেশের সংকলক হলেন নারায়ণ।

হিতোপদেশ অন্য ভাষায় অনুবাদ করবার সময় ম্যাক্সমুলার, ফ্রিট্জ, চার্লস উইলকিনস্, ল্যাঙলে, হারটেল প্রভৃতি সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, গ্রন্থকার লৌকিক ঐতিহ্যের মৌখিক সম্পদগুলির লিখিত রূপ দেন। এই গ্রন্থেরও মূল উৎসভূমি লোকসমাজ।

হিতোপদেশ গ্রন্থটির নামের মধ্যেই এর উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে। নারায়ণ নিজেও সচেতনভাবে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে। সাধারণ নীতিশিক্ষার পাশাপাশি গ্রন্থে সমাজনীতি ও রাজনীতির বিষয়টিও এসেছে। অবশ্য এগুলিও বৃহত্তর অর্থে নীতি, তবে অল্পবয়স্কদের জন্য নিশ্চয়ই নয়। তাই এই গ্রন্থ বয়স্কদেরও সমানভাবে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

নারায়ণ হিতোপদেশকে চারটি ভাগে সাজিয়েছেন, মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। অন্য তিনটির ওপর পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট, কিন্তু সন্ধি অংশের পরিকল্পনা নারায়ণের নিজস্ব। চারটি অংশেই নারায়ণ নতুন লোককথা সংকলিত করেছেন।

হিতোপদেশের প্রস্তাবিকার কাহিনীটি পঞ্চতন্ত্রের আদলে তৈরি। মিলই বেশি। এখানে পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মার নামের উল্লেখ রয়েছে, তিনিই অপগণ্ড ছেলেদের দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজা, রাজধানী প্রভৃতির নাম এখানে পরিবর্তিত হয়েছে।

হিতোপদেশ গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসটি নারায়ণ এইভাবে বলেছেন: ভাগীরথী নদীর তীরে ছিল এক নগর, নাম পাটলিপুত্র। সেখানকার রাজার নাম ছিল সুদর্শন। সেই রাজা একদিন শুনতে পেলেন, কে একজন দুটি শ্লোক আবৃত্তি করছে, শাস্ত্র সকলের চক্ষু-স্বরূপ, এই শাস্ত্রজ্ঞান যার নেই সে অন্ধ। যৌবন, প্রভুত্ব, ধনসম্পদ ও বিবেকহীনতা, এদের মধ্যে মাত্র একটিই অনর্থ ঘটাতে পারে, আর চারটি একত্রিত হলে তো কথাই নেই।

এই শ্লোক শুনে রাজা চিন্তিত হলেন, তার পুত্রেরা শাস্ত্রজ্ঞানহীন ও উচ্ছৃঙ্খল। রাজা ভাবতে বসলেন, অধিকাংশই দার্শনিক ভাবনা যদিও উদাহরণগুলি বাস্তব জগতের। এই ভাবনা রয়েছে ২৯ টি শ্লোকে, ১২ থেকে ৪০ তম শ্লোক পর্যন্ত।

এইসব ভেবে রাজা সভায় পণ্ডিতদের ডাকলেন। রাজা বললেন, আমার ছেলেরা নিত্য-উন্মার্গগামী ও শাস্ত্রপাঠে বিমুখ। আপনাদের মধ্যে এমন কি কেউ আছেন যিনি ছেলেদের নীতিশিক্ষা দেবেন, তাদের শিক্ষিত করে তুলবেন ? এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের পুনর্জন্ম ঘটে।

তখন সকল নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা বৃহস্পতির মতো বলতে লাগলেন, মহারাজ, রাজপুত্ররা বিশাল বংশে জন্মেছে। আমার মনে হয়, এদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব। কেননা, অযোগ্য পাত্রে বিহিত কর্ম কখনও সফল হয় না, শত চেষ্টা করলেও বককে শুকপাখির মতো শেখানো যায় না। আর মনে রাখতে হবে, আপনার বংশে কখনও গুণহীন পুত্র জন্ম নিতে পারে না। পদ্মরাগমণির খনিতে কাচের উদ্ভব সম্ভব নয়। তাই, আমি ছয় মাসের মধ্যে আপনার পুত্রদের নীতিশাস্ত্রে শিক্ষিত করে তুলতে পারব বলে বিশ্বাস করি।

রাজা বললেন, তাহলে আমার এই পুত্রদের নীতিশাস্ত্র উপদেশের ব্যবস্থা আপনিই করুন। সতের সংসর্গে ক্ষুদ্র ব্যক্তিও দীপ্তি লাভ করতে পারে।

এই বলে রাজা সুদর্শন বিষ্ণুশর্মার হাতে তার পুত্রদের সমর্পণ করলেন।

তারপর প্রাসাদপৃষ্ঠে রাজপুত্রেরা যখন সুখে উপবিষ্ট, তখন সেই পণ্ডিত ভূমিকা হিসেবে বললেন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাব্য ও শাস্ত্রপাঠে আনন্দ লাভ করে, আর মূর্খ ব্যক্তি নিদ্রায় কলহে অথবা কুক্রিয়া আসক্ত হয়ে সময় কাটায়। তোমাদের আনন্দের জন্য আমি কাক কচ্ছপ হরিণ ও ইঁদুরের বিচিত্র কাহিনী বলব। এদের উপকরণ ছিল না, ধনসম্পত্তিও ছিল না, কিন্তু এরা ছিল পরম বন্ধু ও বুদ্ধিমান, তাই এদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল।

হিতোপদেশের এই প্রস্তাবিকার সঙ্গে পঞ্চতন্ত্রের কথামুখের খুব সাদৃশ্য রয়েছে, রয়েছে ব্যাপক প্রভাব। এখানে অবশ্য বিষ্ণুশর্মা রাজা সুদর্শনের একজন সভাপণ্ডিত। বিষ্ণুশর্মার জনপ্রিয়তার কারণেই নারায়ণও তার গ্রন্থের প্রথমেই এই নাম ব্যবহার করেছেন। তবে একথা মানতেই হবে, পঞ্চতন্ত্রের কথামুখের মতো হিতোপদেশের প্রস্তাবিকা অত মনোগ্রাহী নয়।

ভাবে-ভাবনায়-রূপরীতিতে-আদর্শে ও উদ্দেশ্যে পঞ্চতন্ত্রের অনুসরণ হলেও হিতোপদেশের মধ্যে আমরা নতুন কিছু লোককথার সন্ধান পাই। লোকসমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের আরও কিছু সংগ্রহ লিখিত আকারে পাওয়া গেল বলেই হিতোপদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। সম্পাদক হিসেবে নারায়ণ হয়তো স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন না, বিষ্ণুশর্মার বৈদগ্ধ্যও তার নেই,

সৃজনী শক্তিও তুলনায় কম,—তবু সংগ্রাহক হিসেবে নারায়ণ স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হিতোপদেশের একটি বড় ত্রুটি শ্লোকের আধিক্য। পঞ্চতন্ত্রেও শ্লোক রয়েছে, কিন্তু বিষ্ণুশর্মা জানতেন কোথায় থামতে হবে। সম্পাদক হিসেবে তাই তিনি অনন্য। কিন্তু নারায়ণ নীতিশিক্ষার তাগিদে হৃদয়গ্রাহিতার কথা উপেক্ষা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই গ্রন্থ পাঠ করলে সংস্কৃত-উক্তিতে নৈপুণ্য জন্মাবে, সকল ক্ষেত্রেই বাক্যের বৈচিত্র্য জন্মাবে; তাছাড়া এই গ্রন্থ নীতিবিদ্যাও দান করবে। 'কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে',—কিন্তু শিশু-কিশোরকে শিক্ষাদানের সময় উপদেশের আধিক্য যে বিরক্তি উৎপাদন করে নারায়ণ তা উপলব্ধি করেননি। এর ফলে আর একটি ত্রুটি ঘটে গিয়েছে। লৌকিক কাহিনীটির গতিময়তা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। লোককথা বলতে বলতে মাঝখানে এত শ্লোক বললে রসভঙ্গ ঘটে। শ্লোকগুলি নিঃসন্দেহে অসাধারণ নীতিমূলক, কিন্তু লোকঐতিহ্যের মূল বিষয়টির রসগ্রহণে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, সুহৃদ্‌ভেদ অংশের প্রথম পশুকথাটিতে আছে, সিংহ পিঙ্গলকের কাছে এল শেয়াল দমনক, পশুরাজের কাছে বিনয় প্রকাশের জন্যই দমনক ১৪টি শ্লোক বলল। শ্লোকগুলির ভাবার্থ সুন্দর, কিন্তু পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। এইরকম দৃষ্টান্ত গ্রন্থের আগাগোড়া ছড়িয়ে রয়েছে। এর ফলে হিতোপদেশের কাহিনী-বর্ণনায় কৃত্রিমতা প্রকাশ পেয়েছে। বিষ্ণুশর্মার মতো সংযত হলে এই ত্রুটি ঘটত না। অথচ নারায়ণের ভাষাভঙ্গি সুন্দর, সহজ। তাই হিতোপদেশের অন্তর্ভুক্ত লোককথাকে লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসারী করে সাজিয়ে তুলতে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। অনেক কিছু বাড়তি বক্তব্য ও মন্তব্য ছেঁটে ফেলেই লোককথাকে উদ্ধার করতে হয়। কিন্তু এই কাজটি করবার পরেই একটি নিটোল লোককথা আত্মপ্রকাশ করে। এখানেই পঞ্চতন্ত্রের মতো হিতোপদেশের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

এই গ্রন্থের মিত্রলাভ সুহৃদ্‌ভেদ ও বিগ্রহ অংশগুলি পঞ্চতন্ত্রের অনুরূপ, কিন্তু চতুর্থ ভাগ সন্ধির পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ নতুন, নারায়ণের নিজস্ব সৃষ্টি।

নারী সম্পর্কে নারায়ণও অশ্রদ্ধেয় উক্তি করেছেন। গল্পচ্ছলে অল্প-বয়সীদের নীতিকথা শেখানো হচ্ছে,—নারায়ণ একথা বলেও বণিকের কাহিনী শুনিয়েছেন যার মধ্যে ছোটদের নীতিশিক্ষার কি থাকতে পারে তা উপলব্ধি করা যায় না।

বিক্রমপুরে এক বণিক ছিল। তার নাম সমুদ্রদত্ত, তার বৌয়ের নাম রত্নপ্রভা। বৌ তার ভৃত্যদের মধ্যে একজনের সঙ্গে সব সময় ফষ্টিনষ্টি করত। কেননা, নারীদের প্রিয়-অপ্রিয় বলে কিছু নেই, গোরু যেমন বনে নতুন ঘাস কামনা করে, নারীরাও তেমনি নতুন নতুন পুরুষ চায়।

একদিন বণিক দেখল, বৌ সেই ভৃত্যকে চুম্বন করছে। স্বামীকে দেখতে পেয়ে বৌ সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে এসে বলল, ও চোর, চুরি করে জিনিস খায়, আমি ওর মুখের গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারলাম ও কপূর চুরি করে খেয়েছে।

শাস্ত্রে বলে, নারীর আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ, বুদ্ধি চারগুণ, শ্রমের শক্তি ছয়গুণ আর কামস্পৃহা আটগুণ।

বৌয়ের কথা শুনেই ভৃত্য বলল, এ বাড়িতে থাকা যায় না। প্রভুর বৌ যদি সবসময় ভৃত্যের মুখের গন্ধ শোঁকে, তাহলে সে বাড়িতে থাকব কেমন করে?

এই বলে সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। বোকা বণিক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনল, কাজে বহাল করল।

পঞ্চতন্ত্রের প্রভাবেই কি নারায়ণ এই ধরনের কাহিনী শুনিয়েছেন। নাকি এটাও প্রক্ষিপ্ত কাহিনী? সমাধান সম্ভব নয়। মিত্রলাভের পঞ্চম কথায় কৌশাম্বী নগরীর বৃদ্ধ বণিকের যৌবনবতী স্ত্রীর কাহিনী রয়েছে। বক্তব্য একই। সুহৃদ্‌ভেদ-এর ষষ্ঠ কাহিনী হল গোপ ও কুলটা স্ত্রী। একটি বিকৃত মানসিকতার কুৎসিত কাহিনী। কোন্ নীতি-উপদেশ দিলেন নারায়ণ?

পঞ্চতন্ত্র শেষ হয়েছে পশুকথা দিয়ে। কিন্তু হিতোপদেশের শেষাংশ বেশ অভিনব।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, বল, তোমাদের আর কি বলব?

রাজপুত্রেরা বলল, গুরুদেব, আপনার অনুগ্রহে আমরা রাজ্য পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেছি।

বিষ্ণুশর্মা বললেন, যদি তাই হয়, তবে সৎ জন বিপদ থেকে মুক্ত হোক, পুণ্যবানদের কীর্তি আরও বাড়ুক। রাজ্যনীতি বারবিলাসিনীর মতো সবসময় মন্ত্রীদের বুকে থেকে মুখচুম্বন করুক, রাজ্যে নিত্য মহোৎসব হোক।

যতদিন হিমালয়কন্যা পার্বতী চন্দ্রমৌলে বিরাজিতা, যতদিন বিষ্ণুর বক্ষে লক্ষ্মী লীলা করবেন, যতদিন স্বর্ণাচল মেরু অক্ষয় থাকবে,—ততদিন প্রচারিত থাকবে নারায়ণ রচিত 'সংগ্রহোহয়ং কথানাম।'

যিনি সযত্নে এই 'সংগ্রহ' রচনা করিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন, সেই শ্রীমান ধবলচন্দ্র শত্রুর ওপর বিজয়লাভ করুন।

গ্রন্থশেষের এই দুটি শ্লোক খুব তাৎপর্যপূর্ণ। গ্রন্থকারের নাম, পৃষ্ঠপোষকের নাম লিখিত রয়েছে। তার চেয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গ্রন্থকার নিজের গ্রন্থকে দুবারই 'সংগ্রহ' বলে উল্লেখ করেছেন। হিতোপদেশের কাহিনীগুলির রূপ-রীতি-মোটিফ বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, এগুলি লোককথা। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীতেও এগুলির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। আর গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থটিকে সংগ্রহ-গ্রন্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে নারায়ণ শ্লোকের আধিক্য ঘটান নি। এগুলি সংখ্যায় কম হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখানে কথক নারায়ণের বৈশিষ্ট্য

সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। লোকঐতিহ্যের মৌলিক রীতিটিও রক্ষিত হয়েছে।

সুহৃদ্‌ভেদ-এর তৃতীয় কথার পশুকথাটি একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। এক পাহাড়ে থাকত এক সিংহ। সে ক্লান্ত হয়ে যখন গুহায় শুয়ে থাকত, তখন এক ইঁদুর এসে তার কেশরের আগা কেটে দিত। প্রতিদিনই এভাবে ইঁদুর সিংহকে বিরক্ত করত। আর কেশরের আগা কাটা দেখে সিংহও ভীষণ রেগে যেত কিন্তু ইঁদুরকে ধরতে পারত না। সিংহ একটু নড়লে কিংবা চোখ মেলে চাইলেই ইঁদুর টুক্‌ করে গর্তের মধ্যে ঢুকে পড়ত।

সিংহ ভাবল, এভাবে তো হবে না। অত ছোট প্রাণীকে আমি মারব কেমন করে? ওকে মারতে হলে ওর সমান একজন যোদ্ধা দরকার। এই মনে করে সে পাশের এক গাঁয়ে গেল। সেখানে এক বেড়ালের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাকে গুহায় নিয়ে এল। বেড়ালকে গুহায় থাকতে বলল। প্রতিদিন তাকে প্রচুর মাংস খেতে দিত। মহা সুখে রয়ে গেল বেড়াল।

যেদিন বেড়াল এল, সেদিন থেকে আর ইঁদুরের দেখা নেই। সে গর্ত থেকে উঁকিও দেয় না, সিংহের কেশরও ঠিক রইল। কেশর ফুলিয়ে সিংহ নিশ্চিন্তে ঘুমোতে লাগল। ইঁদুরের খুট্‌খুট্‌ শব্দ যদি কখনও সিংহের কানে যেত, অমনি সিংহ বেড়ালকে বেশি বেশি মাংস দিত।

কিন্তু আর কতকাল সহ্য করা যায়! পেটের ভেতরে যে আগুন জ্বলছে। এভাবে গর্তের মধ্যেই কি মরে পড়ে থাকতে হবে! শেষকালে খিদে সহ্য করতে না পেরে ইঁদুর গর্ত থেকে বের হল, মাথা ঘুরছে, শরীর বড় ক্লান্ত। খাবারের খোঁজে এদিক-ওদিকে চাইল। হঠাৎ বেড়াল ধেয়ে এল, ইঁদুর মরে গেল।

সিংহ আর ইঁদুরের শব্দ পায় না। অনেকদিন হয়ে গেল। সিংহ বুঝতে পারল। তার তো আর বেড়ালকে প্রয়োজন নেই! তাকে আর আগের মতো খেতে দিত না, তার দিকে তাকিয়েও দেখত না। বড় দুর্বল হয়ে পড়ল বেড়াল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্‌চা, নানাই ও নেনেত আদিবাসী, এস্কিমো, আফগানিস্তানের কাফির ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন আদিবাসীর মধ্যে এই পশুকথা রয়েছে। অবশ্য ভারতের বাইরের পশুকথায় সিংহ নেই, আছে শেয়াল। ইঁদুর তাকে বিরক্ত করত।

নারায়ণ যে অপরূপ মনোগ্রাহী লোককথা সংকলন করে লিখিত রূপ দিতে জানেন তার পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থের কয়েকটি কথায়। লোককথা সংগ্রাহক হিসেবে হিতোপদেশের সম্পাদক নারায়ণও তার ভাবগুরু বিষ্ণুশর্মার মতোই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষের লোককথা সংগ্রাহকদের মধ্যে গুণাঢ্য একটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লোকসমাজের মৌখিক ভাষায় লোককথা সংকলন করেছিলেন। যে ভাষায় পিতামহ-পিতামহী উত্তরপুরুষকে প্রাণের আপন সম্পদ লোককথা শোনান, হুবহু সেই লৌকিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন গুণাঢ্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে লিখিত সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাবের যুগে তিনি পৈশাচী ভাষাতেই তার লোককথা লিপিবদ্ধ করে যান। এ এক সাহসিক ব্যতিক্রম। অবশ্য তার ফলও তাকে ভোগ করতে হয়েছে। তার সম্পাদিত বৃহৎকথার কোনো পুথি আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। বস্তুবাদী চার্বাক-পন্থীদের যেমন সমস্ত পুথি ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, জনগণের মৌখিক ভাষায় লিখিত গুণাঢ্যের গ্রন্থেরও কি সেই একই দশা ঘটেছিল? অন্তত গুণাঢ্যকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তি রয়েছে তার মধ্যে এই সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়।

চার্বাক-পন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্যই তাদের কিছু বক্তব্য পরবর্তী কালের গ্রন্থেও সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাদের মূল গ্রন্থগুলি ভস্মীভূত হয়েছিল। গুণাঢ্যের পুথির কি পরিণতি ঘটেছিল তার কোনো ইতিহাস নেই। তবে, পিতার মৃত্যুর পরে যেমন তার চিন্তা-ভাবনা-আদর্শ পুত্রের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে, তেমনি গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথার' 'মৃত্যু'র পরে অনেক গ্রন্থে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে। চার্বাক-পন্থীদের যেমন বিরূপতা সহ্য করতে হয়েছিল পরবর্তী যুগে, গুণাঢ্যকে তা সইতে হয়নি। সকলেই পরম শ্রদ্ধায় গুণাঢ্যের নামের উল্লেখ করেছেন।

এক সময় কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত গুণাঢ্যের অস্তিত্ব সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। এরা বাল্মীকি-বেদব্যাস সম্পর্কেও একই মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু গুণাঢ্য সম্পর্কে এই ধরনের সংশয়ের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষে বৃহৎকথার উল্লেখ রয়েছে বারবার, গুণাঢ্য সম্পর্কে রয়েছে সভক্তি উক্তি। কবি বাণভট্ট জানিয়েছেন, সেকালে উজ্জয়িনীর অধিবাসীবৃন্দের অতিপ্রিয় গ্রন্থ ছিল রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথা। কবি গোবর্ধন রামায়ণ মহাভারত ও বৃহৎকথার তিন কবিকে প্রণাম জানিয়ে তার গ্রন্থ সপ্তশতী শুরু করেছেন। গুণাঢ্যের প্রতি এই কবির যে কি অসাধারণ

শ্রদ্ধা ছিল তা উপলব্ধি করা যায় যখন তিনি বলেন, ব্যাসদেব ও গুণাঢ্য একই ব্যক্তি, ব্যাসদেবই পরবর্তী জন্মে গুণাঢ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই জন্মান্তর গ্রহণের বিষয়টিতে হয়তো আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু কবি হিসেবে গুণাঢ্যকে যে সম্মান জানানো হল তাতেই প্রাচীন ভারতবর্ষে গুণাঢ্যের সামাজিক অবস্থান অনুভব করা যায়। 'নেপাল মাহাত্ম্য' গ্রন্থে রয়েছে, গুণাঢ্য বাল্মীকির মতো মহান কবি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এক সময় ভারতীয় সংস্কৃতি ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেছিল। কম্বোজ দেশের একটি শিলালিপি এই সূত্রে স্মরণীয়। নবম শতাব্দীর এই শিলালিপিটি সংস্কৃতে উৎকীর্ণ। এতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত কবিদের নাম লিখিত রয়েছে আর এইসব কবির নামের মধ্যে একটি নাম রয়েছে, সে নাম গুণাঢ্যের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতি-বলয়েও গুণাঢ্যের খ্যাতি যে ছড়িয়ে পড়েছিল তারও অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। দশরূপ ও নলচম্পা গ্রন্থে এবং বাসবদত্তা গ্রন্থের কুসুমপুর বর্ণনায় বৃহৎকথার উল্লেখ আছে। আর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর।

এত সব লিখিত প্রমাণের পরে গুণাঢ্যের অস্তিত্বকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। শুধু কষ্ট হয় এই ভেবে, এই মহৎ জনদরদী কবির কোনো পুঁথি আজও আবিষ্কৃত হল না। লোকসমাজের ভাষাকে, ব্রাত্যজনের লৌকিক সংস্কৃতিকে যিনি এমনভাবে মর্যাদা দিলেন তার সংকলিত পুঁথি কোথায় হারিয়ে গেল!

যে কবির পুঁথি পাওয়া যায়নি তার অস্তিত্বের সময়সীমা নির্ধারণ করা বড় সহজ নয়। কিন্তু অন্যান্য উৎস থেকে গুণাঢ্যের কাল নির্ণয় করেছেন পণ্ডিতেরা। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সমবয়সী। হর্ষের জন্ম ৫৯০ খ্রীস্টাব্দে, বাণভট্টেরও কাছাকাছি সময়ে। সেই বাণভট্ট যখন গুণাঢ্যের উল্লেখ করেছেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে বাণভট্টের পূর্ববর্তী কবি। বাণভট্টের কাদম্বরীতে উজ্জয়িনী নগরীর বর্ণনায় রয়েছে, বৃহৎকথাকুশলেন; আর হর্ষচরিতে রয়েছে, হরলীলেবলোকস্যাবিস্ময়ায় বৃহৎকথা। পণ্ডিতেরা বলেছেন, কবি গুণাঢ্য খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন।

কবি গুণাঢ্য ও বৃহৎকথা সম্পর্কে সেইকালে যে কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল তার বিস্তৃত কাহিনী রয়েছে সোমদেব ভট্টের কথাসরিৎসাগর গ্রন্থে।

গুণাঢ্য শাপগ্রস্ত একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবী পার্বতী এই শাপ দিয়েছিলেন।

নগাধিরাজ হিমালয়ের এমন মহিমা ছিল যে ত্রিজগতের জননী পার্বতী তার কন্যাত্ব স্বীকার করেছিলেন। সেই পার্বতী একদিন একান্তে শিবের কোলে মাথা রেখে শুয়ে রয়েছেন, এমন সময় পার্বতী বললেন, আমি একটা নতুন

কাহিনী শুনতে চাই। শিব বললেন, বর্তমান ভূত এবং ভবিষ্যতে এমন কোনো কাহিনী নেই যা পার্বতী জানে না। শিবের সোহাগে শিবপ্রিয়া প্রীতা হলেন, বারবার অনুরোধ জানালেন। শিব তখন ব্রহ্মা-নারায়ণ-দক্ষ প্রভৃতির কথা শোনালেন। কিন্তু এসব কাহিনী পার্বতীর জানা। তখন শিব বললেন, এইবার তোমাকে সেই নতুন কথা শোনাব। আদেশ দেওয়া হল, তারা যেখানে আছেন সেই রুদ্ধদ্বারে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। নন্দী দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন আর শিব একান্তে পার্বতীকে কাহিনী বলতে লাগলেন।

শিব ভেতরে গল্প করছেন, তখন তার প্রিয় সহচর পুষ্পদন্ত সেখানে এল। নন্দী তাকে ভেতরে যেতে নিষেধ করল। আর তখনই পুষ্পদন্তের কৌতূহল গেল বেড়ে। সে যোগবলে অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকল ও সব কাহিনী শুনল। এমন সুন্দর কাহিনী কি কাউকে না বলে থাকা যায়? পুষ্পদন্ত স্ত্রী জয়াকে সেইসব কাহিনী বলল। মেয়েরা তো কোনো কথাই গোপন করতে পারে না। জয়া পার্বতীকে সব কাহিনী বলল। পার্বতী ভাবলেন, তাহলে শিব তো তাকে অজানা কোনো কাহিনী বলেন নি? শিব বললেন, পুষ্পদন্ত অদৃশ্য হয়ে ঘরে ঢুকে কাহিনী শুনেছে, তারপরে বলেছে জয়াকে। জয়া ও পুষ্পদন্ত ছাড়া আর কেউ ওসব কাহিনী শোনে নি।

দেবী পার্বতী পুষ্পদন্তকে ডাকলেন, কাঁপতে কাঁপতে সে এল। দেবী অভিশম্পাত দিলেন, তুই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করবি।

শিবের অন্য সহচর মাল্যবান পুষ্পদন্তের হয়ে কথা বললে দেবী তাকেও অভিশাপ দিলেন।

শেষে রাগ পড়ে এলে পার্বতী বললেন, কুবের শাপ দিয়েছিলেন যক্ষ সুপ্রতীককে, সে এখন পিশাচ-যোনি প্রাপ্ত হয়ে কাণভূতি নামে বিন্ধ্যপর্বতে বাস করছে। তার সঙ্গে দেখা হলে আগের কথা স্মরণ করে এই কথা তাকে বললে পুষ্পদন্ত তুমি শাপমুক্ত হবে। আর মাল্যবান যখন এই কাহিনী কাণভূতির কাছে শুনবে তখন কাণভূতির শাপমুক্তি ঘটবে এবং মাল্যবান তুমি এই কাহিনী পৃথিবীতে প্রচার করলে তোমারও শাপমুক্তি ঘটবে।

একদিন গৌরী শিবকে বললেন, যে দুজন শ্রেষ্ঠ প্রমথকে অভিশাপ দিয়েছিলাম, পৃথিবীতে তারা কোথায় জন্মেছে?

শিব বললেন, প্রিয়ে, পুষ্পদন্ত কৌশাম্বী মহানগরে বররুচি নামে আর অন্যজন মাল্যবান সুপ্রতিষ্ঠিত নামক নগরে গুনাঢ্য নামে জন্মগ্রহণ করেছে।

অনুরক্ত অনুচরদের অবমাননার কথা মনে পড়াতে বিষণ্ণ চিত্তে এই কথা বলে কল্পতরু বৃক্ষশাখা দ্বারা আচ্ছাদিত কৈলাস পর্বতের সানুদেশে লীলাকুঞ্জে শিব আপন দয়িতার সঙ্গে বাস করতে লাগলেন।

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে গুণাঢ্য পিশাচদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। তিনি পিশাচদের ভাষা শিখলেন। তারপরে পৈশাচী ভাষায় সাত লক্ষ শ্লোকে সপ্তবিদ্যাধর কাহিনী রচনা করলেন। সাত বছর সময় লাগল। বিদ্যাধরেরা যাতে এইসব শ্লোক চুরি করতে না পারে তার জন্য কালির অভাবে মহাকবি নিজের রক্ত দিয়ে এ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি ভাবলেন, এই বৃহৎকথা আমাকে পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে। তখন গুণদেব ও নন্দীদেব নামে তার দুই শিষ্য বললেন, কেবলমাত্র শ্রুতকীর্তি রাজা সাতবাহনই এই কাব্য প্রচার করতে পারবেন। কেননা, তিনি রসগ্রাহী, অনিল-চালিত পুষ্পের সুগন্ধির মতো তিনি এই কাব্য দিকে দিকে প্রেরণ করতে পারবেন।

তখন গুণাঢ্য এই দুজন শিষ্যের হাতে পুথি দিয়ে রাজার কাছে পাঠালেন। বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা বললেন, সাত লক্ষ শ্লোক খুবই মূল্যবান, কিন্তু এ নীরস পৈশাচী ভাষায় লিখিত, এই পৈশাচিক কাহিনীকে ধিক।

শিষ্যেরা পুথি নিয়ে ফিরে এল। গুণাঢ্য শোকাহত হলেন। দুজন শিষ্যের সঙ্গে গুণাঢ্য জনবিহীন রম্য শৈলে গিয়ে প্রথমে একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করলেন। তারপর পশু ও পাখিদের কাছে এক এক পাতা পড়েন আর আগুনে ফেলে দেন। পুথির আয়তন কমতে লাগল। শিষ্য দুজন নীরবে কাঁদছেন ও সেই করুণ দৃশ্য দেখছেন। কিন্তু শিষ্যেরা খুব পছন্দ করেছিল বলে নরবাহনদত্তের চরিত অংশটি অবশিষ্ট রাখলেন, গুরু এই এক লক্ষ শ্লোক আগুনে দিলেন না। গুরুদেব যখন এই দিব্যকাহিনী পাঠ করতেন তখন বনের সব পশুপাখি আহার ভুলে গোল হয়ে সেখানে বসে থাকত আর চোখের জলে সিক্ত হয়ে সেই সব কাহিনী শুনত।

এখন হয়েছে কি, রাজা সাতবাহন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বৈদ্যরা বললেন, অপুষ্ট মাংস খেয়েই রাজার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যারা রান্না করে তাদের বকাবকি করা হল, তারা বলল, ব্যাধেরা আমাদের এই মাংসই দিচ্ছে। ব্যাধদের তিরস্কার করা হলে তারা জানাল, অল্পদূরে ঐ যে পাথর রয়েছে, তার ওপরে বসে একজন ব্রাহ্মণ এক এক পাতা কি যেন পড়ছে আর আগুনে দিচ্ছে। সব জন্তু-জানোয়ার ওখানেই বসে থাকে, তারা খাওয়া-দাওয়া ভুলে গিয়েছে। না খেয়ে খেয়ে পশুপাখিরা অমন অপুষ্ট হয়ে পড়েছে।

ব্যাধদের কথা শুনে তাদের দেখানো পথ দিয়ে রাজা চললেন বনে। রাজা গুণাঢ্যকে চিনতে পারলেন। গুণাঢ্য সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বললেন। শেষে জানালেন, ছয় লক্ষ শ্লোক সমন্বিত ছয়টি কাহিনী আমি দগ্ধ করেছি, রয়েছে আর এক লক্ষ শ্লোক। আপনি গ্রহণ করুন। আমার দুই শিষ্য আপনার কাছে শ্লোকের ব্যাখ্যা করবে।

রাজা নিজের কাজের জন্য অনুশোচনা করলেন এবং সপ্তম বিদ্যাধর নরবাহনদত্তের কাহিনীযুক্ত এক লক্ষ শ্লোকের পুথি গ্রহণ

করলেন এবং সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত করে পৃথিবীতে প্রচার করলেন।

কিংবদন্তির মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে কিছু সত্য লুকিয়ে থাকে। বৃহৎকথার মাধুর্য বোঝাতে এখানে মুগ্ধ পশুপাখিকে শ্রোতা করা হয়েছে, এমন অপরূপ কাহিনী যা শুনে তারা খাওয়া-দাওয়ার কথাও ভুলে যায়। গুণাঢ্যের অসাধারণত্ব বোঝাতে তাকে শাপগ্রস্ত দেব-সহচর হিসেবে দেখানো হয়েছে। এসব কিংবদন্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু এর মধ্যে একটি সত্য অন্তত লুকিয়ে রয়েছে, গুণাঢ্য সেকালের ব্রাত্যজনের মৌখিক ভাষাকে তার পুথির ভাষার মাধ্যম করেছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নয়, গুণাঢ্য কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তৎকালীন সমাজে ধিক্কৃত এক ভাষায়। তথাকথিত অন্তজ লোকসমাজের মৌখিক লোকসাহিত্যের ভাষা ছিল এই পৈশাচী। সেইকালে পৈশাচী ভাষায় জনগোষ্ঠীতে প্রচারিত রূপকথা-পশুকথা-প্রেম কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন গুণাঢ্য। লৌকিক মানসিকতার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ ছিল বলেই তিনি এই ভাষা গ্রহণ করেছিলেন। এই পৈশাচী ভাষার সঙ্গে গান্ধারীর খুব মিল ছিল। পৈশাচী ভাষী মানুষ সম্পর্কে সেকালের ধারণা ছিল খুব খারাপ, আট রকমের বিবাহের মধ্যে পৈশাচ বিবাহ অধম, পিশাচ-পৈশাচিক-পৈশাচী শব্দগুলির মধ্য দিয়ে অমানবিক নির্মম পাশবিক ভাবনাই প্রকাশ করা হয়েছে। সেই সময়েই গুণাঢ্য এই ভাষাকেই অবলম্বন করলেন। এই ভাষার প্রতি প্রীতি তাকে সাহসী করে তুলেছিল। আর বিদ্যামদগর্বে গর্বিত রাজা অপবিত্র ভাষাকে শোধন করে নিয়ে তবেই তাকে গ্রহণ করলেন। অপবিত্র ধিক অসংস্কৃত পুথিকে সংস্কার করে সংস্কৃত বৃহৎকথার জন্ম দিলেন।

স্টেন কোনো মন্তব্য করেছেন, গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বিন্ধ্য প্রদেশেই বেশি জনপ্রিয় ছিল। এই এলাকায় প্রাচীন জনবসতি আর্য নয়, এখানে সেই কালে দ্রাবিড় অথবা কোল গোষ্ঠী কিংবা দ্রাবিড়-কোল মিশ্রিত জনজাতির বসতি ছিল। তাই মনে হয় বৃহৎকথার অনেক লোককথা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে।

কোনোর এই অনুমানের কিছু ভিত্তি রয়েছে। গুণাঢ্যের দুই শিষ্যের দৈহিক যে বর্ণনা রাজা দিয়েছেন ও সেই সঙ্গে পৈশাচী ভাষা ব্যবহারের যে প্রসঙ্গ এসেছে তাতে আদিবাসী উৎসটির সম্পর্কে ধারণা করা চলে।

সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত এই বৃহৎকথার কোনো পুথি যদি আবিষ্কৃত হত, তাহলেও আমরা গুণাঢ্যের সংকলিত লোককথার সন্ধান পেতাম। কিন্তু সে পুথিও আবিষ্কৃত হয়নি। গুণাঢ্যের গ্রন্থের পরিচয় পেতে হচ্ছে মূলত অন্য তিনটি গ্রন্থের মাধ্যমে।

প্রথম গ্রন্থটি হল বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ, রচয়িতা বুধস্বামী। নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে পুথিটি আবিষ্কার করেন মহামহোপাধ্যায়

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এই খণ্ডিত পুঁথিতে রয়েছে ৮৫৩৯টি শ্লোক। পুঁথিটি সম্ভবত লেখা হয় অষ্টম-নবম শতকে। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হল একাদশ শতকের বৃহৎকথামঞ্জরী, পুঁথিকার হলেন ক্ষেমেন্দ্র। তৃতীয় গ্রন্থটি হল একাদশ শতকের কথাসরিৎসাগর, রচয়িতা সোমদেব ভট্ট। অন্য উপায় নেই, বুদ্ধস্বামী ক্ষেমেন্দ্র- সোমদেবের গ্রন্থ থেকেই গুণাঢ্যের বৃহৎকথার ভাষান্তরিত রূপের কিছু পরিচয় পেতে হবে।

বৃহৎকথামঞ্জরী

বৃহৎকথার কাশ্মীরী রূপকে অবলম্বন ও অনুকরণ করে সংস্কৃত ভাষায় বৃহৎকথামঞ্জরী লেখেন কবি ক্ষেমেন্দ্র। গ্রন্থটি ছন্দে রচিত। একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে (১০৪০ খ্রীস্টাব্দে) পুঁথিটি সংকলিত হয়। সেইকালে কাশ্মীরে বৃহৎকথার যে পুঁথি প্রচলিত ছিল তার আয়তন নাকি ছিল বিশাল। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন, সাধারণ মানুষ এই বিশাল গ্রন্থের রস সঠিকভাবে উপভোগ করতে পারত না, তাই মূল গ্রন্থের সার-সংক্ষেপ করে রচিত হল তার গ্রন্থ। এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ক্ষেমেন্দ্র চেয়েছিলেন তার পুঁথি সাধারণ মানুষের বোধগম্য হয়ে প্রচারিত হোক। সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পর্কে এই ধরনের আশা পোষণ করা বেশ অভিনব। কেননা, অধিকাংশ গ্রন্থকারই চাইতেন তার পুঁথি বিদগ্ধজনের মন জয় করুক। গুণাঢ্যের মানসিকতার যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র।

ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে আঠারটি লম্বক বা অধ্যায় রয়েছে, এই একই সংখ্যক লম্বক রয়েছে সোমদেবের গ্রন্থে। প্রথম পাঁচটি লম্বক দুই গ্রন্থেই একই রকমের কিন্তু পরবর্তী লম্বকগুলিতে দুজন একই পারম্পর্য রক্ষা করেননি। তবে দুটি গ্রন্থের কাহিনী, পাত্রপাত্রী, সমাজচিত্র, বিন্যাস-পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা করলে অনুভব করা যায়, দুজনের গ্রন্থের উৎস একই। সম্পাদনার সময় স্বাভাবিকভাবেই দুজন সংকলক দুভাবে তাদের গ্রন্থকে সাজিয়েছেন। ব্যক্তিরুচি সক্রিয় ছিল।

ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ তিরিশ বছর আগে সংকলিত। তাই মনে হয়, তিনি গুণাঢ্যকে বেশি অনুসরণ করেছেন। তার গ্রন্থ প্রচারিত হবার পরে সোমদেব স্বাভাবিক কারণেই কিছুটা স্বতন্ত্র হতে চাইবেন। বিশাল ভারতবর্ষের দুপ্রান্তে এই দুটি গ্রন্থ সংকলিত হলে মাত্র তিরিশ বছরের মধ্যে হাতে-লেখা পুঁথি অন্যজনের নজরে নাও আসতে পারে। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র ও

সোমদেব দুজনেই কাশ্মীরের মানুষ। তাই মনে হয়, ক্ষেমেন্দ্রের গ্রন্থ থেকে তার গ্রন্থের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সোমদেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

দুজনের সম্পাদিত গ্রন্থেই আমরা পাচ্ছি একই নামের আঠারটি লম্বক। কথাপীঠ কথামুখ লাবানক নরবাহনদত্তজনন চতুর্দারিকা সূর্যপ্রভ মদনমঞ্চুকা বেলা শশাঙ্কবতী বিষমশীল মদিরাবতী পদ্মাবতী পঞ্চ রত্নপ্রভা অলঙ্কারবতী শক্তিযশ মহাভিষেক সুরতমঞ্জরী। দুজনের সাজানো ক্রম অবশ্য এক নয়।

তাই লোককথাগুলির বিশ্লেষণ করবার সময় দুটি গ্রন্থ একই সঙ্গে আলোচনা করা দরকার। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, সোমদেব অনেক পরিণত সম্পাদক।

কথাসরিৎসাগর

গুণাঢ্যের বৃহৎকথাকে অবলম্বন করে যে কটি গ্রন্থ পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে, কথাসরিৎসাগর তাদের মধ্যে আয়তনে যেমন সবচেয়ে বড় তেমনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সোমদেব তার গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন, অশেষ পদার্থ যার আলোকবর্তিকায় দীপ্ত হয়, সেই বাগ্‌দেবীকে প্রণাম করে 'বৃহৎকথার' সার সংগ্রহ করে এই আখ্যায়িকা রচনা করছি। পূর্বসূরীর প্রতি অকপট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন সোমদেব।

আঠারটি লম্বকের নাম বলার পর বৃহৎকথা সম্পর্কে সোমদেব আবার বলেছেন, এই গ্রন্থ মূলানুযায়ী। মূল গ্রন্থকে কোথাও লঙ্ঘন করা হয়নি। এমন ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে মূল গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত আকারে গ্রথিত হতে পারে। অন্বয়ের ঔচিত্য এবং কাব্যাংশের যোজনা দ্বারা গল্পের রস যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। নিজের পাণ্ডিত্য দেখাবার প্রয়াস না করে যাতে নানা গল্পের সমন্বয় করা যায় সেই চেষ্টাই করেছি।

এই স্বীকারোক্তির মধ্যে রয়েছে বিনয়, অন্যধারে গ্রন্থকারের সততাও প্রকাশ পেয়েছে,—তিনি মূল গ্রন্থকে লঙ্ঘন করেতে চাননি। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, গুণাঢ্যের গ্রন্থ সোমদেবের কাছে ছিল। তৃতীয় শতকের পুথি একাদশ শতকেও বর্তমান ছিল। সোমদেবের উক্তি থেকেই গুণাঢ্য ও তার বৃহৎকথার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। একাদশ শতকেও যে গ্রন্থের বাস্তব উপস্থিতি জানা গেল, তার বিনষ্টির ইতিহাস বড় বিস্ময়কর।

এই স্বীকারোক্তির পরেই সোমদেব শুনিয়েছেন শিব-পার্বতী-পুষ্পদন্ত-মাল্যবান-গুণাঢ্যের কিংবদন্তি। শুরু হল কথাসরিৎসাগর।

বৃহৎকথামঞ্জরীর তিরিশ বছর পরে ১০৭০ খ্রীস্টাব্দে সংকলিত হয় কথাসরিৎসাগর। কাশ্মীরে তখন রাজত্ব করছেন রাজা অবন্তীবর্মা। কিংবদন্তি রয়েছে, রাজা অবন্তীবর্মার রানী বিদুষী সূর্যবতীর অনুপ্রেরণায় সোমদেব কথাসরিৎসাগর সংকলন করেন। রাজমহিষী নাকি বলেছিলেন, বৃহৎকথামঞ্জরী সুখপাঠ্য গ্রন্থ নয়, আর অতি সংক্ষিপ্ত। তাই সুখপাঠ্য ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করলেন সোমদেব। কাশ্মীরে তখন চরম বিশৃংখলা। রাজপুত্র পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পারিপার্শ্বিক আরও নানা প্রতিকূলতার মধ্যে রানী চরম মানসিক অশান্তির মধ্যে দিনরাত কাটাচ্ছেন। এই অবস্থায় রানীর চিত্ত বিনোদনের জন্য সভাকবি সোমদেব রচনা করলেন তার অমর গ্রন্থ। শোনা যায়, প্রথম বারে পিতা পুত্রকে দমন করেছিলেন, কিন্তু সুযোগ বুঝে পুত্র আবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পুত্রের এই আচরণে মর্মাহত হয়ে রাজা আত্মহত্যা করেন। রানী হন সহমৃতা।

সোমদেব তার গ্রন্থে বলেছেন, গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কাহিনীগুলি লোকের মুখে মুখে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিশ্লেষণ সঠিক নয়। লোকের মুখের কাহিনীই সংকলন করেছিলেন গুণাঢ্য, তাই কয়েক শ' বছর পরে সেইসব কাহিনীর প্রচার দেখে সোমদেবের এই ভুল ধারণা জন্মেছিল। যে পুঁথি সংস্কৃতে লেখা কিংবা পৈশাচীতেও যদি লেখা হয় তা সেইকালে ব্যাপকভাবে প্রচারের কোনো অনুকূল পরিবেশ বা মাধ্যম ছিল না। আসলে, লোকসমাজের সম্পদ ও মানসিকতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য থেকেই এই বিপরীত ধারণা জন্মায়। এই গ্রন্থের প্রথমাংশে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

কথাসরিৎসাগরে রয়েছে বাইশ হাজার শ্লোক। ছোট-বড় প্রায় নয় শ'টি কাহিনী এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি, বৌদ্ধ জাতক, পঞ্চতন্ত্রে এমন কাহিনী রয়েছে যার সন্ধান পাওয়া যাবে পরবর্তী-কালের কথাসরিৎসাগরে। মূল উৎস লোকসমাজ থেকেই এগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বৃহৎকথামঞ্জরী কিংবা কথাসরিৎসাগরের মূল কাহিনী হয়তো উচ্চতর লিখিত সাহিত্যের বিষয়। সোমদেব মূল কাহিনী যে বিষয়কে কেন্দ্র করে গ্রথিত করেছেন, তা হল উদয়ন-বাসবদত্তা-পুত্র নরবাহনদত্ত-পুত্রবধূ মদনমঞ্চুকার কাহিনী। কিন্তু এই কাহিনীর মালা গাঁথতে গিয়ে তিনি অসংখ্য লোককথা পশুকথা-কিংবদন্তিকে সংকলন করেছেন। লোকসংস্কৃতি আলোচনার প্রসঙ্গে তাই বৃহৎকথা-বৃহৎকথামঞ্জরী-কথাসরিৎসাগর এত গুরুত্বপূর্ণ। কথাসরিৎসাগরে বীরত্ব ও প্রেমই মূল চালিকাশক্তি, কিন্তু লোকজীবনের মৌখিক

সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জনমানসের অপরূপ দর্পণ হিসেবেও গ্রন্থটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই গ্রন্থে বৎসরাজ উদয়ন ও চণ্ডমহাসেনের কন্যা রানী বাসবদত্তার যে অপরূপ প্রেমকাহিনী হাজার বছর ধরে ভারতীয়, ইরানীয়, আরবীয় ও ইউরোপীয় রসিক পাঠককে মুগ্ধ করে এসেছে, সেই কাহিনীর প্রাচীনতম ও সরল রূপটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী অথবা তারও পূর্ববর্তী পালি 'জাতকথা কথা'য়।

এই উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনী সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এই আখ্যায়িকা প্রথম থেকেই প্রাচীন যুগে ভারতীয় জনগণের হৃদয় অধিকার করে অতিমাত্রায় সর্বজনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরে স্তূপতিশিল্পের ও অন্যান্য শিলাপটের ক্ষোদিত চারুকলায় যে সপ্তম ভারতীয় কাহিনী রূপলাভ করেছিল, এই আখ্যায়িকা থেকে গৃহীত বিষয়বস্তুসমূহ তার সুপ্রাচীন নিদর্শন। আনুমানিক খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাস তার মেঘদূত কাব্যে এই প্রাচীন কাহিনীর জনপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। রামায়ণ কাহিনীর সাম্প্রতিক গবেষকদের কারও কারও মতে এই আখ্যায়িকাটি হয়তো রামসীতার কাহিনীর পূর্ণ আকার পাওয়ার আগেই প্রচলিত ছিল।

তাহলে কি এই অনুমান সত্য যে, উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীর আদি বীজ নিহিত ছিল লৌকিক ঐতিহ্যে? লৌকিক উৎস থেকে এই কাহিনী যখন বিদগ্ধ নাগরিক কবিদের হাতে পড়ল, তখন থেকেই এর বিবর্তন শুরু হল? 'জাতকথা কথা'য় রয়েছে বলেই শুধু নয়, এর সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তার জন্যও বিষয়টি একেবারেই অনুমান-নির্ভর নয় বলেই মনে হয়।

সোমদেব ভট্ট ছিলেন রাজসভার কবি, বিদগ্ধ পণ্ডিত। তাই তার গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে কবির সমশ্রেণীভুক্ত ও সমমানসিকতাভাবাপন্ন পাত্রপাত্রী। নাগরিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, বারাণসী-পাটলিপুত্র-উজ্জয়িনী-কৌশাম্বী-শ্রাবস্তী নগরীর অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেক তথ্য রয়েছে। রাজা-রানী-অমাত্য-বণিক-সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী-বৌদ্ধ ভিক্ষু-পতিতা-জুয়াড়ী প্রভৃতির অসংখ্য কাহিনী রয়েছে। কিন্তু এসবের মধ্যেই লৌকিক কাহিনীও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাজসভার বিদগ্ধ পণ্ডিত-কবি আমাদের যখন লৌকিক ঐতিহ্যের কাহিনী শুনিয়েছেন তখন তার মধ্যে সংকলক-সম্পাদকের পরিশীলিত ভাবনা কাজ করেছে। অনেক সময়েই লৌকিক মানসিকতার মধ্যে নাগরিক বোধ প্রাধান্য বিস্তার করেছে। তবুও লোকঐতিহ্যের স্বরূপটি চিনে নিতে খুব অসুবিধা হয় না। কাহিনীর মূল কাঠামোটি বিশ্লেষণ করলেই তা ধরা পড়ে।

জাতকের আলোচনায় চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক গল্পটি বলেছি। কথাসরিৎসাগরে 'মূষিক বণিকের কথা' রয়েছে প্রথম লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে। কাহিনীটি হল ঃ

এক বণিক ছিল। তার জন্মের আগেই তার বাবা মারা যায়। শরিকরা

তার মায়ের সবকিছু দখল করে নিল। বণিক তখন মায়ের পেটে, ছেলের যদি কোনো ক্ষতি করে ওরা এই ভেবে তার মা তার বাবার এক পুরনো বন্ধুর বাড়ি চলে গেল। সেখানে বণিকের জন্ম হল। দিনরাত খাটত সেই মা, অনেক কষ্টে আধপেটা খেয়ে মা ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করল। বণিক লেখাপড়া শিখল। একদিন শিক্ষক বললেন, তুমি বণিকের ছেলে, এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দাও। বিশাখিল রাজ্যে এক মহাধনী বণিক আছে। তুমি তার কাছে যাও, তার কাছ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে বাণিজ্য কর।

বণিক গেল মহাধনী বণিকের বাড়ি। বাড়িতে ঢুকেই সে শুনতে পেল, মহাধনী অন্য এক বণিকপুত্রকে রেগে বলছে, যার চেষ্টা আছে সে এই মরা ইঁদুরকে নিয়েও ধনলাভ করতে পারে। তোমাকে যে এত টাকা দিলাম, তা দিয়ে আরও অর্থ উপার্জন করতে পারলে না, উলটে সবই খরচ করে ফেললে? অপদার্থ কোথাকার!

এই কথা শুনে গরিব বণিক বলল, আগাম কিছু অর্থ দিয়ে আমি এই ইঁদুরটা আপনার কাছ থেকে কিনে নিলাম।

এক বণিকের বেড়ালের জন্য দরকার পড়ল একটা ইঁদুরের। বণিক দু'মুঠো ছোলা নিয়ে মরা ইঁদুর তাকে দিয়ে দিল। সেই ছোলা গুঁড়িয়ে এক কলসী জল নিয়ে বণিক নগরের বাইরে এক গাছের নিচে বসে রইল। কাঠুরিয়ারা সেই ছোলা-জল খেয়ে তাকে দু'টুকরো কাঠ দিল। সেই কাঠ বিক্রি করে আরও বেশি ছোলা কিনে জল বয়ে নিয়ে গিয়ে সেখানে বসে রইল। কাঠুরিয়ারা আরও কাঠ দিল। এমনি করে তার পুঁজি বাড়তে লাগল। শেষকালে সে নিজেই অনেক কাঠ কিনল। হঠাৎ বর্ষা নামল। বৃষ্টি আর থামে না। কাঠের খুব অভাব দেখা দিল। আকালের দিনে সেই কাঠ বিক্রি করে বণিক অনেক টাকা পেল। সেই টাকা দিয়ে বণিক একটা দোকান খুলে ব্যবসা করতে লাগল। ধীরে ধীরে সেই দোকান থেকে সে খুব ধনী হয়ে উঠল। একদিন সে একটা সোনার ইঁদুর তৈরি করে মহাধনীকে উপহার দিল। মহাধনী সব শুনে নিজের মেয়ের সঙ্গে বণিকের বিয়ে দিল।

চুল্লকশ্রেষ্ঠি-জাতক কাহিনীটি বেশ জটিল, আর এই কাহিনীটি খুব সরল। সোমদেব যদি জাতকের কাহিনীটি থেকে এই কাহিনী গ্রহণ করতেন তাহলে এত পরিবর্তন ঘটত না। অথচ বোঝা যাচ্ছে, দুটি কাহিনীর গড়ন, পাত্রপাত্রী, বিন্যাস ও মূল বক্তব্য একই। আসলে, একই লোককথার দুটি ভিন্ন রূপ, অঞ্চলভেদে দুরকম কাহিনী গড়ে উঠেছে। জাতককার একটি এলাকা থেকে তার কাহিনী সংগ্রহ করেছেন আর সোমদেব অন্য এলাকা থেকে তার কাহিনী সংগ্রহ করেছেন। যদি গুণাঢ্যের গ্রন্থ এই কাহিনীর উৎস হয়, তবে গুণাঢ্যই অন্য এলাকার গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। লোককথার বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন সংগ্রাহক এভাবেই সংকলন করে থাকেন।

প্রথম লম্বকের ষষ্ঠ তরঙ্গে 'মায়া উদ্যানের কাহিনী'টি একটি কিংবদন্তি। এ ধরনের অসংখ্য কিংবদন্তি ভারতীয় লোকসমাজে ছড়িয়ে আছে। উত্তর-প্রদেশের গাড়োয়াল এলাকায়, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার তুম্বুনি এলাকায় ও বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ঈশ্বরদিতে এই ধরনের কিংবদন্তি শুনেছি। অনেক গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এই একইরকম কাহিনী।

নর্মদা নদীর তীরে একজন লোক ছিল। সে ছিল যেমন কুড়ে তেমনি গরিব। তাকে কেউ ভিক্ষেও দিত না। বেঁচে থেকে লাভ কি? সে বেরিয়ে পড়ল। নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন এল এক পাহাড়ী জঙ্গলে। সেখানে ছিল দেবী দুর্গার এক মন্দির। সে ভাবল, লোকেরা দেবীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এখানে পশু বলি দেয়। আমি তো পশুরও অধম। আমি নিজেকেই বলি দেব। এই ভেবে সে একটা খড়্গ তুলে নিল, নিজের গলায় কোপ বসাতে যাবে এমন সময় দেবী তাকে বললেন, তুমি আত্মঘাতী হয়ো না, আমার কাছেই থাকো। সেইদিন থেকে তার খিদে-তেষ্টা চলে গেল। সেখানে থাকতে থাকতে একদিন দেবী বললেন, তুমি অন্য কোথাও গিয়ে একটা সুন্দর বাগান তৈরি কর, এই নাও গাছের বীজ। সে গোদাবরী নদীর পাশে গিয়ে সুন্দর বাগান তৈরি করল। আসলে এই বাগান দেবী দুর্গার কৃপায় এমন সুন্দর হয়ে উঠেছে।

প্রথম লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে 'ইন্দ্র ও শিবিরাজার কাহিনী' শুনিয়েছেন সোমদেব। মহাভারত কিংবা জাতকের কাহিনীর অনুরূপ, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সোমদেব বলেছেন, পৃথিবীতে কখনও কখনও এইরকম ঘটে থাকে। যথা:

অনেক কাল আগে শিবি নামে এক রাজা ছিলেন। তাকে বঞ্চনা করবার জন্য ইন্দ্র বাজপাখির রূপ ধরে মায়াকপোতরূপী ধর্মের পেছনে ধাওয়া করলেন। ভয় পেয়ে কপোত শিবির কোলে লুকিয়ে পড়ল। বাজপাখি মানুষের গলায় বলল, কপোত আমার খাদ্য, আমি ক্ষুধার্ত, কপোতকে আমার হাতে দাও। ওকে না পেলে খিদের জ্বালায় এক্ষুনি আমি মরে যাব। তোমার ধর্ম তখন কোথায় থাকবে?

শিবি বললেন, ওকে আমি আশ্রয় দিয়েছি, এর পরিবর্তে সমান পরিমাণ মাংস তোমায় দিচ্ছি।

বাজ বলল, বেশ তাই হবে। কিন্তু তোমার নিজের দেহের মাংস আমাকে দিতে হবে।

রাজা রাজি হয়ে নিজের দেহের মাংস কেটে তুলাদণ্ডে চাপালেন। কিন্তু কপোতের সমান ওজন আর কিছুতেই হয় না। তখন রাজা নিজেই তুলাদণ্ডে চেপে বসলেন। দৈববাণী হল, সাধু, সাধু, এবার সমপরিমাণ মাংস হল।

তখন ইন্দ্র ও ধর্ম ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজেদের রূপ ধরলেন, রাজাকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন। শিবি আগের দেহ ফিরে পেলেন।

অন্য যে দুটি গ্রন্থে শিবি বা উশীনরের উপাখ্যান রয়েছে তা কিছুটা জটিল। এই সরল কাহিনীটি অনেক বেশি লৌকিক।

প্রথম লম্বকের পঞ্চম তরঙ্গে শিবশর্মার যে কাহিনী রয়েছে তার মূল অংশটি ভারতীয় লোকসমাজে খুব জনপ্রিয়। বোকা রাজার দেশে সন্ন্যাসী ও শিষ্য গিয়েছিল, শিষ্য কিভাবে বিপদে পড়েছিল, তার কাহিনী ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র। গ্রামীণ মানুষের কাছে গল্পটি অতি পরিচিত। কথাসরিৎসাগরে একটু অন্যভাবে কাহিনীটি বলা হয়েছে। কিন্তু বক্তব্য এক। উপস্থাপনের নতুনত্ব ঘটাতে গিয়ে সোমদেব লৌকিক ঐতিহ্যকে কিছুটা ব্যাহত করেছেন।

বহুকাল আগে আদিত্যবর্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তার মন্ত্রীর নাম ছিল শিবশর্মা, সে খুব বুদ্ধিমান। রাজার ছিল অনেক রানী। এক রানী গর্ভবতী হল। রাজা রক্ষীকে জিজ্ঞেস করল, আমি দুবছর অন্তঃপুরে ঢুকিনি, তাহলে রানী গর্ভবতী হল কেমন করে?

রক্ষী বলল, আপনার মন্ত্রী শিবশর্মা ছাড়া কোনো পুরুষ অন্তঃপুরে ঢুকতে পারে না, আপনার আদেশ নেই। তিনিই অবাধে অন্তঃপুরে ঢোকেন।

রাজা মনে মনে চিন্তা করলেন, এই মন্ত্রী রাজদ্রোহী। কিন্তু সবার সামনে আমি যদি একে হত্যা করি, তবে আমার নিন্দে রটবে।

তখন রাজা মন্ত্রীকে পাঠালেন তার বন্ধু এক রাজার কাছে। সেই রাজার নাম ভোগবর্মা। সেইসঙ্গে গোপনে এক দূতকেও ভোগবর্মার কাছে পাঠালেন একটা চিঠি দিয়ে। চিঠিতে লেখা রয়েছে,—শিবশর্মাকে হত্যা করবে।

শিবশর্মা সেই রাজ্যে গেল। দূতও উপস্থিত হল। ভোগবর্মা কিন্তু চিঠি পেয়েই শিবশর্মাকে সব খুলে বললেন। শিবশর্মা তক্ষুনি বলল, আমাকে এখুনি বধ করুন। যদি আপনি আমাকে বধ না করেন, তবে আমি নিজেই আমার মৃত্যু ঘটাব।

ভোগবর্মা এই কথা শুনে বিস্মিত হলেন। বললেন, সে কি কথা? এর তাৎপর্য কি? যদি খুলে না বল তবে আমি তোমায় অভিশাপ দেব।

শিবশর্মা বলল, রাজা, যে দেশের মাটিতে আমাকে বধ করা হবে, বিধির বিধানে সেই দেশে বারো বছর ধরে একটানা খরা হবে, একফোঁটাও বৃষ্টি হবে না।

রাজা ভোগবর্মা নিজের মন্ত্রীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করে বললেন, ঐ রাজা আদিত্যবর্মা আমার রাজ্যের ধ্বংস কামনা করছে। ইচ্ছে করলে মন্ত্রী শিবশর্মাকে হত্যা করবার জন্য সে কি গুপ্তঘাতককে নিয়োগ করতে পারত না? এই মন্ত্রীকে আমরা কোনোভাবেই হত্যা করব না, নিজে যাতে আত্মঘাতী না হয় তাও দেখতে হবে।

রাজা রক্ষী নিয়োগ করলেন, শিবশর্মাকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। নিজের বুদ্ধিবলে শিবশর্মা বেঁচে গেলেন।

তৃতীয় লম্বকের প্রথক তরঙ্গে 'ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা' রয়েছে। একটি সুপরিচিত লোককথা। কালিম্পঙ শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে ফালুকোট নামে একটি গ্রাম রয়েছে। ডাঃ গ্রেহামস্ স্কুলের পাশ দিয়ে পায়ে-চলা পাহাড়ী পথে বেশ কিছুদূর হাঁটলে পডবে এই গ্রাম। সেখানে এক নেপালী বৃদ্ধার মুখে এই কাহিনী শুনেছি। বৃদ্ধা তুঁত গাছে রেশমগুটির চাষ করেন। ওড়িশার চাঁদিপুরে নুলিয়াদের মুখে এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুরে একজন মুসলমান কৃষকের মুখে এই 'কিস্সা' শুনেছি। বাংলার গ্রাম-গঞ্জে প্রকাশিত 'কিস্সা কাহিনীর' অনেক হেটো বইতে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। সোমদেবের হাতে পড়ে কাহিনীটি কিছুটা পরিশীলিত হয়েছে।

জাহ্নবীতীরে এক নগরী আছে, তার নাম মাকন্দিকা। পুরাকালে সেখানে থাকত এক সন্ন্যাসী। সে ছিল মৌনব্রতধারী। ভিক্ষা করে তার জীবন চলত। তার ছিল কিছু সন্ন্যাসী শিষ্য।

একদিন মৌনী সাধু ভিক্ষা করতে এসেছে এক বণিকের বাড়িতে। বণিকের সুন্দরী কুমারী মেয়ে ভিক্ষা দিতে দোরে এল। তার রূপ দেখে সাধুর মনে কুচিন্তা জেগে উঠল। বলে ফেলল, হায়! কি কষ্ট!

তার কথা বণিকের কানে গেল। বণিক অবাক হল। বেরিযে এসে বলল, আপনি মৌনব্রত ভেঙে কথা বলে উঠলেন কেন?

সাধু বলল, তোমার ঐ মেয়ের অনেক অশুভ লক্ষণ আছে। এই মেয়ের বিয়ে দিলে তুমি, তোমার বৌ, তোমার ছেলেরা সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তুমি আমার ভক্ত বলে তোমার মঙ্গল চিন্তা কবেই আমি ঐ কথা বলেছি, তোমার জন্যই আমার ব্রত ভেঙেছি। আজ রাতে তুমি তোমার মেয়েকে একটা কাঠের সিন্ধুকে ভরে তার ওপরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবে। যদি বাঁচতে চাও।

'তাই করব সাধুবাবা,'—এই কথা বলে বণিক ঘরে চলে এল। খুব কষ্ট হতে লাগল, তবু সাধুর কথামতো বণিক তাই করল।

এদিকে আশ্রমে ফিরে এসে সাধু শিষ্যদের বলল, তোমরা গঙ্গাতীরে যাও। দেখবে, একটা কাঠের সিন্ধুক ভেসে যাচ্ছে, তার ওপরে প্রদীপ জ্বালানো। গোপনে সেই সিন্ধুক এখানে নিয়ে আসবে। সিন্ধুকের ভেতরে যদি কোনো শব্দও শুনতে পাও তবু সিন্ধুক খুলবে না।

আদেশ পেয়ে শিষ্যেরা চলে গেল গঙ্গার তীরে।

এখন হয়েছে কি, শিষ্যেরা গঙ্গার তীরে পেঁছিবার আগেই এক রাজপুত্র এল গঙ্গার তীরে। সে এসেছিল স্নান করতে। প্রদীপ-জ্বালা সেই

সিন্ধুক দেখতে পেয়ে রাজপুত্র তার পরিচারকদের আদেশ দিল, ওটাকে তীরে নিয়ে এস। সিন্ধুকের ডালা খুলে রাজপুত্র অবাক হয়ে গেল। মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজপুত্র তাকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করল। তারপরে সিন্ধুকের মধ্যে দুর্দান্ত এক বানরকে ঢুকিয়ে আবার জলে ভাসিয়ে দিল।

রাজপুত্র-মেয়ে সেখান থেকে চলে গেলে শিষ্যেরা গঙ্গাতীরে এল। সিন্ধুক দেখতে পেয়ে তীরে নিয়ে এল, তারপরে নিয়ে গেল সাধুর কাছে।

সাধুর মনে আর আনন্দ ধরে না। সে বলল, আমি এই সিন্ধুক নিয়ে আশ্রমের ওপরের তলায় যাচ্ছি, একে মন্ত্র পড়ে শুদ্ধ করতে হবে। তোমরা সবাই নিচের তলায় থাকো।

বণিকের সুন্দরী মেয়েকে দেখবার জন্য সাধু ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সিন্ধুকের ডালা খুলে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেরিয়ে এল সেই দুর্দান্ত বানর। বানর রেগে গিয়ে আক্রমণ করল সাধুকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে তার নাক কেটে নিল, নখ দিয়ে খামচে তার কান ছিঁড়ে নিল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সাধু নিচে নেমে এল। তার অবস্থা দেখে শিষ্যেরা অতিকষ্টে হাসি চেপে রইল। তার পরের দিন সাধুর অবস্থা শুনে সবাই হাসতে লাগল। বণিক খুব খুশি হল,—যাক, তার মেয়ে খুব ভালো বর পেয়েছে।

সোমদেবের বলা এই কাহিনী বেশ পরিশীলিত। কিন্তু লোককথায় যা শুনেছি ও হেটো বইতে যা পড়েছি তা অনেক বেশি স্থূল। সেইসব কাহিনীতে সাধু বা ফকিরের দেহগত কামনার কথা অতি স্পষ্টভাবে গ্রামীণ ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ষষ্ঠ লম্বকের সপ্তম তরঙ্গে একটি পশুকথা রয়েছে, 'বৈজি-পেঁচা-বেড়াল ও ইঁদুরের কাহিনী'। এই গ্রন্থের 'মহাভারতের পশুকথা-রূপকথা' অংশে ইঁদুর পলিত-বেড়াল লোমশ-বৈজি হরিত-পেঁচা চন্দ্রকের যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছি সেই একই পশুকথা রয়েছে কথাসরিৎসাগরের এই কাহিনীর মধ্যে। শুধু মহাভারতে গভীর তত্ত্বকথার প্রাধান্য রয়েছে, ইঁদুর-বেড়ালের কথাবার্তার মধ্যে রাজনীতি-ব্যবহারনীতি প্রকাশ পেয়েছে, আর সোমদেবের গ্রন্থে সরলভাবে পশুকথাটি শোনানো হয়েছে। শেষে রয়েছে নীতিকথার একটি বাক্য,—অবস্থাবশে শত্রু কখনও মিত্র হয়, কিন্তু চিরকাল সে মিত্র থাকে না। মহাভারতে ইঁদুর-বেড়ালের সংলাপের মাধ্যমে এক ধরনের নাটকীয়তা সৃষ্টি করেছেন মহাভারতকার, আর সোমদেব লৌকিক পশুকথাটি সোজাসুজি বলেছেন। সোমদেবের সংকলিত কাহিনীটি বেশি লৌকিক।

কথাসরিৎসাগরে লিপিবদ্ধ এই ধরনের অসংখ্য কাহিনী বিশ্লেষণ করে ও তাদের মোটিফ-রূপরীতি বিচার করে বোঝা যায়, সোমদেব লৌকিক ঐতিহ্যের

সম্পদের ওপরে ব্যাপকভাবে নির্ভর করেছিলেন। এবং অন্যভাবে বলা যায়, গুণাঢ্য যে লোকঐতিহ্যের মৌখিক সম্পদকে তার গ্রন্থে সংকলিত করেছিলেন, সোমদেব 'মূলানুযায়ী' সেই গ্রন্থের 'সার সংগ্রহ' করে এবং মূল কাহিনীগুলিকে কোথাও 'লঙ্ঘন' না করে এইসব কাহিনী 'গ্রথিত' করলেন।

ঈশপের নীতিকথা

বর্তমান বিশ্বে ঈশপের নীতিকথা সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। পৃথিবীর লিখিত এমন কোনো ভাষা নেই যাতে এই নীতিকথা প্রকাশিত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে হল্যাণ্ড-স্পেন- ইতালি-ফ্রান্স-জার্মানী-গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি সারা পৃথিবিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাদের মাধ্যমে ইউরোপীয় ভাষায় ঈশপ প্রথম উপনিবেশগুলিতে প্রবেশ করে। তারপরে উপনিবেশগুলির নিজস্ব মাতৃভাষায় সেগুলি অনূদিত হতে থাকে। ঈশপের নীতিকথাগুলি অত্যন্ত সরল, সম্পাদনার কোনো পরিশীলিত কৌশল যেহেতু অবলম্বন করা হয়নি, তাই খুব সহজেই সেগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। নীতিশিক্ষার বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে এইসব গল্পে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সাধারণ বিদ্যাশিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পৃথিবীর প্রতিটি দেশে ঈশপের নীতিকথাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর ইউরোপের সম্পদগুলির প্রচার একটু বেশিমাত্রায়ই ঘটেছে উপনিবেশবাদীদের শাসনবিস্তাবের সুবাদে। তাই ঈশপের খ্যাতি ও প্রচার আজ দুনিয়াজোড়া।

বহু পণ্ডিত মনে করেন, ঈশপের কাহিনীগুলোর সঙ্গে লোকঐতিহ্যের কোনো সম্পর্ক নেই। ঈশপ তার সৃষ্টিশীল কল্পনায় এগুলির জন্ম দিয়েছেন। ঈশপের লিখিত নীতিকথা পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে জনসমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই যুক্তিকে মেনে নেওয়া অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাদীর প্রারম্ভ থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের লোককথা সংগ্রহের একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিছু উদার খ্রীস্টান ধর্মযাজক, ইউরোপীয় প্রশাসক ও নৃবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে পথিকৃৎ। তারা বিভিন্ন আদিবাসীদের ভাষা শিখে তাদের লোককথা সংগ্রহ করেন। এইসব জনগোষ্ঠীর ভাষার কোনো লিপি ছিল না, এরা সকলেই নিরক্ষর গ্রামীণ কৃষিজীবী অথবা পশুপালক-শিকারজীবী। এদের সঙ্গে আগে কোনোদিন বাইরের দুনিয়ার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটেনি। অথচ তাদের লোককথায় ঈশপের বলা অনেক নীতিকথার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্বের লোকসমাজের অসম বিকাশ

ঘটেছে, অর্থনৈতিক-সামাজিক স্তরগুলি একইভাবে বিকশিত হয়নি। কিন্তু একই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে লোকসমাজকে এগোতে হয় বলে, একই প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এগোতে হয় বলে বিশেষ বিশেষ স্তরে তারা একই চিন্তার উত্তরাধিকার বহন করে। তাই পাত্রপাত্রী আলাদা হলেও তারা যে লোককথা সৃষ্টি করেন তাতে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। মাইগ্রেশন না ঘটলেও একই লোককথা একইভাবে কিংবা কিছুটা অন্য রূপে বিভিন্ন লোকসমাজে দেখা যায়। ঈশপের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। একথা কোনোভাবেই স্বীকার করা যায় না যে এইসব নীতিকথা ঈশপের মৌলিক সৃষ্টি।

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীর লোককথার নিদর্শন নিলেই একথা প্রমাণিত হবে। এগুলি যখন সংগৃহীত হয় তখনও বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এদের তেমন কোনো সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি।

ঈশপের নীতিকথার বেশ কিছু নিদর্শন আমরা পাচ্ছি আফ্রিকা মহাদেশের সিয়েরা লিওনের মেনডে, ক্যামেরুনের বাফুন, কঙ্গোর বাপেন্দে, জাম্বিয়ার লোজি, কেনিয়ার মাসাই, গাবোনের ফ্যাঙ, নাইজিরিয়ার ইকোই, মোজাম্বিকের মাকোন্দে, সুদানের শিলুক প্রভৃতি আদিবাসী ; প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়ের মেলানেশিয়ার নামাউ, মোন্-আলু, কেরাকি, মালেকুলা আদিবাসী ; পলিনেশিয়ার কারোঙগোয়া, হাপাই আদিবাসী ; মাইক্রোনেশিয়ার উলিথি, ছামারো আদিবাসী ; আমেরিকার মধ্য ও উত্তরপূর্ব এলাকার রেড ইণ্ডিয়ান আদিবাসী ; ভারতের ওরাও, লখের, গাদাবা, বোন্দো আদিবাসী প্রভৃতির মধ্যে। এদের মধ্যে থেকে যখন লোককথাগুলি সংগ্রহ করা হয়, তখন এদের সামাজিক অবস্থান এমন স্তরে ছিল যে অবস্থায় ঈশপ কোনোভাবেই তাদের নাগালের মধ্যে আসতে পারেন না। তাই ঈশপ যে সেইকালের গ্রীস-তুরস্ক এলাকার কৃষকদের লোককথাই বলেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এটা হতে পারে, লোককথা-সংগ্রহ বলতে বলতে তিনি দু-একটি লোককথা নিজেও হয়তো সৃষ্টি করেছেন। তবে মূল প্রেরণার উৎস লোকসমাজ।

গ্রীসের প্রাচীনতম লিখিত ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যাদের নিয়ে গোটা পৃথিবীর গর্ব, গ্রীসের সেই মহান সন্তানদের লিখিত পুঁথি অধিকাংশই সভ্য জগতের হাতে এসেছে। কিন্তু ঈশপের লিখিত কোনো পুঁথি আজও পাওয়া যায়নি। তাই কিছু পণ্ডিত মনে করতেন, ঈশপ নামে কেউ কোনোকালে ছিলেন না, নানা নীতিকথা তার নামে চলে এসেছে। এই ধারণাও বোধহয় সঠিক নয়। এটা ঠিকই, পরবর্তীকালে গ্রীসের বেশির ভাগ নীতিকথাই ঈশপের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এতে ঈশপের জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঈশপের সংগৃহীত কিছু লোককথা যে ছিল তারও প্রমাণ রয়েছে।

ঈশপ তার নীতিকথাগুলির কোনো সংকলন-গ্রন্থ লিখেছিলেন কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে গ্রীসের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি ডিমেট্রিয়াস ফ্যালেরিউস ঈশপের নীতিকথার প্রথম সংকলন প্রকাশ করেন। সংকলন-গ্রন্থটির পরিচয় অন্যান্য লেখকদের রচনায় পাওয়া গেলেও সেই গ্রন্থটি আর পাওয়া যায়নি। কিন্তু এটুকু অনুমান করা যায়, ঈশপ এই কালের আগে জন্মেছিলেন এবং তার নীতিকথা যথেষ্ট সমাদর না পেলে ডিমেট্রিয়াস সেগুলি সংকলিত করতেন না। এর একশ' বছর পরে খ্রীস্টপূর্ব ২০০ অব্দে বাবরিয়াস ঈশপেব নীতিকথার আর একটি সংকলন প্রকাশ করেন। অনেকের ধারণা, ডিমেট্রিয়াসের সংকলনের ভিত্তিতেই বাবরিয়াস এটি সংকলন করেছিলেন। শুধু এই দুজনই নন, ঈশপের নামের সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের আরও কিছু পণ্ডিত মানুষের নাম যুক্ত রয়েছে। প্লেটো (৪২৮-৩৪৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) তার গুরু সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) সম্পর্কে বলেছেন যে, সক্রেটিস ঈশপের কিছু নীতিকথা কবিতায় রূপান্তরিত করেন। গ্রীসের হাস্যরসাত্মক কবিতার জনক অ্যারিস্টোফেনিস (৪৫০-৩৮৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) বলেছেন, বাগ্মীরা তাদের বক্তব্য সহজে বোঝাবার জন্য ঈশপের নীতিকথাকে ব্যবহার করত। ভোজসভায়, হাল্কা হাসির আসরে ঈশপের নীতিকথা বলবার রেওয়াজ ছিল। রোমান কবি ফিড্রাস ও আভিয়ানাস প্রথম শতাব্দীতে ঈশপের ৪২টি নীতিকথা লাতিন ভাষায় অনুবাদ করেন। অনেকের ধারণা, এগুলি ডিমেট্রিয়াসের গদ্য-সংকলনকে ভিত্তি করেই অনূদিত হয়েছিল। নবম শতকে ইগনাটিয়াস ডায়াকোনাস ঈশপের ৫৩টি নীতিকথা কবিতায় রূপ দিয়েছিলেন। আনুমানিক ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দে ম্যাক্সিমাস প্লানুডেস নামে একজন পুরোহিত ১৪৪ টি ঈশপীয় নীতিকথার সংকলন করেছিলেন। এই গ্রন্থের সঙ্গে ঈশপের একটি জীবনীও ছিল। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় মিলান শহরে। কয়েকটি বাড়তি নীতিকথা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থটি পারিতে ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে আবার প্রকাশিত হয়। বাবরিয়াসের সংকলনের অনুসরণ করে ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে ১৩৬ টি নীতিকথার একটি হাইডেলবার্গ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পরে ১৭২৮-১৮২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অক্সফোর্ড ও লাইপজিগে ঈশপের নীতিকথার অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে বড় সংকলন প্রকাশিত হয় ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে, এর সংখ্যা ২৩১টি। নিউ ইয়র্ক থেকে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জোশেফ জেকোবের ২৩১টি ঈশপের নীতিকথা সংকলনই সবচেয়ে প্রামাণ্য বলে গৃহীত হয়েছে।

নীতিকথার সংখ্যায় তারতম্য ঘটেছে, কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব কাল থেকে ঈশপের নীতিকথার ধারাবাহিক প্রকাশ থেকে অন্তত এটা অনুমান করা যায়, ঈশপ কিংবদন্তির নায়ক নন, যদিও তাকে ঘিরে কিছু কিংবদন্তি রয়েছে।

ঈশপের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ একটি ইতিহাস-গ্রন্থ, লেখক

হেরোডোটাস (৪৮৪-৪২৮ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ)। খুব সংক্ষিপ্তভাবে হলেও হেরোডোটাস ঈশপের কিছু পরিচয় দিয়েছেন।

সক্রেটিস প্লেটো অ্যারিস্টোফেনিস ও হেরোডোটাস খ্রীস্ট পূর্ব যুগের মানুষ। গ্রীসের ইতিহাসবোধ খুব প্রখর। অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক-কবিদের পরিচয় সেকালেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। এদের লেখায় যখন ঈশপের নাম রয়েছে তখন কোনোভাবেই ঈশপকে নিরাকার বলা যায় না। আর তার কাল সম্পর্কেও ধারণা জন্মায়, কেননা তিনি নিশ্চয়ই সক্রেটিসের পূর্ববর্তী কালের মানুষ।

ঈশপকে নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হল ঈশপের নীতিকথা লিখিত আকারে পাওয়া যায়নি। হতে পারে ঈশপ এসব মুখে-মুখেই কথকের ভূমিকায় বলে যেতেন। তাহলে পুঁথি থাকবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর এক হতে পারে, গ্রীসের অভিজাত সম্প্রদায় ক্রীতদাসের পুঁথি ধ্বংস করে ফেলেছেন।

কিংবদন্তির আলোচনা না করে ঈশপের ইতিহাসসম্মত জীবনী অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা যায়। ঈশপ বেঁচে ছিলেন ষষ্ঠ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। তিনি ছিলেন আয়াডমন-এর ক্রীতদাস, আয়াডমন ছিলেন সামোস-এর অধিবাসী। যে কোনো কারণেই হোক ঈশপ এই প্রভুর কাছ থেকে মুক্তি পান। মিডিয়ার রাজা ক্রিসাস কোনো বিশেষ কাজে ঈশপকে ডেলফিতে পাঠিয়েছিলেন। এই ডেল্‌ফির অধিবাসীরা ঈশপকে মৃত্যুদণ্ড দেন এবং পাহাড়ের চূড়ো থেকে তাকে ফেলে দেন। ঈশপের মৃত্যু হয়। অনেকে মনে করেন, ঈশপের ব্যঙ্গাত্মক নীতিকথা সেখানকার অধিবাসীদের উত্তেজিত করে। আর পুরনো একজন ক্রীতদাসের জীবনের কিইবা মূল্য? তাকে হত্যা করলেও তো কোনো প্রতিরোধ আসবে না কোনো দিক থেকে?

এর অতিরিক্ত অনেক কিংবদন্তি রয়েছে ঈশপকে ঘিরে। আমাদের দেশের সব পুরাণ যেমন বেদব্যাসের নামের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হত, গ্রীসের সব নীতিকথাই ঈশপের নামে প্রচার করা হত। এতে একদিকে ঈশপের জনপ্রিয়তা যেমন প্রমাণিত হয়, তেমনি ঈশপের সংকলিত নীতিকথার উৎস-সন্ধানেও ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু সাধারণ মানুষ তো অত ইতিহাস-নির্ভর যুক্তি মেনে চলতে পারেন না! তাই বেদব্যাস আর ঈশপের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিরও শেষ নেই।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, ঈশপের নীতিকথা বলে যা প্রচারিত হয়েছে তার অধিকাংশই শুধুমাত্র ঈশপের নামের সঙ্গে যুক্ত। ঈশপের সঙ্গে সেসব লোককথার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই আধুনিক সংকলন-গ্রন্থের ওপর নির্ভর না করে প্রাচীনতম যে সংকলনগুলি রয়েছে, সেগুলিকে ভিত্তি করেই ঈশপের আলোচনা যুক্তিযুক্ত। সেখানেও হয়তো বাড়তি লোককথা প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

কিছু কিছু পণ্ডিত বলেছেন, ঈশপের নীতিকথাগুলি মৌলিক। এ মত কেন মেনে নেওয়া যায় না তা আগেই আলোচনা করেছি। ঈশপের জন্মের বহু আগে থেকেই গ্রীসে বা তার সন্নিহিত এলাকায় এসব লোককথা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

প্রাচীন কালের লোককথা সংগ্রাহকেরা তাদের পুঁথি সংকলন করবার সময় নিজস্ব ধ্যান-ধারণার কিছু পরিচয় রেখে গিয়েছেন। এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই তারা লোককথা সংকলন করেছিলেন। ঈশপেরও উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিটি গল্পের শেষেই নীতিকথা রয়েছে। শুধুমাত্র আনন্দদানের জন্যই ঈশপ এগুলির সংকলন করেন নি, মানুষের সমাজকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য ব্যক্তিমানুষকে নীতিকথার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের শিক্ষা দেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য। এর জন্য তিনি প্রাসঙ্গিক লোককথা সংগ্রহ করলেন ঠিকই, কিন্তু সংকলন করবার সময় কোনো কৌশল বা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করেন নি। যেমনভাবে শুনেছিলেন সেভাবেই পরিবেশন করেছেন। এই হিসেবে ঈশপের নীতিকথা অনেক বেশি লৌকিক, লোকঐতিহ্যের সম্পদটি তিনি অবিকৃতভাবে শুনিয়েছেন।

ঈশপের নীতিকথা সম্পর্কে এই উক্তি প্রযোজ্য। কিন্তু ঈশপের পুরনো সংকলনে দুটি লোককথা রয়েছে যা লৌকিক বলে আমার মনে হয়নি। ঈশপ ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন ঠিকই, ক্রিসাস তাকে অসাধারণ শ্রদ্ধাও করতেন, প্লুটার্ক ঈশপকে আটটি রত্নসদৃশ শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবানদের একটি রত্নও বলেছেন,—কিন্তু সেকালের গ্রীসের অভিজাত সম্প্রদায়ের সামাজিক মানসিকতা এমনই ছিল যে এককালের ক্রীতদাস 'কুরূপ' ঈশপকে তারা কোনোভাবেই সহজে গ্রহণ করে নেননি। পদে পদে তাকে অসহ্য অপমান ও লাঞ্ছনা নিশ্চয়ই সহ্য করতে হয়েছিল। এইসব সামাজিক অবমাননার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই দুটি লোককথায়। এ লোককথা লোকসমাজের সৃষ্ট নয়, ঈশপের মৌলিক সৃষ্টি।

ডেলফির অভিজাত নাগরিকেরা ঈশপকে নিয়ে চলল পাহাড়ের চুড়োয়। দুদিকে দুটি চুড়ো, মাঝখানে গভীর গহ্বর। দুটি কাঠ দুটি চুড়োর মাথায় রাখা হল। ঈশপ হেঁটে গেলেন সেই কাঠের ওপরে। মনে হয় যেন, মৃত্যুর আগে ঈশপ জীবনের শেষ লোককথা শুনিয়ে যাচ্ছেন। কি করুণ পরিণতি গ্রীসের ও পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্নের! দুপাশ থেকে কাঠ দুটি ছেড়ে দিল ঘাতক, নিঃশব্দে গহ্বরে বিলীন হয়ে গেলেন ক্রীতদাস ঈশপ, যিনি চিরকাল মানুষের সংগ্রামী মনের কথা প্রকাশ করেছেন, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস জুগিয়েছেন, শৃঙ্খলিত মানুষের অবমাননার গান শুনিয়েছেন, আর শুনিয়েছেন, আমি সামান্য কুকুর, বনে বনে কষ্ট করে খাদ্য সংগ্রহ করি, কিন্তু প্রভুর গৃহে ভালো খাদ্যের বিনিময়েও গলায় শেকল পরতে পারব না।

'রাজহাঁস ও বক' পশুকথাটির মধ্যে ঈশপ যেন নিজের ধিক্কৃত জীবনের

সমস্ত গ্লানি ও অবমাননা প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য রূপকের আড়ালে ব্যক্তিজীবনের বেদনা প্রকাশ পেল।

পাহাড়ী বনের পাশে এক বিলের ধারে গান গাইছিল এক রাজহাঁস। একটু পরেই সে মারা যাবে। তবু সে গান সুন্দর, মধু ঝরে পড়ছিল।

পাশেই ছিল এক বক। সে বলল, হায় কপাল! এ তো কোনোদিন দেখিনি? মরার সময়ে কেউ গান গায় নাকি? আর এমন সময় গান গাওয়ারও তো কোনো মানে নেই। তা, তুমি এমন সময় গান গাইছ কেন?

রাজহাঁস বলল, আঃ, কি আরাম, গান গাইতে কত আনন্দ! আমি আজ যেখানে যাচ্ছি সেখানে আচমকা কোনো তীর এসে আমার রক্ত ঝরাতে পারবে না। আজ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে কোনো খাঁচা আর আমায় বন্দী করতে পারবে না। আজ আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে প্রচণ্ড ক্ষুধা আমাকে আর যন্ত্রণা দিতে পারবে না। এমন মুক্তির দিনে আমি গান গাইব না? বলো কি তুমি?

এই একটি পশুকথার মধ্যেই ঈশপের জীবন ও জীবনী যেন লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই গল্পটি বোধহয় লোককথা নয়, ঈশপের নিজস্ব সৃষ্টি, নিজের জীবনকথা।

আর একটি কাহিনীর মধ্যেও ঈশপের নিঃসঙ্গ জীবনের করুণ ছবি রয়েছে। এখানে রয়েছে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দীর্ঘশ্বাস।

এক যে ছিলেন মহান দার্শনিক। তার অগাধ পাণ্ডিত্যে সকলেই মুগ্ধ। একবার তিনি একটি ঘর তৈরি করলেন। সেখানেই থাকবেন তিনি। কিন্তু ঘরটা ছিল খুব ছোট। তাই দেখে কয়েকজন পরিচিত মানুষ দার্শনিককে বললেন, একি করেছেন? আপনার মতো এত বিরাট পণ্ডিত মানুষ শেষে থাকবেন এই ছোট্ট ঘরে? কি আশ্চর্য!

দার্শনিক একটু চুপ করে থেকে বললেন, হায়! এই ছোট্ট ঘরটাই যদি সত্যিকারের বন্ধু দিয়ে ভরে দিতে পারতাম!

প্রথম কাহিনীতে লৌকিক পাত্রপাত্রী থাকলেও মেজাজে ও বক্তব্যে তা লোকঐতিহ্যের পশুকথা হয়ে ওঠেনি, আর দ্বিতীয় কাহিনীটি কোনোভাবেই লোককথা নয়। তবু এই দুটি কাহিনীর মধ্যে ঈশপের ব্যক্তিমনটিকে যেন ছোঁয়া যায়।

লোককথা সংগ্রহের প্রবাদপুরুষ ঈশপ যে লোকঐতিহ্যের সম্পদগুলিকে অবিকৃতভাবে প্রচার করেছিলেন, সে বিষয়ে আজ আর কোনো সন্দেহ নেই। সম্পাদক ও সংকলক হয়েও তিনি লৌকিক মানসটিকে পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। গ্রীসের অন্যান্য লিখিত ঐতিহ্যেও আমরা লোকঐতিহ্যের অনেক সম্পদের সন্ধান পাচ্ছি।

চারণকবি হোমার সম্ভবত খ্রীস্টপূর্ব ৮৫০ অব্দের মানুষ। তার অমর দুটি মহাকাব্য থেকে মহাকবি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তবে পরবর্তী-কালের লেখকেরা হোমারের সম্পর্কে অল্প কিছু জানিয়েছেন। আইওনিয়ার কোনো শহরে, সম্ভবত চিওস কিংবা স্মিরনা শহরে হোমার বাস করতেন। অনেকে তাকে দ্বাদশ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের মানুষ, আবার অনেকে বলেছেন সপ্তম খ্রীস্ট পূর্ব যুগের। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস তাকে নবম খ্রীস্ট পূর্ব যুগের মহাকবি বলেছেন। আধুনিক পণ্ডিতেরা হেরোডোটাসের কথাই মেনে নিয়েছেন। হোমারের অস্তিত্ব সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠেছে। এর সমাধান বোধহয় আর সম্ভব নয়। 'হোমারিক কোশ্চেন' আজও আলোচিত হয়ে চলেছে। তবে সকলেই স্বীকার করেছেন, মূল দুটি মহাকাব্য হোমারের রচিত হলেও পরবর্তী কালের বহু কবির বহু রচনা দুই মহাকাব্যকে স্ফীত করেছে। আর, এই কাহিনী হোমার সংগ্রহ করেছিলেন গ্রীসের কৃষকসমাজ থেকে। তার মনের মাধুরী মিশিয়ে একে অপরূপ করে তোলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দুই মহাকাব্যের সঙ্গে এ বিষয়ে হোমারের দুই মহাকাব্যের আশ্চর্য মিল রয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জানা যায়, ট্রয় অবরোধ ঘটে দ্বাদশ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। তার তিনশ' বছর পরে হোমার এই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করেন। তা যদি হয়, তবে জনমানসে সেই কাহিনী এত দিন পরেও যথেষ্ট উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু কালের ব্যবধানে ট্রয়ের কাহিনীর মধ্যে লৌকিক কিংবদন্তির যথেষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। মহাকাব্য দুটি পড়লেই তা বোঝা যাবে। হোমার-বিশেষজ্ঞ আরিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. ডি. পারসি বলেছেন, During this time history of Troy was turned into legend and expanded by the addition of myth and folklore.

গ্রীক কৃষক ও পশুপালকদের মধ্যে যেসব লোককথা প্রচলিত ছিল

মহাকবি সেগুলি নিপুণভাবে তার কাব্যে ব্যবহার করেছেন। ইলিয়াড ও ওডিসির অসংখ্য লোকপুরাণের মধ্যে রয়েছে মৌলিক লৌকিক উপাদান। যেসব কাহিনী ছিল নিরক্ষর লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যে, কবি তারই লিখিত রূপ দিলেন।

এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে পলিফেমুস, ওডিসিউসের অভিযান, ভিখারীবেশে ওডিসিউসের প্রত্যাবর্তন, পেনিলোপের প্রতীক্ষা, ওডিসিউসের ধনুকে ছিলা পরানো ও তীর ছোড়া, অ্যাকিলিসের ঘোড়া যে মানুষের ভাষায় উপদেশ দিতে পারত, বেঁটে বামন আর সারসদের লড়াই, বেলেরোফোনের কাহিনী প্রভৃতি লোকপুরাণ-রূপকথা লোকঐতিহ্যের রূপ থেকে সংগৃহীত।

পারসিউসের লোকপুরাণ- কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ হলেও এর মূল ভিত্তি লোকসমাজ। থেসিউসের কাহিনীও লোককথার ভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত। আরগোনট্স-এর গল্পগুলোর মধ্যে রূপকথার অসংখ্য উপাদান রয়েছে, পড়লেই মনে হবে লৌকিক রূপকথাকে সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে। আঙ্গিক ও বিষয়-ভাবনায় এগুলি অকৃত্রিম লোককথা। একটি রূপকথায় আছে, ফ্রিক্সোস্ ও হেল্লে তাদের সৎ মায়ের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য পালিয়ে যায়। এই বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীতে হাজার হাজার লোককথা রয়েছে। সৎ মায়ের অবিচারের বিষয়টি বহু প্রাচীন কালের সমাজেও বেশ সক্রিয় ছিল। রামায়ণ ও জাতকেও তার প্রমাণ রয়ে গিয়েছে।

অ্যারিস্টোফেনিস (৪৫০-৩৮৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের রসিক কবি ও নাট্যকার। ৪৩১-৪০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে সংঘটিত পেলোপোনেসিয়ান যুদ্ধের সময়েই তার অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়। ৪২২ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে রচিত 'দ্য ওয়াস্প্স' ও ৪০৫ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে রচিত 'দ্য ফ্রগ্স্' গ্রন্থ দুটিতে তিনি বেশ কিছু লোককথাকে অন্তর্ভুক্ত করেন।

এইসব লিখিত রূপের উৎস সম্পর্কে স্টিথ টমসন বলেছেন, All show us that we are here very close to a narrative form and to narrative material familiar to us in the modern folktale of the European peasant.

প্রাচীন ইতালি

প্রাচীন গ্রীসের অসংখ্য লোককথা আধুনিক বিশ্বের মানুষ জেনেছেন লাতিন ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটির নাম মেটামরফোসিস্। গ্রন্থের লেখক

পাবলিয়াস ওভিদিয়াস নাসো (৪৩ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ—১৮ খ্রীস্টাব্দ) যিনি ওভিদ নামে খ্যাত। সম্রাট অগাস্টাস্ তাকে রোম থেকে কৃষ্ণসাগরের তোমিস্-এ তাড়িয়ে দেওয়ার আগেই তিনি গ্রন্থটি রচনা করেন। প্রাচীন লৌকিক পুরাণ থেকে ওভিদ অনেক কাহিনী শুনিয়েছেন। অধিকাংশের মধ্যেই রয়েছে লোককথার মোটিফ। কিন্তু কিছু লৌকিক কাহিনী ওভিদের হাতে পড়ে বড় বেশি পরিশীলিত হয়ে উঠেছে। সেগুলিকে লৌকিক সম্পদ বলে চেনা খুব কষ্টকর। লোককথার মেজাজই হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সচেতন মনোযোগী পাঠক বুঝতে পারবেন, মূলে এগুলি লোককথাই ছিল।

রোমক সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কবি পাবলিয়াস ভারজিলিয়াস মারো (৭০-১৯ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) অর্থাৎ ভার্জিল তার ঈনিড গ্রন্থে লোককথার ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন। পাতালের অভিযান-বর্ণনায় ওডিসির প্রভাব রয়েছে, যে বর্ণনা লোকঐতিহ্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন হোমার। ভার্জিল ছিলেন বিদগ্ধ জাতীয় কবি, রোমের জয়গাথা রচনা করাই ছিল তার উদ্দেশ্য,—তাই তিনিও নিজের প্রয়োজনে লোককথাকে পরিবর্তিত করেন। তাই তার কাহিনীগুলির মধ্যে লৌকিক ঐতিহ্যের আভাস খুঁজে পাওয়া গেলেও প্রকৃত লোককথার সন্ধান পাওয়া দুরূহ।

ইতালির প্রাচীন লেখকদের মধ্যে যার লেখায় লৌকিক উপাদান ও লোককথা সবচেয়ে বেশি পাওয়া গিয়েছে তিনি হলেন লুসিয়াস অ্যাপুলেইয়াস। তিনি ছিলেন দার্শনিক ছন্দবিজ্ঞানী ও কথাসাহিত্যিক। কিন্তু দর্শন ও ছন্দবিজ্ঞান সম্পর্কে তার লেখাগুলির কথা পরবর্তী প্রজন্ম ভুলে গিয়েছে, কিন্তু ভুলতে পারেনি তার উপন্যাস মেটামরফোসিস বা সোনালী গাধার কথা। আর এই গ্রন্থেই রয়েছে লোককথার উপাদান যা আধুনিক কালেও ইউরোপীয় কৃষকদের মধ্যে থেকে সংগৃহীত করা গিয়েছে। তিনি জন্মেছিলেন ১২৫ খ্রীস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায়। পড়াশোনা করেছিলেন কার্থেজ ও এথেন্সে। গ্রীস ও এশিয়া মাইনরে ব্যাপকভাবে পর্যটন শেষ করে ফিরে আসেন পিতৃভূমি ইতালিতে। এতগুলি দেশে ভ্রমণের সুবাদে তিনি অসংখ্য সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন আর সেই অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ রয়েছে এই উপন্যাসে।

মেটামরফোসিস বা সোনালী গাধার উপাখ্যানটি বেশ মজার। লুসিয়াস নামে ছিল এক যুবক। সে পথে বেরুল। ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছল উত্তর গ্রীসের থেসালি এলাকায়। এই এলাকায় ডাইনীবিদ্যা শেখার প্রচলন ছিল। এখানে ফোটিস্ নামে এক গৃহ-পরিচারিকার সঙ্গে লুসিয়াসের ঘনিষ্ঠতা হল। ফোটিস্-এর কাছ থেকে সে যাদু-মলম পেল। এর সাহায্যে ইচ্ছে করলেই লুসিয়াস পাখি হয়ে যেতে পারবে। সে যাদু-মলম ব্যবহার করল কিন্তু

পাখি হল না, হল একটা গাধা। এই গাধা কথা বলতে পারে না, কিন্তু মানুষের সব বোধই তার ছিল। একদিন একদল ডাকাত সেই গাধাকে চুরি করে পালিয়ে গেল। শুরু হল গাধার অভিযান। পথ চলছে ডাকাতের দল, সঙ্গে রয়েছে সেই গাধা। এই পথের অভিজ্ঞতার কথাই হল উপন্যাসের মূল বিষয়। ও-তো গাধা, বোধবুদ্ধি নেই, তাই লোকজন অনায়াসে গাধার সামনে নানারকম গল্পগুজব করত, গাধা সব শোনে, সব বোঝে। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হয় গাধার, গল্পভাণ্ডার জমে ওঠে। কাহিনীর শেষে অবশ্য দেবী আইসিস্-এর সহায়তায় লুসিয়াস গাধা থেকে রূপান্তরিত হয় মানুষে, সে অন্য কাহিনী।

গাধার পথ চলার সময় অনেক লোককথা শোনা গেল। বিশেষ করে একটি লোককথা অমর হয়ে আছে, গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের মধ্যে আর কোথাও লোককথাটি লিপিবদ্ধ হয়নি। এ কাহিনী কিউপিড ও সাইকি-র কথা। লোকসংস্কৃতির অতি-পরিচিত সাধারণ মোটিফগুলি এর মধ্যে রয়েছে। গল্পকার অ্যাপুলেইয়াস অপরূপ দক্ষতা ও আন্তরিকতায় লৌকিক গল্পটি বিবৃত করেছেন। এই কাহিনীর মধ্যে একটি প্রতীক সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে, সাইকি হল আসলে মানবিক আত্মা। এক বুড়ির কাছে গাধা এই গল্পটি শুনেছিল। সাইকি ছিল অনন্যা রূপসী, তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চতুর্দিকে। এই রূপ ভেনাসকে ঈর্ষান্বিত করে তুলল। তারই সন্তান কিউপিড মায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই নারীকে বিয়ে করতে চায়। অনেক বাধা-বিপত্তির পরে কিউপিড ও সাইকির মিলন ঘটল শেষ পর্যন্ত।

লোকসমাজের অনেক লোককথা এই গ্রন্থে লোকপুরাণ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল বলেই প্রাচীন ইতালির লোকসংস্কৃতির অনেক অমূল্য উপাদান রক্ষা পেয়েছিল।

প্রাচীন ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়া : মেসোপটেমীয় ঐতিহ্য

প্রাচীন মিশরের মতো এত সুপ্রাচীন না হলেও টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের তীরে যেসব লোককথা লিখিত আকারে পাওয়া গিয়েছে, তা-ও কম পুরনো নয়। আক্কাদীয়, সুমেরীয়, চাল্ডীয়, অ্যাসিরীয়, ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ যেসব কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা ক্ষোদিত ট্যাবলেট পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে লোককথার টুকরো টুকরো আভাস পাওয়া গিয়েছে। লোকসমাজের

মৌখিক ঐতিহ্যের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু কয়েকটি উজ্জ্বল নিদর্শন আমাদের হাতে এসেছে। পুরাণের সংখ্যাই বেশি, তবু লোককথা যে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে ও নিকট প্রাচ্যে এক উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস তীরবর্তী এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে জানা গিয়েছে, ৪০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ সময়ে সেখানে ঘন জনবসতি ছিল সুমের ও আক্কাদ সংস্কৃতিবলয়ের মানুষদের। এই জনগোষ্ঠীকে ব্যাপক অর্থে বলা হত সুমেরীয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন, এদের সংস্কৃতি আরও পুরনো কালের। সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও উর-এরেখ-কিশ এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে এসব এলাকার সংস্কৃতি সুমেরীয়দের সৃষ্টি। তাদের সংস্কৃতির নিদর্শন থেকে জানা যায়, তারা মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্ব এলাকার পার্বত্য অঞ্চল থেকে এই ব-দ্বীপে এসেছিল। তাদের লোকপুরাণ থেকে জানা যায়, তারা এসেছিল ভিন্ন কোনো দেশ থেকে, এখানে নতুন বসতি গড়ে তোলে। কিউনিফর্ম লিপি তাদেরই বিস্ময়কর আবিষ্কার। যখন লিওনার্ড উলি উর এলাকা খনন করেন তখনই এক অতি উন্নত সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেল। এদের সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক, আর ছিল অবাক-করা মন্দির, পুরোহিত, আইন, সাহিত্য এবং সমৃদ্ধ লোকপুরাণ। এই দুই নদীর ব-দ্বীপে সুমেরীয় বসতি স্থাপনের বেশ কিছুকাল পরে সুমের আক্কাদ এলাকায় প্রথম সেমেটিক আক্রমণ সংঘটিত হয়। এরা সুমেরীয়দের পরাজিত করে, কিন্তু নতুন বসতিতে এসে এরা সুমেরীদের সংস্কৃতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে, কিউনিফর্ম লিপি অনুসরণ করে। কিন্তু সুমেরীয় ভাষা গ্রহণ করেনি। সেমেটিক আক্রমণকারীদের ভাষা আক্কাদীয় নামে প্রচলিত ছিল। আমরু জনগোষ্ঠীর দ্বারা দ্বিতীয় সেমেটিক আক্রমণ ঘটে এই এলাকায়। এই সময়ে ব্যাবিলনে প্রথম আমুরু রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। হাম্মুরাবির অধীনে ব্যাবিলনের সমৃদ্ধি ঘটে, সুমের ও আক্কাদের ওপরে ব্যাবিলনেব নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। আমুরু রাজবংশের প্রথম রাজার সময়কাল আনুমানিক ২২০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ। এই সময়ের ৫০০ বছর পরে আর একটি সেমেটিক জনগোষ্ঠী টাইগ্রিস উপত্যকার ওপরের দিকে বসতি গড়ে তোলে। তারা ব্যাবিলন অধিকার করে নেয় এবং মেসোপটেমীয় অঞ্চলে প্রথম অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

এইসব ঘাত-প্রতিঘাত মিলন-মিশ্রণ ও সংস্কৃতির ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে যেসব মেসোপটেমীয় লোকপুরাণ সৃষ্টি হল তা সুমেরীয়-ব্যাবিলনীয়-অ্যাসিরীয় রূপেই আমাদের কাছে পৌঁছল। তাই অধিকাংশ ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয় লোকপুরাণের রূপরীতিতে কোনো তফাৎ নেই বললেই চলে। শুধুমাত্র

সৃষ্টিবিষয়ক লোকপুরাণের ক্ষেত্রে সুমেরীয় ও অ্যাসিরীয়-ব্যাবিলনীয় রূপের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটাও লক্ষ্য করা গিয়েছে, কিছু কিছু ভিন্নধর্মী সুমেরীয় লোকপুরাণ আছে যার কোনো সাদৃশ্য সেমেটিক লোকপুরাণে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এদের সংখ্যা কম।

বিজেতা ও বিজিত ঐইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক নিষ্ঠুরতা, রক্তপাত ও বিরোধিতা ঘটলেও একসময় সবাই মিলেমিশে গিয়েছিল। একের দেবতা-লোককথা-সংস্কৃতি-লিপি ও ভাষা অন্যেও গ্রহণ করেছে। অ্যাসিরিয়ার সব দেবতাই পূজিত হত ব্যাবিলনে, অ্যাসিরিয়ার সমস্ত ধর্মীয় উৎসবই একই সময়ে একই ভাবে পালিত হত ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতিতে। অ্যাসিরীয় সম্রাট আসুরবানিপলের গ্রন্থাগারে যে-সব লিখিত সম্পদ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এই বিশ্বাসের সপক্ষে অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। সিডনি স্মিথ বলেছেন, It is certain that the Assyrian scribes were engaged in transforning the literature they borrowed from Babylonia from the style of the First Dynasty of Babylon to the form in which we find it in Ashurbanipal's library.

মেসোপটেমীয় ঐতিহ্যের সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্পদ হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন মহাকাব্য গিলগামেশ। গিলগামেশের যে ক্ষোদিত লিপি আমাদের হাতে এসেছে, তা সম্ভবত ৬৫০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের। পণ্ডিতদের ধারণা লৌকিক ঐতিহ্য থেকে এই মহাকাব্য প্রথম লিখিত আকার পেয়েছিল ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দে। তাহলে বলা যায়, পৃথিবীর প্রাচীনতম মহাকাব্য হল গিলগামেশ। এই মহাকাব্য তাহলে লোকসমাজে আরও আগে থেকে নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। মহাকাব্যের প্রাণ বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এটি আদিতে ছিল সুমেরীয় ও আক্কাদীয় লোকপুরাণ। কিন্তু বিরাট এলাকার লোকঐতিহ্যের অসংখ্য সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুরনো নথিপত্র থেকে জানা যায়, এক সময় এর আয়তন বর্তমানে প্রাপ্ত আয়তনের দুগুণ ছিল। তিনটি ভাষায় লিখিত ৩০,০০০ ফলকে উৎকীর্ণ এই মহাকাব্যের মধ্যে লোকসমাজের লৌকিক ঐতিহ্যের কাহিনীই বেশি পাওয়া যায়। একসময় হয়তো টুকরো টুকরো কাহিনী ছিল, পরে এটিকে একটি মালায় গাঁথা হয়। অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বাধীন অনেক লোককথা একটি মূল কাহিনী-ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

গিলগামেশ মহাকাব্যের মধ্যে যে-সব লৌকিক গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলো আলোচনা করলেই এর লৌকিক উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে।

মহাকাব্যের এগারো সংখ্যক ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে প্রলয়ের লোকপুরাণ। এটি অংশত লোকপুরাণ ও অংশত 'সাগা'। এতে বর্ণিত হয়েছে এরেখ-এর আধা-পৌরাণিক রাজার অভিযান-কাহিনী। এরেখ-এর এই রাজার আবার উল্লেখ রয়েছে

সুমেরীয় প্রথম রাজবংশের পঞ্চম রাজা হিসেবে। প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে এই প্রলয়ের কাহিনী ছিল অসাধারণ জনপ্রিয়। হিট্টি অনুবাদে, জেনেসিসে তো সুন্দরভাবে লিখিত রয়েছে এই কাহিনী। পরবর্তীকালের মিশরীয়-গ্রীক-হিব্রু-উগারিতীয় ও মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য লোকসংস্কৃতিতে এর হাজারো ভিন্ন ভিন্ন রূপ পাওয়া গিয়েছে।

মহাকাব্যে গিলগামেশ ও তার বন্ধু এনকিডুর অভিযানের কাহিনী লোকঐতিহ্যের আদলে গড়ে উঠেছে। দেবতারা গিলগামেশকে সৃষ্টি করলেন, তার দৈহিক শক্তি ও মানসিক সাহস প্রায় অতিলৌকিক পর্যায়ের। তিনি ছিলেন দুই-তৃতীয়াংশ দেবতা ও এক-তৃতীয়াংশ মানব। এরেখ-এর অভিজাতরা দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালেন, এই অতিমানব অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছে, সে কাউকে গ্রাহ্য করে না। কোথায় সে সাধারণ মানুষের প্রতিপালক হবে, তা না হয়ে সে তাদের ওপর অবিচার-অত্যাচার চালাচ্ছে। দেবতা যেন গিলগামেশের মতোই আর একটি অতিমানব সৃষ্টি করেন যাতে পৃথিবীতে শান্তি বিরাজ করে।

দেবী আরুরু মাটির তাল থেকে তৈরি করলেন একটি মানব মূর্তি, এক মানবাকৃতি বন্য প্রাণী। তার নাম হল এনকিডু। সে ঘাস খায়, বন্যদের মতো থাকে বুনো জন্তুদের সঙ্গে, জল খায় পাহাড়ী ঝরনায়। গিলগামেশের শিকারীদের সে উচ্ছেদ করতে লাগল। বুনো জন্তুরা তার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত হল। এ সংবাদ পেঁছিল গিলগামেশের কানে। গিলগামেশ একজন শিকারীকে আদেশ দিলেন, মন্দিরের এক দেবদাসীকে সেই পাহাড়ী ঝরনার কাছে নিয়ে যাও, যেখানে বুনো জন্তুদের নিয়ে এনকিডু জল খেতে আসে। দেবদাসী যেন তাকে ছলনায় ভুলিয়ে দেয়।

সুন্দরী দেবদাসী রয়েছে ঝরনার পাশে। অপেক্ষা করছে সে। এমন সময় সেখানে এল এনকিডু, সঙ্গে অসংখ্য বন্য জন্তু। সে তাকিয়ে রয়েছে দেবদাসীর দেহের দিকে, দেবদাসী তার মোহিনী রূপ মেলে ধরল, চোখের চাহনীতে ছলনার দীপ্তি। কি যেন অনুভব করল এনকিডু, তার দেহে তো এর আগে এমন অদ্ভুত শিহরণ জাগেনি! নারীদেহের অপরূপ লাবণ্য তাকে দিশেহারা করে দিল। পেছনে পড়ে রইল তার সহচর বন্য প্রাণীরা, দেবদাসীকে নিয়ে খেলায় মেতে উঠল বন্য মানুষ। এ এক নতুন আবিষ্কার! সাত দিন কেটে গেল মোহগ্রস্ততার মধ্য দিয়ে। তারপর মোহ থেকে জেগে উঠে সে অনুভব করল, অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে তার। বন্য জন্তুরা তার দিকে চেয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল, তার সঙ্গ ত্যাগ করল। নারী বলল, এনকিডু,তুমি আজ জ্ঞানের অধিকারী হলে, তুমি আজ দেবতার সমকক্ষ হলে। দেবদাসী তাকে বলল এরেখ-এর গৌরবের কথা, সেখানকার সুন্দর জীবনের কথা। আর বলল গিলগামেশের শক্তি ও খ্যাতির কথা। নারী বলল, পশুর চামড়ার পোশাক

ফেলে দাও তুমি, দেহের লোমশ অংশ পরিষ্কার কর, দেহকে তৈলসিক্ত কর আর আমার সঙ্গে এরেখ-এ চল।

এরেখ-এ দেখা হল এনকিডুর সঙ্গে গিলগামেশের। দুজন শক্তির পরীক্ষায় নামল। কিন্তু শক্তি-পরীক্ষার পরিণতিতে গড়ে উঠল এক অনন্য বন্ধুত্ব। তারা ঘোষণা করল, এই বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য, এ বন্ধুত্ব চিরকালের।

এখানেই গিলগামেশ মহাকাব্যের প্রথম কাহিনী শেষ। এ কাহিনী আমরা পেয়েছি গ্রীসের হারকিউলিস উপাখ্যানে, জেনেসিসে, তুরস্ক ও মিশরের আদিবাসী লোককথায়। আর ভিন্ন রূপে কিন্তু একই বক্তব্যে এই কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের ব্যাপক জনগোষ্ঠীতে।

পরের কাহিনীটিও লোককথা। গিলগামেশ ও এনকিডু চলেছেন অভিযানে, অগ্নি-দৈত্য হুয়াওয়াকে হত্যার উদ্দেশ্যে। এই দৈত্যের অ্যাসিরীয় নাম হল হুম্‌বাবা। তাদের অভিযানের লক্ষ্য,—পৃথিবী থেকে সমস্ত অবিচার-অনাচারকে উচ্ছেদ করতে হবে। পরবর্তীকালের গ্রীক লোকপুরাণের নায়ক হারকিউলিসের অভিযানের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। গ্রীক বীরের উদ্দেশ্যও তাই ছিল, দ্যাট অল্ ইভিল ফ্রম দ্য ল্যান্ড উই মে ব্যানিশ। অশেষ বীরত্বে তারা দুজন হুয়াওয়াকে হত্যা করলেন, তার বনে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল, দেবী ইরিনি বা ইশটার-এর শান্তির লীলাভূমি হল এই বনাঞ্চল।

অভিযান থেকে ফিরে আসার পরে গিলগামেশের রূপে মুগ্ধ হলেন দেবী ইশটার। তাকে প্রেমিক হিসাবে পেতে চাইলেন দেবী, দেবী প্ররোচিত করতে লাগলেন। গিলগামেশ প্রত্যাখ্যান করলেন দেবীর মোহিনী আহ্বান, দেবীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, ইশটারের আগের আগের অসংখ্য প্রেমিকের ভাগ্যে যে লাঞ্ছনা ঘটেছে তা তিনি জানেন। প্রত্যাখ্যাতা হয়ে দেবী অন্য রূপ নিলেন। দেবী দেবরাজ আনুকে অনুরোধ করলেন, এই প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে হবে। সেই লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আসুক তার রাজ্য।

স্বর্গ থেকে নেমে এল ষাঁড়। এরেখ রাজ্যকে তছ্‌নছ্ করে দিল। কিন্তু বন্ধু এনকিডু ষাঁড়কে হত্যা করল। তখন দেবতারা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন, এনকিডুকে অবশ্যই মরতে হবে। এনকিডু রাতে স্বপ্ন দেখল, কারা যেন তাকে তুলে নিয়ে চলেছে পাতালের পথে, পাতালের অধীশ্বর নারগাল তাকে প্রেতাত্মা করে দিল। এই অংশে যে পাতাল বর্ণনা রয়েছে তার সঙ্গে সেমেটিক ধারণার হুবহু মিল পাওয়া যাচ্ছে। তারপরে এনকিডু অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং মারা গেল। গিলগামেশ বন্ধুর বিরহে আর্তনাদ করে উঠলেন। গিলগামেশ বন্ধুর মৃত্যুতে যেসব আচার-আচরণ পালন করলেন তা মনে করিয়ে দেয় আর একটি মৃত্যুকে। গ্রীক পুরাণে রয়েছে, প্যাট্রোক্লুস যখন মারা যান তখন অ্যাকিলিসও ঠিক এইসব আচার পালন করেন।

গিলগামেশ বন্ধুর মৃত্যুতে বললেন, আমিও যখন মারা যাব, আমিও কি

বন্ধুর মতো হয়ে যাব না? ভয় আমাকে গ্রাস করেছে, মৃত্যুভয় আমাকে আচ্ছন্ন করছে। অমরত্বের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন গিলগামেশ। শুরু হল মহাকাব্যের পরবর্তী অংশ। গিলগামেশ জানতেন, তার পূর্বপুরুষ উট্‌নাপিশ্‌টিম্‌ই একমাত্র মানুষ যিনি অমরত্ব লাভ করেছিলেন। জীবন ও মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্যই গিলগামেশ তার পূর্বপুরুষের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। গিলগামেশ পেঁছিলেন মাশু পাহাড়ের সানুদেশে। তার প্রবেশ-পথে পাহারা দিচ্ছে একজন কাঁকড়াবিছে-মানুষ ও তার বৌ। সে বলল, কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত এই পাহাড়ের ওপারে যেতে পারেনি, কারও সে সাহস হয়নি। কিন্তু গিলগামেশ যেহেতু তার যাত্রার উদ্দেশ্যের কথা খুলে বলেছে, তাই সে যেতে পারে। আমি তোমাকে যেতে আদেশ দিচ্ছি।

সূর্যের পথ বেয়ে এগিয়ে চলল গিলগামেশ। অন্ধকারে বহু পথ অতিক্রম করে শেষকালে সে পেঁছিল সূর্যদেবতা শামাশ-এর কাছে। সূর্যদেবতা বললেন, বৃথাই পরিক্রমা করছ গিলগামেশ, যে অমর জীবনের সন্ধান তুমি করছ তা কোথাও নেই।

কিন্তু হতাশ হলেন না গিলগামেশ। তিনি এলেন সমুদ্রতীরে, মৃত্যুর জলধারার কাছে। সেখানে রয়েছে আর একজন দ্বারপাল, দেবী সিদুরি। এই মৃত্যুরূপী জলধারা পেরোতে তিনি নিষেধ করলেন, এই ভয়ানক সমুদ্র কেউ পেরোতে পারে না। একমাত্র সূর্যদেবতা শামাশই পারেন। ফিরে যাও, জীবনকে উপভোগ কর। তুমি যে অমর জীবনের সন্ধান করছ, তা কোথাও নেই। এখানে সিদুরি তাকে যে-কথা শোনালেন, তা রয়েছে হিব্রু লোক-পুরাণে।

তবু গিলগামেশ এগিয়ে চললেন। এবার দেখা হল উর্‌শানাবি-র সঙ্গে যে তার পূর্বপুরুষ উট্‌নাপিশ্‌টিম-এর নৌকো চালায়। উর্‌শানাবি-র সমস্ত উপদেশ মেনে চলে শেষকালে গিলগামেশ দেখা পেলেন তার পূর্বপুরুষের। বৃদ্ধ প্রপিতামহ শোনালেন প্রলয়ের লোকপুরাণ, তারপরে বললেন, কাঁকড়াবিছে-মানুষ, শামাশ ও সিদুরি তোমাকে যা বলেছেন তাই সত্যি, দেবতারা শুধুমাত্র তাদেরই জন্য অমরত্ব সংরক্ষিত করে রেখেছেন, আর মানুষের জন্য মৃত্যু।

হতাশ হয়ে ফিরে চলেছেন অমৃতের সন্ধানী। তখন উট্‌নাপিশ্‌টিম তাকে বললেন, সমুদ্রের গভীর তলদেশে রয়েছে একটি অদ্ভুত গাছ, সেই গাছ বৃদ্ধকে যুবা করে তোলে। তোমাকে সন্ধান দিলাম, তোমার রাজ্যে নিয়ে যাও সেই গাছ।

সমুদ্রের গভীর তলদেশে ডুব দিলেন তিনি। গাছ নিয়ে ফিরে চললেন। রাজ্যে ফিরে যাওয়ার পথে ক্লান্ত বীর থামলেন, একটি জলধারায় তিনি স্নান করবেন, পোশাকও পাল্‌টাবেন। পাশে রেখে দিয়েছেন সেই গাছ, এক সাপের নাকে পেঁছিল তার গন্ধ। সে গাছটিকে নিয়ে চলে গেল, তার দেহের

চামড়ায় ঘষে নিল। পারে উঠে গিলগামেশ পাগলের মতো খুঁজতে লাগল সেই সম্পদকে, কোথাও পেল না। দুঃখে-শ্রান্তিতে ফিরে চলল সে। অমরত্বের সম্পদটি চিরকালের জন্য মানুষের হাতছাড়া হয়ে গেল। রাজ্যে ফিরে এল গিলগামেশ।

এখানেই মহাকাব্যের শেষ। কিন্তু অধ্যাপক গ্যাড ও ক্র্যামার আর একটি ফলক পেয়েছেন, দ্বাদশ ফলক। সুমেরীয় থেকে এই ফলকটি সরাসরি অনুবাদ করা হয়েছে। গিলগামেশের আর একটি ভিন্ন কাহিনী, একটি জটিল লোক-পুরাণ। গিলগামেশ ও হুলুপ্পু-গাছের কাহিনী। কিভাবে পবিত্র ঢাকের জন্ম হল তারই কাহিনী। এই ঢাক আক্কাদীয় ধর্মীয় আচারে ব্যবহৃত হত।

দেবী ইনান্না বা ইশটার ইউফ্রেটিস নদীর তীর থেকে একটি হুলুপ্পু গাছ নিয়ে এলেন। সেই গাছ লাগালেন তার বাগানে। এই গাছের কাঠ থেকে তিনি তৈরি করবেন তার শোয়ার খাট ও বসবার আসন। কিন্তু বিরুদ্ধ শক্তি তাকে এই কাজে প্রচণ্ড বাধা দিল। গিলগামেশ এলেন দেবীকে সাহায্য করতে। কৃতজ্ঞতায় দেবী তাকে দিলেন পুক্কু ও মিক্কু। এই পুক্কু যাদু ঢাক তৈরি হয়েছে গাছের অধোভাগ থেকে ও মিক্কু যাদু কাঠিটি তৈরি হয়েছে গাছের কাণ্ড থেকে। আক্কাদীয়দের কাছে বড় পবিত্র বস্তু।

দ্বাদশ ফলকের মহাকাব্য শুরু হয়েছে এইভাবে, পুক্কু ও মিক্কু হারিয়ে গিয়েছে, পাতালের অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছে। শোকে আচ্ছন্ন গিলগামেশ, তিনি কাঁদছেন। বন্ধু এনকিডু চললেন পাতালে, খুঁজে নিয়ে আসবেন দুটি হারানো মানিক, পিক্কু ও মিক্কু। পাতালে যাওয়ার আগে গিলগামেশ বন্ধুকে কয়েকটি আচার পালন করতে বলেছিলেন। বন্ধু সে সব কিছুই মানলেন না, পাতালে আটকা পড়লেন। গিলগামেশ সাহায্যের আবেদন জানালেন এনলিল-এর কাছে, ফল হল না। তারপরে সিন-এর কাছে, ফল হল না। শেষকালে ইয়া-র কাছে, ফল হল। ইয়া নারগালকে মাটিতে একটা গর্ত করতে বললেন, সেই গর্ত দিয়ে বেরিয়ে এল এনকিডুর আত্মা। গিলগামেশ তার কাছে পাতাল ও পাতালবাসীদের কাহিনী শুনতে চাইল। এনকিডু বললেন, বন্ধু, তুমি যে দেহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে, যাকে সবসময় আলিঙ্গন করতে, সেই এনকিডুর দেহ পাতালের পোকামাকড় খেয়ে ফেলেছে। গিলগামেশ আছড়ে পড়লেন মাটিতে, ছোট ছেলের মতো কাঁদতে লাগলেন।

ফলকের শেষাংশ ভীষণভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। অস্পষ্টভাবে এটুকুই উদ্ধার করা গিয়েছে, মৃত্যুর পরে যাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ভালোভাবে সম্পন্ন হয় ও যাদের হয়না, পাতালে তাদের ভাগ্য দুভাবে নির্ধারিত হয়।

এই মহাকাব্যের সেই অংশগুলি তুলে ধরেছি যেখানে লৌকিক উপাদান রয়েছে বেশিমাত্রায়। এই ধরনের অসংখ্য টুকরো কাহিনী প্রাচীন ভারতীয়-গ্রীক-মিশরীয়-পলিনেশীয় লোকপুরাণ, আফ্রিকার জামবিয়ার লুবা, ভোলটার

মোস্‌সি, ঘানার ক্রাচি, কেনিয়ার ছাগা আদিবাসী এবং ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য লোককথায় ছড়িয়ে রয়েছে। মোটিফগুলির বিশ্লেষণেও এর লৌকিক পরিচয় পাওয়া যাবে,—মৃতের রাজ্যে সশরীরে প্রবেশ, মৃতের রাজ্যে প্রবেশের মুখে আধা-পশু দৈত্যদের পাহারা, নানা বাধা অতিক্রম, নারীর মোহিনী রূপে ভুলে যাওয়া, সাগরতলে মৃতের দুনিয়া, স্বর্গের ষাঁড়, মৃত্যুপুরীর পথপ্রদর্শক মাঝি, সঞ্জীবনী গাছ, সাপ কেন খোলস ছাড়ে, মানুষ কেন মরণশীল, যাদু ঢাক ও যাদু কাঠি, অশরীরী আত্মা প্রভৃতি। আর প্রলয়ের মোটিফটি তো অতি পরিচিত। এর মধ্যে একদিকে যেমন পুরোহিতদের কিছু উচ্চতর অনুশাসন রয়েছে, তেমনি রয়েছে তৎকালীন মেসোপটেমিয়ার লৌকিক বিশ্বাস, লোকায়ত আচার এবং লোকঐতিহ্যের কাহিনী। এস. এইচ. হুক বলেছেন, 'মিথ ও ফোকলোরের' আশ্চর্য মিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই মহাকাব্য। এই হিসেবে রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসির সঙ্গে গিলগামেশের মৌলিক সাদৃশ্য রয়েছে। হুক মন্তব্য করেছেন, The epic in its present form is composed of various myths and folk-stories which have been brought together and artistically welded into a whole round the central figure of Gilgamesh.

এই সময়কালের একটি অ্যাসিরীয়-ব্যাবিলনীয় ফলকে একটি অসাধারণ পশুকথার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। 'এটানা'র কাহিনীর সঙ্গে এটি যুক্ত রয়েছে। একটি ঈগল ও সাপের পশুকথা।

সেই আদ্দিকালে ছিল এক ঈগল আর এক সাপ। তারা শপথ করল, তাদের বন্ধুত্ব কোনোদিন নষ্ট হবে না। এক গাছের মগডালে থাকত সেই পাখি, বাসায় তার অনেক ছানাপোনা। সাপ থাকত গাছের গোড়ায় এক কোটরে, তারও ছিল অনেক ছানাপোনা। তারা দুজনে দুজনের ছেলে-মেয়েকে দেখাশোনা করত, খাবার এনে খাওয়াত। খুব মিল দুই বন্ধুতে। এমনি করে সুখে-শান্তিতে দিন কাটতে লাগল।

কেটে গেল অনেক দিন। হঠাৎ ঈগলের মনে পাপ ঢুকল, তার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলল। সে পুরনো শপথ ভুলে গেল। একদিন সাপ বেরিয়েছে শিকারে, তখন তার কোটরে পাহারা দেবার কথা ঈগলের। কিন্তু ঈগল লোভে পড়ে সাপের সব বাচ্চা খেয়ে ফেলল। সাপ ফিরে এসে দেখে, তার কোটর শূন্য, সেখানে তার কোনো বাচ্চা নেই। সাপ সব বুঝল।

সাপ সূর্যদেবতা শামাশ-এর কাছে প্রার্থনা জানাল, ঈগলের এই কাজের প্রতিশোধ চাই। দেবতার পরামর্শে সাপ একটা মরা গোরুর পেটের মধ্যে লুকিয়ে রইল। ঈগল মরা গোরু দেখে উড়ে এসে তার ওপরে বসল। বসার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ঈগলকে জড়িয়ে ধরল এমনভাবে যে তার ডানা গেল ভেঙে। তারপরে তাকে বন্দী করে একটা গর্তে রেখে দিল। ঈগল

কাঁদতে কাঁদতে সূর্যদেবতার করুণা চাইল। চাইলেই কি করুণা পাওয়া যায়? কোনো ফল হল না।

এদিকে এটানার বৌয়ের ছেলে জন্মাবার সময় এমন অবস্থা হল, এই বুঝি বৌ মারা যায়। শামাশ-এর পরামর্শে এটানা ঈগলকে মুক্ত করে দিল, তার আঘাত ভালো করে দিল, কেননা এই বিশাল পাখি তাকে বয়ে নিয়ে স্বর্গে যাবে। স্বর্গে এটানা পাবে একটি সঞ্জীবনী গাছ যা বৌকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবে। ঈগল মুক্ত হয়ে কৃতজ্ঞতায় এটানাকে নিয়ে চলল স্বর্গের পথে, স্বর্গরানী ইশটার-এর সিংহাসনের দিকে। ওপরে, ওপরে, আরও ওপরে উঠছে ঈগল, তার ডানায় বসে রয়েছে এটানা। পৃথিবীকে মনে হচ্ছে এই এতটুকু, সমুদ্রকে মনে হচ্ছে যেন ছোট্ট একটা ঝুড়ি। কিন্তু ইশটার-এর সিংহাসনের কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই ঈগল ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ল, পাক খেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগল। পড়ে গেল নিচের পৃথিবীতে।

পুরোহিতদের হাতে পড়ে এই পশুকথায় কিছু পৌরাণিক দেবদেবীর নাম ঢুকে গিয়েছে। শেষদিকে এটানাকে এনে কাহিনীরও রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। কিন্তু কাহিনীর প্রথমাংশে একটি নিটোল পশুকথা রয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়ায়, বিশেষ করে ভারতে এই ধরনের পশুকথার বিভিন্ন রূপ পাওয়া গিয়েছে।

এই সময়ের কিছু পরবর্তীকালের একটি ব্যাবিলনীয় লোককথা পাওয়া গিয়েছে, স্বর্গরানী ইশটার-এর সমুদ্রতলে অভিযান। এই কাহিনীর অনুরূপ অনেক লোককথা হাঙ্গেরি, ইউগোশ্লাভিয়া, পোর্তুগাল ও স্পেনে পাওয়া গিয়েছে। রানী চলেছেন সমুদ্রতলে মৃতের রাজ্যে। দূরে জলের স্তরে স্তরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রহরী। রানী যেই আসেন একজনের সামনে, প্রহরী তার কাছে একটি পোশাক চায়। রানী পোশাক খুলে তাকে দেন, নইলে যে প্রবেশের অধিকার পাবেন না! পোশাক দিচ্ছেন রানী, আরও নিচে চলেছেন তিনি। শেষকালে রানী যখন একেবারে নিচে মৃতের রাজ্যে পৌঁছলেন তখন তিনি সম্পূর্ণ নিরাবরণ। ফিরবার সময় রানী আবার এক এক করে তার সব পোশাক ফিরে ফেলেন। ভারত-আফ্রিকার কিছু রূপকথায় নিষিদ্ধ এলাকায় যাওয়ার সময় প্রহরীর কাছে দেহের গয়না খুলে দেবার কথা রয়েছে।

অ্যাসিরিয়ার একটি লোককথা সারা পৃথিবীর লোককথা সংগ্রহের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। ৩০০০ বছর আগে লোককথাটি ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল। মেসোপটেমিয়ার সীমান্ত পেরিয়েও এই লোককথার কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ পাওয়া গিয়েছে মিশরের আমার্না প্রত্নশালায়। এই লোককথার ব্যাবিলনীয় রূপটি যে ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে তা আবিষ্কৃত হয়েছে মিশরে। মিশরীয় পুরোহিতরা এই ফলক থেকেই কিউনিফর্ম লিপি শিক্ষা করত। সমস্ত পৃথিবীর লোককথা-লোকপুরাণে দেখতে পাই, মানুষ অমরত্বের সন্ধানে চলেছে। আর এই লোককথার নায়ক অমরত্বকে প্রত্যাখ্যান করে ফিরে এসেছে মর্তে। জীবনের প্রতি এমন প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকর্ষণ যে কি করে সেই প্রাচীনকালের মানুষের মৌখিক ঐতিহ্যে রূপ পেল তা আজও এক বিস্ময়। পৃথিবীর জীবনে অনেক কষ্ট, তবু সে স্বর্গের অমৃত চায় না। কেননা, পৃথিবী সুন্দর। দেবরাজের ভিক্ষা ফিরিয়ে দেবার মতো বলিষ্ঠ মানসিকতা যে জনগোষ্ঠী প্রকাশ করতে পারেন, তাদের জীবনবোধ কত গভীর ছিল তা সহজেই অনুভব করা যায়।

লোককথার নায়কের নাম আদাপা, যার হিব্রু নাম আদম। তাই মেসোপটেমীয় সংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, আদাপার এই লোকপুরাণটি 'প্রথম মানুষের' কাহিনী। লোকপুরাণ থেকে জানা যায়, মানব আদাপা জ্ঞানের দেবতা ইয়া-র সন্তান। তিনি ছিলেন ব্যাবিলনের সবচেয়ে পুরনো শহর এরিডু-র পুরোহিত-সম্রাট। ইয়া আদাপাকে 'মানুষের আদর্শ' রূপে সৃষ্টি করেন। দেবতার সন্তান হলেও ইয়া তাকে জ্ঞানী করে তোলেন কিন্তু অমর জীবন দান করেন নি। সাধারণত দেখা যায়, দেবতারা কোনো মানুষকে কখনও অমরত্ব দান করেন না, কিন্তু এই গল্পে আদাপাকে তারা অমরত্বের বর দিতে চেয়েছিলেন। সব দিক থেকেই 'আদাপা ও দখিনা বাতাস' একটি আশ্চর্য লোককথা।

এক যে ছিল কিশোর। নাম তার আদাপা। একদিন ভোরবেলায় সে গিয়েছে মাছ ধরতে। কি শান্ত সমুদ্র! আজ অনেক মাছ ধরা যাবে। কিশোর আদাপা খুব খুশি। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ঝড়ের বেগে দখিনা বাতাস বয়ে গেল। নৌকোর পাল হেলে পড়ল জলে, নৌকো কাত্ হয়ে উলটে গেল। আদাপা ছিটকে পড়ল জলে। সাঁতার কেটে তীরে এল। বালির

ওপরে বসে হাঁপাতে লাগল। আর দখিনা বাতাস তার কানের চারপাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বইছে আর হাহা করে হাসছে। হঠাৎ লাফিয়ে আদাপা অর্ধেক নারী অর্ধেক পাখি বিরাট দানবী দখিনা বাতাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জড়িয়ে ধরল তাকে, কিছু বুঝবার আগেই তার ডানাদুটো দুমড়ে ভেঙে দিল। হাওয়ায় দখিনা বাতাসের আর্তনাদ ভেসে আসছে। আদাপা দাঁড়িয়ে রয়েছে বীরের মতো।

দিন যায়, রাত বয়ে যায়। দখিনা বাতাস ফিরছে না। দেবতাদের রাজা আনু বসে আছেন স্বর্ণ-সিংহাসনে। সব দরজা জানালা খোলা, তবু কেন দখিনা বাতাস ফিরছে না! অনেক সময় বয়ে গেল। দেবরাজ অস্থির হয়ে উঠলেন। শেষকালে আনু একজন দেবদূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। দূত দেখল, দখিনা বাতাস বালুতীরে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। দূত তাকে তুলে নিয়ে দেবরাজের কাছে উড়ে গেল।

দেবরাজ তার ভৃত্যের এই দশা দেখে রাগে জ্বলে উঠলেন। দেহ কাঁপছে, চোখ জ্বলছে। আদেশ দিলেন, যে মানুষ আমার ভৃত্যের এই দশা করেছে, তাকে নিয়ে এসো, এখুনি।

রাতের আঁধার। ঘুমিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় তার ঘুম গেল ভেঙে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক আলোকিত দেহ, তার ডানাদুটো অল্প অল্প কাঁপছে।

আলোকিত দূত বলল, দেবরাজ আনু তোমায় ডেকেছেন। তোমায় যেতে হবে স্বর্গের বিচারসভায়।

আলোকিত দূত অদৃশ্য হল। বাবাকে জাগিয়ে তুলে আদাপা বলল, দেবরাজ আনু ভীষণ রেগে গিয়েছেন। আমি নাকি মস্ত অপরাধ করেছি। তিনি আমায় বিচারসভায় ডেকেছেন, আমার বিচার হবে।

বাবার বুক কেঁপে উঠল। তার যে আর কেউ নেই! চোখের কোল ভিজে উঠল। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাছা, দেবরাজ যখন ডেকেছেন তখন যেতেই হবে। শোকের পোশাক পরে তুমি যাবে। বিনয়ী হয়ে কথা কইবে। উদ্ধত হবে না। আবার অকারণে মাথাও নত করবে না। মধুর কথায় তার কাছে ক্ষমা চাইবে। কেন তুমি ডানা ভেঙেছ তা-ও বলবে। দেবরাজ যদি ক্ষমা করেন, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে আমাদের এই পৃথিবীতে। হ্যাঁ, আর একটা কথা। স্বর্গের কোনো খাবার খাবে না, কোনো পানীয় স্পর্শ করবে না। পৃথিবীকে যদি ভুলতে না চাও, তবে এই নিষেধের কথা মনে রেখো। পৃথিবী বড় সুন্দর।

অল্পক্ষণ তাকিয়ে রইল বাবার দিকে, তারপরে রওনা দিল আদাপা। এক আশ্চর্য উপায়ে আদাপা স্বর্গের পথ পেয়ে গেল। পৌঁছে গেল মেঘের রাজ্যে। মেঘরাজ্যে দেবরাজের বিচারসভা। বিচার সভার দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুজন

দৈত্য। তাদের দুপাশে বিশাল ডানা। মাথা নামিয়ে আদাপা তাদের অভিবাদন জানাল। বাঃ, বড় বিনয়ী মানুষ তো! তারা পথ ছেড়ে দিল।

বিচারসভার ঐশ্চর্য দেখে আদাপার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। দেবতারা বসে রয়েছেন, তাদের পোশাক আকাশের তারায় খচিত। অপরূপ সুন্দর দেবতারা। মাঝখানে রয়েছেন দেবরাজ। সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল তিনি, চারিদিকে আভা। আদাপা হাঁটু ভেঙে বসে দেবরাজ ও দেবতাদের প্রণাম জানাল। আলোর ছটায় চোখ খুলে রাখা যায় না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। দেবরাজ বললেন, মানুষ হয়ে এত সাহস কোথায় পেলে? আমার ভৃত্যের ডানা ভেঙেছ? কোথায় পেলে এমন সাহস?

আদাপা ভয় পেল না। কথা জড়িয়ে গেল না। বিনয়ী হয়ে মিষ্টি সুরে বলল, হে দেবরাজ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি। দখিনা বাতাস আমার নৌকো উলটে দিয়েছিল। আমি মাছ ধরছিলাম। মাছ ধরতে না পারলে আমরা যে অনাহারে থাকব। হঠাৎ রেগে গেলাম, তার ডানাদুটো ভেঙে দিলাম। হ্যাঁ, আমিই ভেঙেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, দখিনা বাতাস যে আপনার ভৃত্য রাগের মাথায় আমি সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম। রাগ মানুষকে সব ভুলিয়ে দেয়। সেই ভুলে আমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দার গায়ে হাত তুলেছিলাম। আমি অনুতপ্ত, আমায় ক্ষমা করুন।

তাকিয়ে রয়েছে আদাপা। চোখের সামনে ভেসে উঠল বাবার সেই সুন্দর মুখখানি। না, সে ভয় পায়নি। না, সে উদ্ধত হয়নি। না, সে মাথা নত করেনি।

দেবতারা বলে উঠলেন, ছোট্ট মানুষটি সত্যিই অনুতপ্ত। সে অপরাধ করেছে, অপরাধ বুঝে সে স্বীকারও করেছে। সে অনুতপ্ত।

দেবরাজ কথা বললেন। বাজ পড়ার শব্দ হল না। মধুর সংগীত ভেসে এল, ছোট্ট মানুষ তোমায় ভালো লেগেছে, কেননা তুমি অনুতপ্ত, তুমি ক্ষমা চেয়েছ। তোমায় ক্ষমা করলাম। কিন্তু তুমি আর পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে না। স্বর্গরাজ্যে যা দেখে গেলে, পৃথিবীর মানুষকে তা জানাতে পারবে না, জানাতে দেব না। এটাই নিয়ম। আজ থেকে তুমি স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা হবে। আমাদের সঙ্গে থাকবে। চিরকালের জন্য। অমর হয়ে রইবে তুমি। পৃথিবীর মানুষের মতো মৃত্যু তোমায় স্পর্শ করতে পারবে না। স্বর্গীয় সুরা পান করে অমরত্ব লাভ কর। দূত, ওকে সুরার পাত্র এগিয়ে দাও।

মেঘের আড়াল থেকে দূত এগিয়ে আসছে। আলোকিত দূতের হাতে সুরার পাত্র। স্বর্গীয় সুরা। বাবার মুখ ভেসে উঠল। দূত আরও এগিয়ে আসছে। আরও কাছে। সুরার পাত্রে বাবার মুখ ভেসে উঠছে। আদাপা দেবরাজের পায়ের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কাতরভাবে বলে উঠল, ওগো

দেবরাজ, তুমি রুষ্ট হয়ো না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমার তুচ্ছ সৃষ্টিকে ক্ষমা কর। আমি তোমার স্বর্গীয় সুরা পান করতে পারব না। কিছুতেই পারব না।

বাজ পড়ার শব্দ হল। প্রতিধ্বনি তুলে সে শব্দ শতগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আগুনের মতো রাঙা হয়ে দেবরাজ বললেন, আমার দেওয়া প্রসাদ তুমি ফিরিয়ে দিলে? স্বর্গীয় সুরা পান করতে অস্বীকার করলে? বুঝেছি, তুমি ভেবেছ আমি তোমায় বিষ পান করতে দিয়েছি? এ সুরা পান করলে তুমি বুঝি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? হতচ্ছাড়া খুদে মানুষ কোথাকার! মনে শুধুই বদ বুদ্ধি। আমি তোমায় দেবতার আসনে বসাতে চেয়েছিলাম, অমরত্বের স্বাদ পেতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। সহ্য হল না।

বাজের শব্দ থেমে গেল। মাথা নত করে আদাপা বলে চলল, ওগো দেবরাজ, তা নয়। আমি ভুল বুঝিনি। তুমি সত্যের পিতা, তুমি সত্যকে জানো। আমি তা ভাবিনি। আমি করুণার দানকে বুঝতে পেরেছি। কিন্তু দেবরাজ, আমি যে তার উপযুক্ত নই। আমি সামান্য মানুষ। তোমার বিচারসভায় আসবার আগে আমি আমার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, যদি তুমি আমায় ক্ষমা কর, তবে আমি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে ফিরে যাব। তুমি ক্ষমা করেছ, তাই আমি ফিরে যেতে যাই। বাবা বলেছে, পৃথিবী বড় সুন্দর। তুমি আমায় ফিরে যেতে আদেশ দাও দেবরাজ।

আদাপা করুণ চোখে চেয়ে রইল দেবরাজের মুখের দিকে। দেবরাজের রাগ মিলিয়ে গেল, অদ্ভুত হাসি ফুটল মুখে। তার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি, তিনি বললেন, পৃথিবী বড় সুন্দর! ফিরে যেতে চাও সেখানে? বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ? অমরত্ব চাও না? বেশ তাই হবে। ফিরে যাও পৃথিবীতে। সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, দুঃখ-কষ্ট, রোগজ্বালা, বার্ধক্যে নুয়ে পড়া, কান্না আর ভয়াবহ মৃত্যু। এই তো মানুষের ভাগ্য! এ যদি তোমার ভালো লাগে, ফিরে যাও তোমার সুন্দর পৃথিবীতে।

আদাপার মুখে হাসি। সবাইকে প্রণাম জানিয়ে আদাপা পৃথিবীর পথে রওনা দিল।

হ্যাঁ, আদাপা পৃথিবীতে ফিরে এল। সে অমরত্ব চায়নি। সে দেবরাজের ভিক্ষা মাথা পেতে নেয়নি। তার প্রসাদ ফিরিয়ে দিয়ে বাবার আদেশ মাথা পেতে নিয়েছে। দেবরাজের চেয়েও আদাপার কাছে তার বাবা অনেক বড়। অমর হয়ে মেঘরাজ্যে দেবলোকে সে শান্তিতে থাকতে চায়নি। সে মেনে নিয়েছে মানুষের সহজ আনন্দকে, মানুষের দুঃখ-কষ্টকে,—সব মানুষ যেভাবে বাঁচবে মরবে, সে-ও হবে তার অংশীদার। অনেক কষ্ট জীবনে, তবু পৃথিবী বড় সুন্দর। আদাপার পৃথিবী, মানুষের পৃথিবী।

অপরাজেয় মানুষের, অপরূপ পৃথিবীর অনন্য এক সজীব চিত্রশালা হল হাট-বাটের মানুষের এইসব লোককথা। কিংবদন্তির কল্পনায় আদাপা যদি আদি মানব হন, তাহলে আদাপার পার্থিব ভালোবাসার কাহিনীটি বোধহয় যুক্তিবাদী মানুষের সবচেয়ে পুরনো উজ্জ্বল সম্পদ।

লোককথার সংগ্রহ-ভাণ্ডার

ইউরোপীয় সমুদ্র-অভিযাত্রীদল ষোড়শ শতাব্দীর গোড়া থেকেই পৃথিবীর নানা প্রান্তে নতুন নতুন দেশ 'আবিষ্কার' করতে লাগলেন। ১৫২১ খ্রীস্টাব্দে ম্যাজেলান এলেন মাইক্রোনেশিয়ার মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের গুয়াম দ্বীপে। এর পরবর্তী আরও তিনশ' বছর চলল লুণ্ঠন-হত্যা-সম্পদ আহরণের কুৎসিত বীভৎস অভিযান। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই উপনিবেশবাদীরা 'স্থায়ী' উপনিবেশ গড়ে তুলল। এদের পথ বেয়ে কিছু মহৎ নৃবিজ্ঞানী-ধর্মযাজক-প্রশাসক এলেন উপনিবেশে। তাদের মানবিক অক্লান্ত পরিশ্রমে পৃথিবীর লোককথা সংগ্রহের ভাণ্ডার স্ফীত হতে লাগল।

অন্যদিকে ইউরোপের উত্তরে ছোট্ট একটি দেশ ফিনল্যাণ্ড নিজের দেশের লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ করতে শুরু করলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে এবং সেইসব সংগ্রহ প্রকাশিত হতে লাগল ১৮০২ খ্রীস্টাব্দ থেকে। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যে বিপুল লোকসংস্কৃতি-সংগ্রহ ফিনল্যাণ্ডে প্রকাশিত হল তা অন্যান্য দেশকে এ বিষয়ে উদ্দীপিত করল। ১৮৩১ সালেই প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিনিস লিটারারি সোসাইটি।' উপনিবেশবাদী স্পেন ডেনমার্ক হল্যাণ্ড নরওয়ে ফরাসী দেশসমূহ নিজেদের দেশ ও নিজেদের উপনিবেশের লোকসংস্কৃতি প্রকাশ করতে শুরু করলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই সারা বিশ্বের এক বিপুল লোককথা-সংগ্রহ আমাদের হাতে এল। তারপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হতে শুরু করল। নতুন জাতীয় সরকার ও নবজাগ্রত দেশপ্রেমিক মানুষ আরও ব্যাপকভাবে লৌকিক সংস্কৃতির অনন্য সম্পদকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে চললেন। আধুনিক পৃথিবীর এই লোককথা সংগ্রহের ইতিহাস আমাদের জানা।

কিন্তু লোককথা সংগ্রহের মানসিকতা যখন অবহেলিত ছিল কিংবা মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তা-লাভ যখন সম্ভব ছিল না, তখনও লোকসমাজের এই মহান ঐতিহ্যের অসংখ্য নমুনা লিপিবদ্ধ রয়েছে মানুষের সৃষ্ট সাহিত্য-

শিল্প-নীতিশাস্ত্র-ধর্মশাস্ত্র ও অনুশাসনে। মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত উচ্চতর সাহিত্যের স্রষ্টাদের সঙ্গে গ্রামীণ লোকসমাজের সাংস্কৃতিক বন্ধন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। সচেতনভাবে যদি নাও হয়, তবু এই গ্রামীণ ঐতিহ্যের কথা তাদের সৃষ্টির মধ্যে অবশ্যই অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যকে আবিষ্কার করার মাধ্যমেই আমরা লোকঐতিহ্যের ধারাবাহিক সূত্রটি অনুধাবন করতে পারব। লৌকিক উপাদান তো অসংখ্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে লোককথার পূর্ণ, আংশিক কিংবা সম্পাদিত ও বিকৃত রূপ।

রামায়ণ-মহাভারত-ইলিয়াড-ওডিসি-গিলগামেশ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের উৎস লোকসমাজের মৌখিক ঐতিহ্যবাহিত লোককথা,—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য যেসব গল্পকাহিনীর গ্রন্থ রয়েছে সেখানেও পাওয়া যাচ্ছে লোকসমাজের লোককথা। লোককথার প্রাণের স্বরূপটি জেনে, তার টাইপ ও মোটিফ বিশ্লেষণ করে এবং বিশ্বের লোককথা ভাণ্ডারের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করে আমরা উপলব্ধি করতে পারব,—লিখিত সম্পাদিত সংকলিত গ্রন্থ কিংবা মহাকাব্যে কোন্ কোন্ লোককথা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, কোন্ কোন্ লোককথা লোকজীবন থেকে সংগ্রহ করা, আর তুলনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ধরা পড়বে লিখিত রূপ দেবার সময় তাতে কি কি পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। কাজটি সহজ না হলেও অসম্ভব নয়। বিশেষ করে, লোককথা বিশ্লেষণের যখন নানা বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি যদি লোকঐতিহ্যের সম্পদ না হত তবে প্রাচীন সভ্যতার লিখিত পুঁথিতে একই ধরনের লোককথার এই বিশ্বব্যাপী অনুপ্রবেশ ঘটত না। লোককথার সম্পদ মানুষের বিশ্বজনীন সীমানাহীন মানবিক উত্তরাধিকারকেই প্রতিষ্ঠিত করে। বিশ্বের প্রতিটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মানবিক-মানসিক সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে লোককথা।

পরিশিষ্ট

মোটিফ-ইনডেক্স

'লোককথার ঐতিহ্য' গ্রন্থে তত্ত্বগত বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য লোককথার অনেক উদাহরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। কখনও সম্পূর্ণ লোককথাটি উদ্ধৃত করেছি, আবার কখনও প্রাসঙ্গিকভাবে লোককথার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করতে হয়েছে। এইসব লোককথার মোটিফ-ইনডেক্স বর্ণানুক্রমে দেওয়া হল।

লোককথার যে ভাবটি সকলকে বিস্মিত করে তা হল এর অভিপ্রায়ের বিশ্বজনীনতা। মানবসমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক অসম বিকাশ ঘটেছে নিঃসন্দেহে, কিন্তু বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোককথা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাদের মধ্যে মানসিক অভিপ্রায়ের এক আশ্চর্য মিল রয়েছে। সংস্কৃতি ভাষা আচার-আচরণ পরব লোকবিশ্বাস এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান নানা ধরনের হলেও জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনায় একই ধরনের ঘটনা ও অভিজ্ঞতা আনাগোনা করেছে। তাই এক গোষ্ঠীর সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর সংস্কৃতির যে বিরোধ-বিভেদগুলি নজরে পড়ে, মনে হয় সেসব অতি তুচ্ছ,—তাদের আসল পরিচয় মানসিক সেতুবন্ধনে। আর এই বন্ধনের অনন্য পরিচয় রয়েছে লোককথা-গুলির মধ্যে। লোকসমাজের মন ভৌগোলিক সীমারেখা, কৃত্রিম রাজনৈতিক মানচিত্রের বিভাজন কিছুই মেনে নেন না, অনেক সময় এসবের কোনো খবরই তারা রাখেন না। মানুষ একই বিবর্তনের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছেন। কোনো আরোপিত সীমানা তাদের বিশ্বজনীন মনকে রুদ্ধ করতে পারে না। তাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিচয় গড়ে উঠেছে মানসিক ও মানবিক সেতুবন্ধনের মাধ্যমে।

এই বিস্ময়কর বিশ্বজনীন মানসিকতা ধরা পড়েছে মোটিফ-ইনডেক্সের মাধ্যমে। আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই অনেক লোককথায় রয়েছে, কিন্তু আঞ্চলিকতার সেই খোলস ছাড়িয়ে ফেললে আমরা দেখতে পাব এক সর্বজনীন অভিপ্রায়। লোককথা একই সময়ে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। এই মোটিফ-ইনডেক্সের বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি মানবসমাজের অন্তর্নিহিত অভিন্নতা। লোককথা বিশ্লেষণের অনেক রকম পদ্ধতি রয়েছে, কিন্তু মোটিফ-ইনডেক্স পদ্ধতিটিই সবচেয়ে বিজ্ঞাননির্ভর ও মানবিক। কেননা এই একটি মাত্র পদ্ধতির মাধ্যমেই লোকসমাজের মনের গভীরে পৌঁছনো যায় এবং লোকঐতিহ্যের মানসিক অভিপ্রায়ের সন্ধান মেলে।

একটি লোককথাকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে একটি মূল বা একাধিক কাহিনী-অংশ পাওয়া যায়, এই মূল কাহিনী-অংশই হল মোটিফ। খণ্ড খণ্ড কাহিনী-অংশই সমগ্র লোককথাকে একটি অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে। আবার প্রত্যেকটি কাহিনী-অংশেও একটি স্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে। লোককথার বিশ্বজনীনতা এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যাবে।

আমার মনে হয়েছে, লোককথা ও লোকসমাজের মন ও মননের মূল বিষয়কে অনুধাবন করবার সবচেয়ে মানবিক পদ্ধতি হল মোটিফ-ইনডেক্স।

স্টিথ টমসনের 'মোটিফ-ইনডেক্স অব্ ফোক লিটারেচার' ৬ খণ্ড, ব্লুমিংটন, ১৯৫৫—৫৮, গ্রন্থ থেকে মোটিফ-ইনডেক্সগুলি নেওয়া হয়েছে।

Advice from speaking cow B211
Animal as messenger B291
Animals carry men B550
Animal kingdom B220
Animal in service to man B292
Animal uses hnman speech B211
Animal warfare B260
Animal weddings B280
Animal nurse B535
Beautiful land of dead E481.4
Betrayal of husband's secret by his wife K2213.4
Bridge to other world guarded by animals F152.0.1
Bridge of the gods A986
Cave of winds A1122
Clever dealing with a king J1675
Clever practical retort J1500
Contest in magic D1719.
Creation of man A1200
Creation of the sun A710
Creation of animals A1700
Crimes punished Q210
Cruel pnnishments Q450
Cruel father S11
Cruel stepmother S31
Curses M400
Curse as punishment Q256
Deceptions punished Q260
Deceptive bargain K100
Deeds punished Q200
Deluge A1010
Deluge : escape in boat A1021
Escapes R210
Escape by false plea K550
Eternal soul E710
Evil prophecy M340
Extraordinary castle F771
Extraordinary companions F601
Extraordinary places F700
Extraordinary river F715
Fairies F200
Fairyland F210
Flood as punishment A1018
Forgotten fiancee D2003
Garden of the gods A121.2
Giant F531
Giant bird B31.1
God in animal form A32

God of death A487
God with animal features A131
Heaven A661
Hell A671
Helpful domestic beasts B400
Helpful wild beasts B430
Humiliated lovers K1210
Impossible tasks H1010
Imposter punished Q262
Inhabitant of upper world. visits earth F30
Journey to upper world F10
Journey to underground animal kingdom F127
Kind and unkind Q2
Kingdom of fishes B223
King of animals B240
Land of the dead E481
Land of the dead in lower world E481.1
Life-giving plant D1346.5
Lost ring found in fish N211.1
Love through sight of hair of unknown woman T11.4.1
Luminous god A124
Magic flight D670
Magic conveyances D1110
Magic objects D800
Magic powers D1700
Male and female creators A21.1
Man made from clay A1241
Marvelous healing plant D1500.1.4
Medicine shown by animal B512
Messenger of the gods A165.1
Mother earth A401
Mythical beasts B10
Nation of the creator A10
Obstacle flight D672
Origin of death A1335
Origin of fairies F251
Ogre overawed by bluff K1710
Pairs of animals in ark A1021.1
Paradise lost because of forbidden fruit A1331.1
Parliament of animals B230
Perilous river as barrier to other world F141.1.1
Person transforms self, is swallowed and reborn in new form E607.2
Reincarnation E600
Remarkably strong man F610
Rescues R100
Rescue of princess from ogre R111.1.1
Resuscitation by herbs E105
Resuscitation by replacing heart E30
Revenant in animal form E423
Seperable soul E710
Solution of riddles H1292
Speaking animals B210
Sun-sister and moon-brother A736.1
Supernatural birth of the hero T511
Tabu : drinking C250
The fat cat Z31.3.2
The greatful deed E341
Tragic love T80
Unpromising hero L100
Victorious youngest son L10
Water-Spirit F420
Winds caused by flapping wings A1125
Wise animals B120
Witch in animal form G211
Witches dance G247
Witch sucks blood G262.1
Wood-spirit F441
World fire A1030

স্টিথ টমসন লোককথার মোটিফ-ইনডেক্স পদ্ধতি আবিষ্কার করার আগে আর একটি পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। একেই আখ্যা দেওয়া হয়েছিল টাইপ-ইনডেক্স নামে। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে বিচিত্র লোকসংস্কৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল 'ফিনিস ফোকলোর সোসাইটি'। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ কার্লে ক্রোন লোককথার শ্রেণীবিভাগ করবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। দায়িত্ব দিলেন অ্যাণ্টি আরনে-র ওপরে। আরনে কার্লে ক্রোনের নেতৃত্বে এবং হেলসিঙ্কির অসকার হ্যাকম্যান, কোপেনহেগেনের অ্যাক্সেল ওল্রিক, বার্লিনের জোহানিস বোল্টে ও লুণ্ড-এর সি. ডাবলিউ. ফন সাইডোর সহায়তায় ফিনিস ফোকলোর সোসাইটির বিপুল সংগ্রহকে শ্রেণীবিন্যাস করলেন এবং এই পদ্ধতির নাম দিলেন টাইপ-ইনডেক্স। অ্যাণ্টি আরনে দীর্ঘদিনের সাধনায় লোককথার টাইপ-ইনডেক্স তৈরি করলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, 'এভরি সিংগল টেল অর্ স্টোরি হ্যাজ পারটিকুলার প্লটস অ্যাণ্ড ইটস্ ইউনিফায়েড কমপোজিশান।' স্টিথ টমসন কার্লে ক্রোন ও অ্যাণ্টি আরনের 'ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক' প্রক্রিয়ায় এই গবেষণাকে অবলম্বন করে তাতে আরও নতুন নতুন আবিষ্কৃত লোককথার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র বিশ্বে প্রচলিত লোককথাকে পৃথক পৃথক সংখ্যা দিয়ে টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতিকে আরও সম্প্রসারিত করলেন। সমগ্র লোককথা সংগ্রহকে তিনি মোট ২৪৯৯টি ভাগে ভাগ করেছেন।

টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পরে লোককথা বিশ্লেষণের আরও নানারকম অগ্রসর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু এই প্রথম ও পুরনো পদ্ধতির মাধ্যমে একটি বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে জানা যায় যা মোটিফ-ইনডেক্স ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। একটি নির্দিষ্ট টাইপ বেছে নিয়ে আমরা জানতে পারব বিশ্বের আর কোথায় কোথায় এই লোককথাটি প্রচলিত রয়েছে, এর সম্ভাব্য উৎসস্থান কিংবা উৎসস্থানগুলি আবিষ্কার করা সম্ভব, লোককথাটি কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কিংবা কোন্ কোন্ বাড়তি অংশ যুক্ত হয়েছে তাও বের করা সম্ভব। এই কারণেই আজও টাইপ-ইনডেক্স পদ্ধতিটি বিশ্বের সর্বত্র লোককথা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়ে আসছে, অবশ্য পাশাপাশি মোটিফ-ইনডেক্স এর পরিপূরক হিসেবে থাকতেই হবে।

'লোককথার ঐতিহ্য' গ্রন্থে যেসব লোককথা রয়েছে তাদের টাইপ দেওয়া হল। টাইপের সংখ্যার ক্রম অনুসারে সাজানো হল। অ্যাণ্টি আরনে-স্টিথ টমসনের 'লোককথার টাইপ-ইনডেক্স'কে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে মূল ভাগগুলি ও পরে আলাদা টাইপ দেওয়া হল।

(a) Wild animals 1—99
(b) Wild animals and domestic animals 100-149
(c) Man and wild animals 150-199
(d) Domestic animals 200-219
(e) Birds 220-249
(f) Fish 250-274
(g) Other animals and objects 275-299
(h) Supernatural adversaries 300-399
(i) Supernatural or enchanted husband (wife) or other relatives 400-459
(j) Superhuman tasks 460-499
(k) Supernaural helpers 500-559
(l) Magic objects 560-649
(m) Supernatural power or knowledge 650-699
(n) Other tales of the supernatural 700-749
(o) Religious stories 750-849
(p) Novelle (Romantic tales) 850-999
(q) Tales of the stupid ogre 1000-1199
(r) Numskull stories 1200-1349
(s) Stories about married couples 1350-1439
(t) Stories about a woman (girl) 1440-1524
(u) Stories about a man (boy) 1525-1874
(v) Tales of lying 1875-1999
(w) Formula tales 2000-2399
(x) Unclassified tales 2400-2499

6 Inquiry about the direction of the wind
50 The sick lion
51 The lion's share
62 Peace among the animals
75 The help of the weak
104 The cowardly duelers
111 The cat and the mouse converse
150 Advice of the fox
157 Learning to fear men
160 Grateful animals; ungrateful man
200 The dog's certificate
201 The lean dog prefers liberty to abundant food and a chain
212 The lying goat
220 The council of birds
221 The election of the bird king
245 Tame bird and wild bird
246 The hunter bends the bow
253 The fish in the net
300 The dragon-slayer
303 The twins

304 The hunter
310 The maiden in the tower
313C The forgotten fiancee
327 The children and the ogre
329 Hiding from the devil
335 Death's messergers
366 The man from the gallows
400 The man on a quest for his lost wife
403A The wishes
430 The ass
431 The house in the wood
460A The journey to god to receive reward
460B The journey in search of fortune
465 The man persecuted because of his beautiful wife
465A The qnest for the unknown
470 Friends in life and death
471 The bridge to the other world
473 Punishment of a bad woman
502 The wild man
505 The king is betrayed
506 The rescued princess
510B The dress of gold, of silver and of stars
513 The helpers
560 The magic ring
562 The spirit in the blue night
610 The healing fruits
613 The two travellers
620 The presents
670 The animal languages
725 The dream
751 The greedy peasant woman
755 Sin and honour
756A The self-righteous hermit
759 God's justice vindicated
831 The dishonest priest
837 How the wicked lord was punished
840 The punishments of men
880 The man boasts of his wife
888 The faithful wife
892 The children of the king
910A Wise through experience
930 The prophecy
945 Luck and intelligence
950 Rhampsinitus
1070 Wrestling contest
1250 Bringing water from the well
1350 The loving wife
1365 The obstinate wife
1380 The faithless wife
1535 Rich and poor peasant
1536C The murdered lover
1542 The clever boy
1681 The boy's disasters
1960 The great animal
2250 Unfinished tales
2300 Endless tales